জানা দেশ অজানা কথা

শংকর

শংকর-এর কয়েকটি বই

ভ্রমণ সাহিত্য

মানবসাগর তীরে ৬০.০০
জানা দেশ অজানা কথা ৩০.০০
এপার বাংলা ওপার বাংলা ৩০.০০
যেখানে যেমন ২৫.০০

বিশেষ রচনা

কত অজানারে ৩০.০০
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ১৬.০০
এই তো সেদিন ২০.০০

যুগল উপন্যাস

তনয়া ৩০.০০
(নগর নন্দিনী, সীমন্ত সংবাদ)
তীরন্দাজ ৩০.০০
(তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট)
মনজঙ্গল ৩০.০০
(মনোভূমি ও মনজঙ্গল)

ত্রয়ী উপন্যাস

স্বর্গ মর্ত পাতাল ৩০.০০
(জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা)
জন্মভূমি ৩০.০০
(স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণ সুযোগ, বোধোদয়)

উপন্যাস

বিত্তবাসনা ১৬.০০
অনেক দূর ২০.০০
ঘরের মধ্যে ঘর ১০.০০
মুক্তির স্বাদ ২০.০০
মাথার উপর ছাদ ২০.০০
একদিন হঠাৎ ১৬.০০
নবীনা ১৫.০০
মানসম্মান ২০.০০
সোনার সংসার ২০.০০
সম্রাট ও সুন্দরী ৩০.০০
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ২০.০০
জন-অরণ্য ২০.০০
মরুভূমি ৩০.০০
এবিসিডি ২৫.০০
কাজ ২০.০০
সীমাবদ্ধ ৩৫.০০
আশা আকাঙ্ক্ষা ২০.০০
রূপতাপস ১৫.০০
চৌরঙ্গী ৩৫.০০
স্থানীয় সংবাদ ২৫.০০
সুবর্ণ সুযোগ ২৫.০০
বোধোদয় ১৬.০০
পদ্মপাতায় জল ১০.০০

আরও কয়েকটি বই

এখানে ওখানে ২৫.০০
পাত্রপাত্রী ১২.০০
এক যে ছিল ১৬.০০
সার্থক জনম ১৩.০০
মানচিত্র ১৬.০০
এক দুই তিন ১০.০০
যা বলো তাই বলো ১৫.০০

ছোটদের জন্য

এক ব্যাগ শংকর ১৫.০০
চিরকালের উপকথা ১৫.০০

শংকর-এর সব বই নির্মল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

লেখকের নিবেদন

দেশ ছেড়ে বিদেশে বেরিয়ে অসংখ্য মানুষের
অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের অভিজ্ঞতার
ভাণ্ডার থেকেই জানা দেশের অজানা কথা
লেখা সম্ভব হলো।
রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক
প্রকাশকালে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা পৃথিবীর
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানাভাবে
উৎসাহ ও উপকরণ জুগিয়েছেন।
তাঁদের সকলকে নমস্কার।
সম্পাদক শ্রীঅভীক সরকার,
শ্রীরমাপদ চৌধুরী ও শ্রীরাধানাথ মণ্ডলকে
কৃতজ্ঞতা জানাই

শংকর

২৬ জানুয়ারী ১৯৮৮

বিদেশ ভ্রমণকাল : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ; রচনাকাল : জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৮৭
ধারাবাহিক প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৮৭—জানুয়ারী ১৯৮৮

সাহিত্যম্ প্রকাশিত
শংকর-এর বই

চিরন্তন মাতৃত্বের মহিসময় আলেখ্য
দিবস ও যামিনী

তিন প্রিয় উপন্যাসের স্বর্ণসম্ভার
জন্মভূমি
(স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণ সুযোগ, বোধোদয়)

বিচিত্র পটভূমিকায় সুবৃহৎ উপন্যাস
বিত্তবাসনা

কত অজানাব্রের বারওয়েল সায়েবের কাহিনী
এই তো সেদিন

মানুষের মহাতীর্থে অচেনা মুখের বিচিত্র মিছিল
এখানে ওখানে

১২

সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী বাঙালীর নাম কী ? এ-বিষয়ে আমার মনে যত জিজ্ঞাসা ছিল তার অবসান ঘটলো আচমকা নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড নেশনস ভবনে এসে।

না, তিনি কলকাতার লোক নন, যদিও কলেজ স্ট্রীটের চক্রবর্তী চ্যাটার্জির দোকানে এক-আধবার বই কিনতে এসেছেন। আমাদের বইপাড়া তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়ী নগরীতে যিনি পরম সম্মানের সঙ্গে তাঁর প্রিয় সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন সেই মানুষটির সঙ্গে এই উপমহাদেশের বৃহত্তম জনপদের প্রায় কোনোরকম যোগাযোগ নেই বলতে একটু সংকোচ বোধ করছি। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন খাস কলকাতা শহরে। বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ আন্দোলনের হোতা প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্ত ওরফে অভয়চরণ দে জন্মেছিলেন কলকাতার শহরতলিতে। বিরাট এক নগরীতে গড়ে-ওঠার মানসিকতা নিয়েই ভারতবর্ষের জন্যে পশ্চিমের সিংহদ্বার খুলতে তাঁরা সাগরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং অভাবনীয় সাফল্যও অর্জন করেছিলেন।

এবার অবশেষে নিউ ইয়র্কে আমি যাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত এক গণ্ডগ্রামে। গ্রামের নামটা জানা হয়নি, কারণ এই ধরনের মানুষ নিজের অতীত সম্পর্কে বিশেষ কথা বলতে অনাগ্রহী। কিন্তু নদীর নাম জানা হয়ে গিয়েছে—কর্ণফুলী। এই নদীই দীর্ঘ দ্বাদশ বছর ধরে একটি দুরন্ত বালকের সংখ্যাহীন খেয়ালীপনার অংশীদার ছিল। সেই নদীর প্রাণশক্তিই এই ১৯৮৬-তে প্রাণবন্ত রয়েছে পঞ্চান্ন বছরের বিনম্র মানুষটির মধ্যে, যিনি এখনও পাতলা টেরিকটনের শাদা পাঞ্জাবি, শাদা ধুতি এবং পাম্পশু পরে আমাদের প্রজন্মের টিপিক্যাল বাঙালীর ভাবমূর্তি বিদেশে অক্ষত রেখেছেন। আর এমন সব অসম্ভব কাজ করে চলেছেন যার স্বীকৃতি রয়েছে জানা অজানা নানা দেশের কীর্তিমান নরনারীর সশ্রদ্ধ নমস্কারে।

অথচ কী আশ্চর্য, আমাদের এই দেশে শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের নাম প্রায় অজানা বললেই হয়। প্রায় বিশ বছর বাদে সাতদিনের নোটিশে আবার মার্কিন দেশ পুনঃভ্রমণের সুযোগ যখন এলো তখনই ঠিক করেছিলাম এবার এমন কিছু ভারতীয়ের সন্ধান করবো যাঁরা নিজেদের প্রতিভায় ও সাধনায় বিদেশে মানুষের শ্রদ্ধার আসনটি সংগ্রহ করেছেন।

যাবার আগেই আনন্দবাজার অফিসের উদ্যোগী সম্পাদকের ঘরে বসে কিছু নামধাম সংগ্রহ হলো। কেউ বললেন—অমুকবাবু জীব-বিজ্ঞানে বিদেশে খুব নাম করেছেন, অমুক এখন শল্যচিকিৎসায় বিশ্ববিদিত, অমুক এখন অর্থনীতিতে প্রায় এক নম্বর, অমুকবাবু এমন এক সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি করে ব্যবসায় নেমেছেন যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। খুব ভাল লেগেছিল এই তালিকা সংগ্রহ করতে। আরও ভাল লেগেছিল সেই তালিকার মধ্যে কয়েকজন বোস, চক্রবর্তী, সেন, গুপ্ত ইত্যাদির সন্ধান পেয়ে। কিন্তু অস্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই তালিকার তলার দিকেও কোনো ঘোষের উল্লেখ ছিল না।

আমার এই হঠাৎ দ্বিতীয়বার বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ভিতরের কাহিনীটা যথাসময়ে সবিস্তারে পাঠকের কাছে নিবেদন করতে হবে, কারণ স্বদেশ অথবা বিদেশ কোনো ভ্রমণই যে আমার ধাতে সয় না তা অনেকেরই অজানা নয়। আমি হচ্ছি সেই ধাতের ঘরকুনো যে শুতে পেলে বসতে চায় না, বসতে পেলে দাঁড়াতে চায় না, দাঁড়াতে পেলে যার হাঁটার কথাই ওঠে না। যে নামহীন মনীষী বহু বছর আগে বাঙালীর কানে-কানে অঋণী, অপ্রবাসী হয়ে ঘরের দুধ-ভাত খেয়ে নিজের চেনা পল্লী-বটছায়ায় জীবনযাপনের মহামূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনিই আমার নমস্য। সেই দূরদর্শী পুরুষও আমার শ্রদ্ধাভাজন যিনি হুজুগে বাঙালীকে হুঁশিয়ার করেছিলেন—ঘরের খাও, কিন্তু বনের মোষ তাড়িও না। রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার নেশা চাগাড় দিলে যত খুশি ভ্রমণ-সাহিত্য পড়ো, তাতে মন না ভরলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের গ্রাহক হও, কিন্তু কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে এবং বুক পকেটে পাসপোর্ট নিয়ে কিছুতেই বিদেশ-বিভুঁইয়ে রওনা দিও না।

ট্র্যাভেল এজেন্সির বড় মেমসায়েব, ট্যুরিজম কর্পোরেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে তামা-তুলসী স্পর্শ করে স্বীকারোক্তি করতে বলুন, তাঁরাও চুপি-চুপি মেনে নেবেন, নিজের ঘরের কোণের মতন জায়গা বিশ্বভুবনে নেই—নাথিং লাইক হোম। নাথিং লাইক নিজের চৌকি সে যতই নড়বড়ে হোক!

এই সব অকাট্য যুক্তির পরেও যদি জাম্বোজেটের বিমানবালাদের মোহিনী হাসি রঙিন ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন-পাতা থেকে বেরিয়ে এসে কাউকে নীতিভ্রষ্ট হবার অবকাশ দেয়, তাহলে অগতির গতি রবি ঠাকুরের শরণ নিতে হবে।

তিনিও অতি চমৎকার ভাষায় অযথা বহুদেশ ঘুরে ঘরের কাছে শিশিরবিন্দুকে অবহেলা না-করার স্ট্রং অ্যাডভাইস দিয়েছেন।

আমাদের ঘরকুনো সোসাইটি এখনও রেজিস্ট্রিকৃত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। কিন্তু আমরা কয়েকজন সমভাবাপন্ন বঙ্গপুঙ্গব প্রায়ই জনসাধারণকে বলে আসছি, যদি কিছু দেখতেই হয় ঘরের কাছে কলকাতা দেখুন। এক নয়, পর পর সেভেন জেনারেশন ধরে এ-শহরের লীলাখেলা অবলোকন করলেও সিকিভাগ দেখা হবে না। জেনুইন বাঙালী হয়ে জন্মে আপনার কিসের দুঃখ যে আচমকা বিবাগী সেজে বিদেশে যাবেন?

শুনুন, বিদেশ যাবার হাজার হাঙ্গামা। পাসপোর্ট অফিসে সিভিলিয়ান ড্রেসে চোরাগোপ্তা পুলিশ সব বসে আছেন। তাঁদের চাপা হুঙ্কার—তুমি কে বট হে? সুখে থাকতে কেন বিদেশে যাবার ভূত তোমায় কিলোচ্ছে? তাঁরা গোপনে-গোপনে মোটা মোটা খাতাপত্তর মেলাবেন—কবে আপনি কি গর্হিত কম্মো করেছেন। কোন্ অভিযোগে স্বনামে অথবা বেনামে আপনি জেল হাজতে বসবাস করেছেন? আপনার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলা ঝুলছে কিনা? রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোন্ কোন্ অপকর্মের সঙ্গে আপনার প্রকাশ্য অথবা গোপন যোগসাজশ রয়েছে? কিংবা কিঞ্চিৎ বিদেশী মুদ্রার লোভে আপনি দেশের শত্রুদের সঙ্গে সিক্রেট যোগাযোগ রেখে ভারতমাতাকে আবার গভীর গাড্ডায় ফেলবার তালে আছেন কি না? ছা-পোষা লোক হিসেবে কফি-পোষার খপ্পরে পড়বার চান্স আছে কিনা তা-ও বাজিয়ে দেখা হবে—অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রায় বিদেশী বাণিজ্যে টু-পাইস করে আপনি গরীব ভারতমাতাকে কাঁচকলা ঠেকাচ্ছেন কিনা তা-ও অতি সাবধানে বিচার-বিবেচনা করা হবে।

সাব-ইনেসপেক্টর বাবুর দরবারে এই সব প্রশ্নের আশানুরূপ সমাধান হলেও আপনার হাঙ্গামা শেষ হচ্ছে না। বিদেশ থেকে যদি আপনাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেয় তাহলে আপনাকে জননী-জন্মভূমির নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনার খরচাপাতি কিভাবে মেটানো হবে তার আগাম হিসেবও আপনাকে দাখিল করতে হবে।

নিজের দেশে জন্মে একই চৌহদ্দির মধ্যে সারাজীবন চরে বেড়ানোর একটা মস্ত সুবিধে, কারও পিতৃদেবের সাহস হবে না আপনাকে এই সব আজেবাজে প্রশ্ন করে ঘাঁটাবার।

স্বদেশের মাটিতে দিশীভায়ের খোঁচামারা কোশ্চেন তবু তো সহ্য হয়! কিন্তু অজানা দেশের এয়ারপোর্টে পাশপোর্ট ও ভিসা থাকা সত্ত্বেও ভিনদেশের ইমিগ্রেশন-রমণী আপনার দিকে বরফ-ঠাণ্ডা চোখে এমনভাবে দৃষ্টি হানবেন যেন

আপনি কোনো মহা অপকর্ম করবার জন্যেই নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশের দরজায় হাজির হয়েছেন।

মিষ্টি-মিষ্টি কণ্ঠে হাড়জ্বালানো প্রশ্ন : কেন আসা হয়েছে? কী কী কাজে এখন মন দেওয়া হবে? পরের দেশে ঢুকে পড়ে পাকাপাকি গেঁড়ে বসবার কোনো কুমতলব নেই তো? টক-ঝাল প্রশ্ন শুরু হলে আর থামতে চাইবে না।

ইমিগ্রেশন-দিদিমণিকে আপনি হয়তো অনেক কষ্টে সন্তুষ্ট করলেন। কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই। তিনি কমপিউটারের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলে আপনাকে আর-এক কদম এগোতে দিলেন। অমনি ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার—অর্থাৎ আপনি কাস্টমসের খপ্পরে পড়লেন।

কাস্টমস বলতে ছোটবেলায় ইংরিজিতে পড়েছিলাম আচার-ব্যবহার —কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ইউনিফর্ম-পরা একদল সন্দেহবাজ লোক, যাঁদের ধারণা আপনি স্পেশাল কায়দাকানুন করে গাঁজা-সিদ্ধি-চরস অথবা সোনা-রুপোর বাট নিয়ে নিরীহ একটি দেশের নৈতিক চরিত্র এবং অর্থনীতি ডোবাতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কিন্তু সদাসতর্ক 'কাস্টমসদা' তা কিছুতেই হতে দেবেন না।

এ ছাড়াও তৃতীয় এক ভাবনা সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভ্রমণ-হাঙ্গামায়। বেশ, আপনি পরের দেশে ঘরজামাই থাকতে কিংবা গাঁজা বেচতে আসেননি ভাল কথা, কিন্তু আপনি যে বিমান অথবা বিমানবন্দর বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার প্যাঁচপয়জার কষছেন না তার গ্যারান্টি কোথায়?

আপনি বলবেন, রাইস ইটিং ভেতো বাঙালী আমি। মুখের ভাব দেখে মানুষ চিনলেন না, এতোদিন আরক্ষা লাইনে থেকেও! তাহলে শুনবেন, তথাকথিত নিরীহ, ফ্রায়েড ফিশ যারা উল্টে খেতে পারে মনে হচ্ছে না, তাদের মাসতুতো ভাইরাই মহাশূন্যে বিরাট-বিরাট প্লেন হাইজ্যাক করেছে। চান্স পেয়ে পাঁচ টাকার চোর কোটি-কোটি ডলার পণ দাবি করেছে। আগে বাঙালী পুত্রের ভাগ্যবান বাপই মেয়ের বাপের কাছ থেকে বরপণ দাবি করতো। এখন মওকা পেলেই দুনিয়ার যে-কোনো লোক মুক্তিপণ চেয়ে বসে। অথচ পণপ্রথার কালিমা কেবলমাত্র ইন্ডিয়ান জাতের ওপরেই থেকে গেলো!

যাই হোক, এই সব দুঃখেই কুড়ি বছর আগে পাওয়া নিজের পাশপোর্টকে চিরকালের জন্যে অকেজো করে মনের সুখে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছিলাম। কিন্তু কপালে দুঃখ লেখা ছিল, কুড়ি বছরের পুরনো বিষ আবার শরীরে ফুটে বেরুলো, আমি পাকেচক্রে সাতদিনের নোটিশে আবার আমেরিকায় হাজির হলাম।

কোথায় কী অঘটন ঘটলো? কে যাতায়াতের ব্যবস্থা করলো? ইমিগ্রেশন রমণী আমাকে কিভাবে একাধিকবার হাতের লেখা প্রাকটিশ করতে বললেন,

জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট দেখে আমার দিশেহারা অবস্থার কী পরিণতি ঘটলো এবং কিভাবে হাতে-বাঁধা তাবিজের কল্যাণে সব বাধাবিপত্তি ডোণ্টকেয়ার করে আমি ওহায়ো রাজ্যের ক্লিভল্যাণ্ড শহরে ধুতি-চাদর পরা প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের খপ্পরে পড়লাম সে-সব সংবাদ যথাসময়ে নিবেদন করা যাবে। আপাতত ধরে নিন আমি নিউ ইয়র্কে।

আমি আছি ম্যানহাটান দ্বীপপুঞ্জে ইউ-এন বিলডিংসের খুব কাছে। যিনি আমাকে পরমানন্দে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন, বয়সে তরুণ হলেও তিনি এক কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তি—ইউ-এন অফিসের তাবড়-তাবড় স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁকে কথায়-কথায় হিজ এক্সেলেন্সি বলে সম্মান প্রদর্শন করেন। নাম জনাব আনোয়ার উল-করিম চৌধুরী, আমাদের জয়। ইউ-এন-ও-তে বাংলাদেশ সরকারের দু'নম্বর স্থায়ী প্রতিনিধি। এক নম্বর পদ খালি, সুতরাং অস্থায়ী হেড অফ দ্য মিশন।

এতো সায়েবসুবো টেলিফোনে এবং সামনাসামনি আমার স্নেহভাজন এই বঙ্গসন্তানটিকে 'ইওর এক্সেলেন্সি' বলছে শুনে কান জুড়িয়ে গেলো। মনে হলো বঙ্গজনম সার্থক হলো। জিন্দা রহো বাংলাদেশ! জয় বাংলা বলতে লোভ হচ্ছিল, কিন্তু সম্প্রতি-ছড়ানো চোখের রোগটির ডাকনাম স্মরণ করে চুপচাপ থাকাই প্রশস্ত মনে হলো।

ম্যানহাটানে আনোয়ারের বাড়িতে বসেই বিদেশে বিখ্যাত বাঙালীদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সম্পাদক অভীক সরকার নিজের ঠাণ্ডাঘরে বসিয়ে পই-পই করে বলে দিয়েছেন, নতুন-নতুন জিনিস দেখে আসতে হবে। "মনে রাখবেন, সাতষট্টি সালের বিদেশ-ভ্রমণ থেকে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' লিখে খালি মাঠে গোল করেছিলেন। এখন আমেরিকা সবার অত্যন্ত জানা দেশ, ওদেশ সম্বন্ধে যত লেখার বিষয় ছিল তা এই ক'বছরে প্রায় সব লেখা হয়ে গিয়েছে—সুতরাং অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে অজানা দৃষ্টিকোণ খুঁজে বার করতে হবে।"

সম্পাদকের এই সাবধানবাণী বিদেশে আমার সব সুখ কেড়ে নিয়েছে, কিছুই প্রাণভরে উপভোগ করতে পারছি না। হাজার-হাজার শিক্ষিত বাঙালী ঘন-ঘন আমেরিকায় আসছেন-যাচ্ছেন। তাঁদের সবারই চোখ দুটো ভগবান একই জায়গায় এঁকেছেন—সুতরাং দৃষ্টিকোণ নতুন হবে কী করে? ক'দিন বিদেশে ঘুরে-বেড়িয়ে অজানা এমন কী দেখা যাবে যার সম্বন্ধে এখনও লেখা হয়নি? ঘরে ফিরে গিয়েই লিখতে বসতে হবে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে যে-মানুষ ভ্রমণে বের হয় তার মতো অভাগা এই পৃথিবীতে কে আছে?

বিখ্যাত বাঙালী বলতে নিউ ইয়র্কে বিশ বছর আগে রবিশঙ্করকে দেখেছিলাম। তখন প্রচণ্ড নাম-ডাক তাঁর। আমার নামের পাশেও একটা শংকর থাকায় কিছুটা সুবিধেও হয়েছিল। দু'একটি কিশোরী শ্বেতাঙ্গিনী জানতে চেয়েছিলেন আমি ও রবি আত্মীয় কিনা। রবিশঙ্কর ইতিমধ্যে দেশে ফিরে গিয়েছেন। চোখের সামনে সারাক্ষণ না থাকলে এদেশের মানুষ কাউকেই মনে রাখতে চায় না, একমাত্র যীশুখ্রীস্ট ছাড়া। আর একজন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অন্য রেকর্ড করবেন—বাংলাদেশের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, ইউ-এন জেনারেল অ্যাসেমব্লির প্রথম (আমাদের জীবনের শেষ) বাঙালী সভাপতি হবেন। একশ পঁচিশ বছরের মধ্যে এ সুযোগ আর আসবে না। কিন্তু হুমায়ুন চৌধুরী জেনারেল অ্যাসেমব্লির গদিতে বসবার আগেই আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

বিদেশে বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, ব্যবসায় ও পেশায় কৃতী ভারতীয়দের তালিকা আমার নোটবইয়ে ইতিমধ্যেই কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আনোয়ার উল-করিম চৌধুরী হঠাৎ শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের কথা তুললো। আমি ওঁর সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর রাখি না শুনেও সে কিছুটা অবাক হলো। "শ্রীচিন্ময়ের নাম সত্যিই কলকাতায় আপনারা শোনেননি ?"

অপরাধ নতমস্তকে স্বীকার করে নিতে হলো। আনোয়ার স্বভাবে অতি বিনয়ী। কিন্তু হাবেভাবে যা বললো—গেঁয়োযোগী নিজের গাঁয়ে ভিখ পায় না, কিন্তু অন্য গাঁয়ে পূজা পেলে সে-খবর তার নিজের গাঁয়েও অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বাঙালীদের চরিত্র আলাদা—কোনো মানুষের সামান্য মঙ্গলও পরশ্রীকাতরের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

আনোয়ার বললো, "চলুন আপনাকে ইউ-এন ঘুরিয়ে আনি।" যন্ত্রবৎ বিশাল ভবনটির একের পর এক তলা ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেই সব জায়গা দেখছি, যা প্রায়ই সংবাদপত্রের শিরোনামায় উপস্থিত হয়। সেই সব সভাকক্ষ, যেখানকার আলাপ-আলোচনায় বিশ্বের কোটিকোটি অসহায় মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

বেশ কয়েকটি তলা ঘোরার পর কফিশপে এসে আমার প্রদর্শক জিজ্ঞেস করলো, "স্পেশাল কিছু নজরে পড়লো ?"

"নজরে পড়েছে, কিন্তু তুমি বয়োকনিষ্ঠ, বলতে সংকোচ বোধ করছি। মহিলাদের বেশবাস লক্ষ্য করে একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠছি—শাড়ি ব্লাউজ এতো বেশি দেখবো আশা করিনি। শাড়ি কি শেষ পর্যন্ত ইউ-এন বিজয় করবে ? মেমসায়েবদের বেশ দেখায় কিন্তু এই শাড়িতে।"

"এই তো পয়েন্টে এসে গিয়েছেন !" বললেন আমাদের আর একজন বাংলাদেশী সঙ্গী, যিনি ইউনিসেফে কাজ করেন। যা জানা গেলো, "পৃথিবীর

পাঁচ মহাদেশের শত শত মহিলাকে এখানে শাড়ি পরতে দেখবেন। শাড়ির নমনীয়তা ও সহজাত সৌন্দর্য এঁদের আকৃষ্ট করেছে ভেবে ভুল করবেন না। এর পিছনে রয়েছেন একজনই—তিনি শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ।"

আমি আরও সজাগ হয়ে উঠলাম। শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণাঙ্গিনী, চীনা, জাপানী সব রকমের শাড়ি পরিহিতা মহিলাই নজরে পড়লো। ইন্ডিয়ান সিল্কের প্রচারকরা নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখলে উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতেন।

হাঁটতে-হাঁটতে এবার আরও বিস্ময়! শুনলাম, এইসব মহিলা নাকি শুধু শাড়িই পরেন না, সবাই বাংলা গান জানেন। এক আধটা নয়, কয়েক শত। আনোয়ার বললো, "কিছুদিন আগে কার্নেগি হলে এক অনুষ্ঠানে এরা আমাকে অবাক করেছিল। কয়েক শ সায়েব-মেম শ্রীচিন্ময়ের নির্দেশে কয়েক ডজন বাংলা গান শোনালো, এমন কি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতও!"

সেই সভায় ইউ-এন-ও-র অসংখ্য দেশের জাঁদরেল সব প্রতিনিধি দল বেঁধে গিয়েছিলেন। সভাগৃহ একেবারে বোঝাই। ইউ-এন সেক্রেটারি জেনারেল তো বিশেষ ভক্ত, হুট বলতেই চলে আসেন শ্রীচিন্ময়ের ডাকে। এবং এ-ব্যাপারটা আজকের নয়—শুরু হয়েছিল উ-থান্টের সময়ে। তারপর যিনিই এ-পদে বসেছেন তিনিই শ্রীচিন্ময়কে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন—কুর্ট ভেল্ডহাইম, দ্য কুয়েলার পর্যন্ত। কিছুদিন আগে জেনারেল অ্যাসেমব্লির সভাপতি ছিলেন Jorge Illucca (বাংলা উচ্চারণ জর্জ ইউয়েকা)—এখান থেকেই পানামার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। ইনিও চিন্ময়ভক্ত।

এবার আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। খবরাখবর নেওয়া শুরু করলাম। সরকারী ব্যাপার এই ইউ-এন-ও—নিজের দেশের সরকারী তকমা পরে এখানে সবাই আসেন। এর মধ্যে অদ্ভুত এক ব্যতিক্রম এই শ্রীচিন্ময় ঘোষ। সেক্রেটারি জেনারেলের আমন্ত্রণে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টার—প্রতি সপ্তাহে দু'দিন দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকের সময় শ্রীচিন্ময় এখানে আসেন। তখন বেসমেন্টের সভাঘরে প্রবল উদ্দীপনা দেখা যায়। হয়তো দেখবেন কানাডার রাষ্ট্রদূতের পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন সুইডেনের স্থায়ী প্রতিনিধি, তাঁর পিছনেই হয়তো জাপানের সহকারী রাষ্ট্রদূত এবং কোরিয়ার প্রবীণ প্রধান। একটু পরেই হয়তো হাজির হলেন ইউ-এন-ওর এক নম্বর দু'নম্বর কর্ণধাররা। তার পাশের আসনটিতেই হয়তো একজন সাধারণ মহিলাকর্মী।

সপ্তাহে দু'দিন এঁরা এখানে আসবেনই—হয়তো একশ পঁচিশটা দেশেই রয়েছে কিছু শ্রীচিন্ময়-অনুরাগী।

এই দু'দিন ছাড়াও প্রতি মাসে ইউ-এন-ও-র নিমন্ত্রণে শ্রীচিন্ময় ড্যাগ হ্যামারশিল্ড স্মৃতি-বক্তৃতা করেন। নানা বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যেও ড্যাগ

হ্যামারশিল্ড এখানে একটি অতি শ্রদ্ধেয় নাম। তাঁর একটি কথা শ্রীচিন্ময়ের খুব প্রিয়— 'যে-শান্তি সবাইকে শান্তি দিতে পারে না তা শান্তি নয়।' স্মৃতি-বক্তৃতা চলেছে বছরের পর বছর ধরে, কিন্তু এখনও শ্রোতার এবং ভক্তের অভাব হয় না, প্রায়ই বসবার সব আসন বোঝাই হয়ে যায়।

যেখানে পদে-পদে এক দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে আর-এক দেশের প্রতিনিধির মতভেদ সেখানে শ্রীচিন্ময়ের ব্যাপারে অনেকের একমত হওয়া বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। এই তো কিছুদিন আগে ইউ-এন-ও-র চল্লিশতম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপিত হলো, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো অফিসিয়াল বাণী দেওয়া সম্ভব হলো না, এ বাণীর বয়ান নিয়ে দু'দলের মধ্যে প্রবল মতভেদ হলো। কিন্তু বেসরকারীভাবে অনেকেই এলেন শ্রীচিন্ময়ের মেডিটেশন সেণ্টারে। কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে শুভদিন উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। সেই ১৯৭০ সাল থেকে তিনি এখানে অসংখ্য মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা জাগ্রত করেছেন—ধর্মমত বিভিন্ন, কিন্তু তাতে কোনো বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না।

আমার প্রদর্শকদের জরুরী কাজকর্ম ছিল। তারা একটি শ্বেতাঙ্গিনী শাড়ি পরিহিতার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েই কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিলো। মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, "আমাকে ডেকো 'ঋজুতা' বলে।" এটা যে আমাদের দিশি নাম তা বুঝতে একটু সময় লাগলো। মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো, "পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আমরা এসেছি এখানে। আমাদের সেতু হচ্ছেন শ্রীচিন্ময়।"

"মিস্টার চিন্ময় ঘোষ বলো না কেন?"

"বাঃ রে, শ্রীকথাটা কি কম মিষ্টি? দেখো, উনি আমাদের কোনো বন্ধনের মধ্যে ফেলেন না। কিন্তু আমরা যখন ওঁর খুব কাছে আসতে চেষ্টা করি তখন ভাবি উনি কবে খুশি হয়ে আমাদের একটা বাংলা নাম দেবেন। বাংলা নাম পাবার জন্যে কত লোক যে পাগল! আমাদের মধ্যে এখানে পাবে 'নয়না', 'নীলিমা,' 'রঞ্জনা'।"

"তোমরা এই সব নামের অর্থ বোঝো?"

"বাংলা তো জানি না, কিন্তু ওঁর কাছে মানে জেনে নিই—আমার নামের অর্থ স্টেট, কোনো আঁকা-বাঁকা নেই। শ্রীচিন্ময় কখনও-কখনও আবার মজার নাম রাখেন ইচ্ছে করে—আমার এক বান্ধবীর নাম রেখেছেন 'লোভনীয়া'। হাউ সুইট!"

"এই মেয়েটির কি একটু আধটু খাবারের লোভটোভ আছে?"

"ও নো। না না! শি ইজ অ্যাট্রাকটিভ! পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই যে অ্যাট্রাকটিভ এই দুর্লভ শিক্ষা আমরা শ্রীচিন্ময়ের কাছে পেয়েছি।"

শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষ সায়েবদের মধ্যেও বাংলা নাম পাবার জন্যে হুড়োহুড়ি। পৃথিবীর সেরা শহরের সেরা দরজির তৈরি সর্বাধুনিক সুট পরিহিত সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, তার নাম 'কাঙাল'। ওই কাঙাল আসছে—কিন্তু নিজের চোখে ইউ-এন ভবনে তাকে রাজকীয়ভাবে না দেখলে মনে হতো স্বপ্নে উলটোপুরাণের দেশ দেখছি।

কাঙাল শব্দটির ইংরিজী অর্থ যে 'বেগার' তা আমার নতুন পরিচিতাকে বিব্রত করলো না। বললো, "কাঙাল নিজেই বলেন উনি হলেন 'ডিভাইন বেগার'।"

আর একটি শাড়ি পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী আমাদের দলে যোগদান করলেন। তরুণী, তন্বী ও সুন্দরী। আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, "তুমি কত ভাগ্যবান! তুমি বাংলায় জন্মেছো, তুমি বাংলা জানো। আমরা বাংলা জানি না, শ্রীচিন্ময় অনেক সময় বাংলায় কথা বলেন, আমরা আন্দাজে বুঝে নিই। তোমার মতন বাংলা জানা থাকলে ওঁর আরও কাছে আসতে পারতাম।"

এঁদের প্রায় কেউই ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে আসেননি। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার জন্যে কী আন্তরিক চেষ্টা!

"কে তোমাদের শাড়ি পরতে বলেছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কেউ না! শ্রীচিন্ময় খুশি হলেও হতে পারেন এই ভেবে নিয়ে আমরা শাড়ি পরে অফিসে আসি। উনি তো আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। মনে রেখো, অনেকেই ওঁর সভায় আসেন নিজের-নিজের পোশাক পরে। ও-নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই কারুর।"

ইতিমধ্যে আমরা আবার একটা কফিকেন্দ্রে ঢুকে পড়েছি। শাড়ি পরিহিতা নবাগতা যে একজন ফরাসী তা বোঝা গেলো। ফরাসিনীকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী এমন শিক্ষা তোমরা ওঁর কাছে পাও যা তোমাদের এমনভাবে বিস্মিত করে?"

"একদিন আমাদের দুপুরবেলার মেডিটেশনে এসো, নিজের কানেই শুনবে। আজকাল বেশির ভাগ সময় অবশ্য নিস্তব্ধতা—কোনো কথাই হয় না, কিন্তু এমন একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে যে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই খুঁজে পাই। তারপর কিছু কিছু গান হয়, আমরা যে যা পারি গাই—বেশির ভাগ বাংলা গান। এতো বিভিন্ন ভাষার মানুষ উপস্থিত থাকেন, কিন্তু অসুবিধা হয় না—বাংলার সুর ওঁদের হৃদয়ে পৌঁছে যায়।"

আমি শিক্ষা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করি। ফরাসী যুবতী কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো, "উনি আমাদের বলেন মানুষকে দেখলেই প্রথমে তার কি নেই তা মনে আনবে না—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো সীমাহীন

সম্ভাবনা রয়েছে।"

আমি বললাম, "এই কথা আমাদের দেশে যুগযুগান্ত ধরে বলা হচ্ছে।"

"হাউ লাকি ইউ আর!" ফরাসী সুন্দরী এবার যেন আমাকে হিংসে করতে আরম্ভ করলো। "তোমরা, পূর্বদেশের লোকরা, মানুষের অমূল্য চিন্তার মণিমাণিক্য হাজার-হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছো। এবার আমরা শ্রীচিন্ময়কে পেয়েছি, আস্তে-আস্তে কুড়িয়ে নেবো আমরা, তোমাদের মতো সব বুঝে নিতে একটু সময় লাগবে এই যা।"

আমাদের টেবিলে আর এক মহিলা এসে যোগ দিলেন। বললেন, "আমি নতুন এসেছি—সবাইকে চিনি না—কিন্তু ধ্যানসভায় গিয়ে খুব শক্তি পাই। ওই দু'দিন আমি লাঞ্চ খাই না, সোজা ওখানে চলে যাই। সব বুঝি না, কিন্তু ভাল লাগে।"

ফরাসিনীর কাছে আমার এখনও কিছু জানবার আছে—জীবনযাত্রা সম্বন্ধে শ্রীচিন্ময়ের কোনো বিশেষ নির্দেশ আছে কিনা?

"অনেকদিন ধরে যোগাযোগ রেখেছি। কখনও কিছু নির্দেশ দেন না। খুব ধরাধরি করলে বলেন, দিনে একবার ধ্যানে বোসো। যারা আরও এগোতে চায় তারা দিনে দু'বার। তবে আমরা সারাক্ষণ চেষ্টা করি খুঁজে বার করতে কিসে চিন্ময় খুশি হন। যেমন ধরো আমি স্মোক করতাম—ছেড়ে দিয়েছি। নিজের মন থেকেই যেন নির্দেশ পেলাম। ড্রাগের নেশা আমার ছিল না—দু'একজন নিজের অন্তরের তাগিদেই ড্রাগকে গুডবাই করেছে। মাংস আমি অফিসিয়ালি ছাড়িনি—কিন্তু মাংস আমার আর ভাল লাগে না, আমি এখন ওঁর মতন ভেজিটারিয়ান হতে চাই।"

আমি সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে আছি। সে হেসে বললো, "আমি একবার ওঁকে একান্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি সরল শিশুর মতন হেসে বললেন, 'যা নিজে ভাল মনে করবে তাই করবে'—ডুইং দ্য রাইট থিং—তাই চেষ্টা করি, মনে অনেক শান্তি পেয়েছি।"

উল্টোপুরাণের দেশে গভীরে ঢুকে যাচ্ছি আমি! এই সব যোগযাগ, তন্ত্রমন্ত্র-তপস্যায় আমার তেমন বিশ্বাস নেই। যদিও ছোটবেলা থেকে মঠে-মিশনে আমার যাতায়াতের সুযোগের অভাব হয়নি। পশ্চিমের বিজ্ঞানী মন এখনও খুব বিচক্ষণ এবং যুক্তির ছাঁকনিতে যাচাই না-করে কোনো কিছুই তারা গ্রহণ করে না, এই খবরই আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার অবস্থা বুঝুন। খোদ নিউ ইয়র্ক শহরে, ইউ-এন ভবনের কফি টেবিলে বসে আমি অতীত ভারতবর্ষের আকর্ষণে সম্মোহিত যুবক-যুবতীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। তারা বিশ্বাস ক'রে সুখী হতে চায়।

মেয়েরা আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে এবার নিচু গলায় গান ধরলো। মেমরা গাইছে বাংলায় ঃ

"নামিছে আজ আনন্দ প্লাবন
মৃদুল পবন প্রাণে করে আনন্দ বহন
ভাঙিছে মোর সকল বন্ধন
খুলিছে সব দ্বার
মিলি গেছে ব্যথাভার
যত অন্ধকার।"

মার্কিন, ফরাসী এবং বৃটিশ উচ্চারণের ঐকতান! বাংলা কথাগুলো কিছু বুঝছি, কিছু হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। কিন্তু বিপুল উদ্দীপনা বোধ করছি। মনে হচ্ছে, এবার নিউ ইয়র্কে না এলে আমার ভারতসন্ধান অপূর্ণ থেকে যেতো।

মেয়েটি খুব লজ্জা পাচ্ছে—উচ্চারণের দীনতার জন্য ক্ষমা চাইছে বার-বার। আর আমার লজ্জা ততই বাড়ছে। গানটা আমি বাংলায় লিখে নেবার চেষ্টা করে সফল হচ্ছি না দেখে একজন সুন্দরী বলে উঠলো, "আমি বাংলা অক্ষর জানি না। কিন্তু যদি তুমি কিছু মনে না করো, রোমান অক্ষরে লিখে দিতে পারি।"

অবাক কাণ্ড। অতি দ্রুত ছ'টা লাইন ইংরিজি অক্ষরে লেখা হয়ে আমার হাতে চলে এলো। মার্কিন সুন্দরী বললো, "গান শেখবার আগে আমি এইভাবে লিখে নিই—দরকার হলে কমপিউটারে জমা করে রাখি।"

"কত গান জানা আছে?"

আবার অবাক হবার পালা। দু'শ তিনশ বাংলা গান এদের কাছে কিছুই নয়। ওরা ততক্ষণে আমাকে নিজের নামে ডাকতে আরম্ভ করেছে। "তুমি জানো শংকর, ওঁর যখন মুড আসে তখন শত-শত গান লিখে ফেলেন। তারপর নিজেই সুর দেন। আমরাও অভ্যেস করে নিই।"

"কিন্তু তোমরা কি অন্ধের মত অনুকরণ করো? না কিছু বুঝতে পারো?"

হাসলো ফরাসিনী। "আনন্দ প্লাবন আমরা বুঝতে পারি—ফ্লাড অফ ডিলাইট। কিন্তু তেমন বুঝতে পারি না—মৃদুল পবন প্রাণে করে আনন্দ বহন। 'লম্বু'র কাছে একবার বুঝতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বলেছিল ইণ্ডিয়ান ওয়েদার এবং মেটিরিওলজি সম্বন্ধে ক্লিয়ারকাট আইডিয়া না থাকলে টোটাল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং সম্ভব নয়।"

আমার ভাল লাগছে, আবার ভয়ও লাগছে। পূর্বদেশীয় গুরুদের সম্বন্ধে এখন সমস্ত মার্কিন দেশের জনসাধারণের যথেষ্ট সন্দেহ। এঁদের কয়েকজনের কীর্তিকাহিনী ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে—খুন জখম গুণ্ডামি

স্বেচ্ছাচার কোনো কিছুই এই সব কাহিনী থেকে বাদ থাকে নি।

অধ্যাত্মবাদীদের সম্পর্কে জনগণের এই সন্দেহের কথা আমি ইচ্ছে করেই তুললাম। মার্কিন যুবতী হাসলো। "ঠিক একই প্রশ্ন শ্রীচিন্ময়কে করেছিলেন একজন স্থানীয় সাংবাদিক। উনি কোনো রকম বিরক্তি না দেখিয়েই চমৎকার উত্তর দিলেন। বললেন, 'একই পরিবারের একজন ভাই হয়তো ভাল, আরেক ভাই হয়তো খুব খারাপ। কিন্তু এই খবর থেকে সেই পরিবারের অন্য লোকরা ভাল কি মন্দ আন্দাজ করাটা কি যুক্তিযুক্ত হবে?' কাগজটা আমার বাড়িতে আছে, তোমাকে দিতে পারি—এখানকার কাগজওয়ালারা কাউকে অন্ধভাবে স্তুতি করে না, লেখার আগে অনেক কিছু বাজিয়ে দেখে।"

মহিলারা অতিমাত্রায় অতিথি-বৎসলা। আমাকে একবারও কফির দাম দেবার সুযোগ দিলো না। শ্রীচিন্ময়ের দেশের লোক পেয়ে মৃদুল পবন কেমন করে প্রাণে আনন্দ বহন করে নিয়ে যায় তা জানবার চেষ্টা করতে লাগলো পূজারিণীর প্রসন্নতায়।

ইতিমধ্যে আমার স্থানীয় গার্জেন নিজেদের কাজকর্ম সেরে কফিশপে ফিরে এলো আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। আনোয়ার বললো, "সুখবর আছে। আগামীকাল দুপুরে আপনি ইচ্ছে করলে ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টারে উপস্থিত থাকতে পারেন। তার থেকেও সুখবর, শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে আপনার একান্তে দেখা হবার এবং কথাবার্তা বলার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথায় দেখা হবে, কখন দেখা হবে তা আজ রাত্রেই জানা যাবে। আপনি একজন বিখ্যাত বাঙালীর সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে তৈরি হয়ে থাকুন।"

মেয়েরা বললো, "কাল আবার দেখা হচ্ছে প্রার্থনাসভায়।"

আমি বললাম, "আরও বাংলা গান গাইবে তো?"

ওরা বললো, "সেটা নির্ভর করবে শ্রীচিন্ময়ের নির্দেশের ওপর। উনি যা চাইবেন আমরা তা করবো।"

"সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই তীর্থক্ষেত্রে এসে শেষ পর্যন্ত গুরু-ফুরুর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন!" শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছি জেনে নিউ ইয়র্কের এক বাঙালী শুভানুধ্যায়ী মিস্টার সেন আমার সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

এই ভদ্রলোক সন্ধ্যাবেলায় বললেন, "জ্ঞানকে কিভাবে মানুষের ভোগে নিয়োগ করা যায় তার জন্যে পৃথিবীর বৃহত্তম কর্মযজ্ঞ চলছে নবীন এই মার্কিন মহাদেশে। জাপান-টাপান যাই বলুন, কেউ এখনও এর নখের যোগ্য নয়। সমস্ত কিছু মন দিয়ে লক্ষ্য করে দেশে ফিরে গিয়ে মানুষকে কোথায় বলবেন—হচ্ছে হচ্ছে হবে-হবে মনোবৃত্তি ত্যাগ করে বিজ্ঞানের সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়ো, তা নয় এই বিদেশেও সাধুসন্ন্যাসীর দিকে মন দিলেন!" আমার বিজ্ঞানীবন্ধু সেনসায়েবের কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ, কিছুটা সমালোচনার সুর।

বললাম, "যতটা খবর পেয়েছি, এই শ্রীচিন্ময় সাধুও নন, সন্ন্যাসীও নন। ভারতের যুগ যুগান্তের চিন্তাধারার একজন বিশ্লেষক ও প্রচারক মাত্র।"

আরও বললাম, "আমাকে ক্ষমা করুন, এই আধ্যাত্মিক মানুষদের সম্পর্কেই তো সায়েবদের যত আগ্রহ—রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, বিজ্ঞানে আমরা যতটুকু করছি তা পশ্চিমের মনে এখনও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। স্রেফ জাপানের মতন স্বীকৃতিটুকু পেতেই বহু যুগ কেটে যাবে। অথচ অধ্যাত্মবাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদেশে এখনও সুবিপুল কৌতূহল।"

সেনসায়েব বললেন, "শুনুন শংকরবাবু, গুরুর ভেক ধরে কত লোক যে এদের ঠকাচ্ছে। এক-একজন এক-একটা 'কান্ট'-এর সৃষ্টি করছে—তারপর রঙিন ফানুশ ফেটে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের বদনাম হচ্ছে। একটা কথা জেনে রাখবেন, এই দেশ ঠকতে রাজি নয়—ঠকালে এদের মেজাজ ঠিক থাকে না।"

"স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্ত—কেউ তো এঁদের ঠকাননি। বাঙালী প্রভুপাদ সত্তর বছর বয়সে দুর্জয় মনোবল নিয়ে এই তো সেদিন নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করে যে অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করলেন তা ভারতের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু নিজের দেশে বিবেকানন্দের মতন স্বীকৃতি তিনি আজও পেলেন না।"

সেনসায়েব সুরসিক, এক কালে প্রচুর বাংলা চর্চা করতেন তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। মিষ্টি হেসে তিনি উদ্ধৃতি দিলেন, "একদিকে প্রভুপাদের শেষজীবন খুবই ড্রামাটিক।"

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম/ সর্বত্র হইবে প্রচার মোর নাম। দেশে থাকতে ছোটবেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠে আমিও শুনেছিলাম। শ্রীচৈতন্যের এই বাণী যে এমনভাবে কারও সাধনায় সত্য হবে তা কল্পনার অতীত ছিল। আমেরিকায় খোল করতাল বাজিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচার করে ভক্তিবেদান্ত তা সার্থক করলেন ১৯৬৫ সালে জীবনের সায়াহ্নবেলায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে কী হচ্ছে দেখুন!"

বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে সেবার ইসকন সম্পর্কে কিছু দুশ্চিন্তা করার

মতন খবর বেরিয়েছে—এঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থাকছে না।

সেনসায়েব এবার একটি ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটালেন। "প্রভুপাদকে আমি শ্রদ্ধা করি, মাত্র বার বছর বয়সে কার্তিক বোস ল্যাবরেটরির প্রাক্তন কর্মচারি বিদেশে যা করেছেন তা তুলনাহীন, কিন্তু সায়েবদের বোধহয় তিনি পুরোপুরি চিনতে পারেননি।"

"কী বলছেন, মিস্টার সেন!"

"আমি ঠিকই বলছি। ভারতীয় গুরুর সায়েব-ভক্ত দেখলে আমরা খুব আনন্দ করি। আমার কথা হচ্ছে, ভক্ত হিসেবে এদের সম্মান দেখান, কিন্তু ভুল করেও সায়েবদের কখনও গুরুর পদে বসাবেন না।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন মিস্টার সেন। "অভয় চরণ দে ওরফে ভক্তিবেদান্তর প্রথম ভুল হলো—তিনি ওভার-এস্টিমেটেড দ্য অ্যামেরিকানস্। আমেরিকানরা কোনোদিন গুরু হতে পারবে না, এর জন্য ভারতীয়রা শত শত গুণ উপযুক্ত। যতই বলুন, এরা কৌতূহল দেখাতে পারে, ভক্তি করতে পারে, কিন্তু এদেশে সন্ন্যাস নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার—নেকসট টু ইমপসিবল্। অপ্রিয় কথাটা হলো, এদেশের ডিসিপ্লিন অফ লাইফ নেই যা ভারতবর্ষে অঢেল রয়েছে। সায়েব যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়, তাহলে সে-প্রতিষ্ঠানও কোম্পানীর মতন হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী আমেরিকান অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতন।"

"আপনি কি ভক্তিবেদান্তর কোনো গুণ দেখতে পান না?"

সসম্ভ্রমে জিভ কাটলেন মিস্টার সেন। "একটা কথা ইতিহাসে থেকে যাবে—এতো অল্পসময়ে প্রভুপাদের মতন কেউ কখনও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্বজয় করতে পারেননি।"

আমরা এবার আগামী দিনের প্রোগ্রামে ফিরে এলাম। জানালাম, শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানকেন্দ্রে আমি যাচ্ছি এবং তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হবে আমার।

ইতিমধ্যে কী করছি জানতে চাইলেন আমার বিজ্ঞানীবন্ধু। বললাম, "একটু লেখা-টেখা পড়ে নিচ্ছি। ভদ্রলোকের জন্ম ১৯৩১ সালে চট্টগ্রামে। বারো বছর বয়সে কোনো আশ্রমে চলে যান।"

"আশ্রমটা হলো পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, আমি জানি।"

"একুশ বাইশ বছর ওখানে ছিলেন। তারপর অভয় চরণ দে'র মতন কী ইচ্ছা জাগলো, সাগরপারে পাড়ি দিলেন। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার একটা মস্ত অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি নিশ্চয় আছে তাঁর।"

সেন বললেন, "এই অ্যাডভেঞ্চার স্টোরিগুলোই আসল গল্প—ভারতীয়দের এসব জানা দরকার। আমরা এমনিতে বড্ড নরম, কিন্তু বাঙালী যখন বেঁকে

বসে কিংবা একটা কিছু করবে বলে গোঁ ধরে তখন সে দুনিয়ার নমস্য ! এই গোঁয়ার বাঙালীর সংখ্যা যাতে কমে না যায় তা দেখবার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। গোঁয়ার বাঙালী পারে না এমন কাজ নেই। চাটগাঁয়ের ইংরিজি উচ্চারণ নিয়ে আপনারা কলকাতায় এখনও হাসিঠাট্টা করেন, কিন্তু সেই চাটগাঁইয়া এখানে হাজার-হাজার সায়েবের নাকে দড়ি পরিয়ে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে।"

"যে-শক্তিতে তা সম্ভব হচ্ছে তা বোধহয় অধ্যাত্মশক্তি। এই অধ্যাত্মশক্তির সামনে পশ্চিমের একটা অংশ শ্রদ্ধায় মাথা নত করে, অথচ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে আমরা যে নতুন ভারতবর্ষ গড়বার চেষ্টা করছি তার সম্বন্ধে অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নেই।"

আমি আরও বললাম, "শুনুন সেনসায়েব, শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ যা লিখছেন বা বলছেন ভারতবর্ষের পক্ষে হয়তো তা নতুন কোনো কথা নয়। তিনি বিদেশীর জন্যে সরলভাবে প্রাচীন কথা বিশ্লেষণ করেছেন—'যেখানে আনন্দ অনুপস্থিত সেখানে ভালবাসাও অনুপস্থিত। যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে কোনো কিছুই নেই। যেখানে সত্য রয়েছে সেখানেই তো পূর্ণতা; যেখানে পূর্ণতা সেখানেই তো ঈশ্বরের উপস্থিতি'।"

সেনসায়েব আবার তাঁর প্রিয় বিষয় অ্যাডভেঞ্চারে ফিরে গেলেন। বললেন, "শোনা যায়, শ্রীচিন্ময়কে এদেশে থাকবার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। এখানকার দূতাবাসে কেরানির কাজও করেছেন বেশ কিছুদিন। সুযোগটা করে নিয়েছিলেন তাই ভাল, কারণ এদেশের ইমিগ্রেশন অফিসাররা বড়ই বেরসিক। গ্রীনকার্ড না থাকলে স্বয়ং যীশুখ্রীস্টকেও এরা নির্দ্বিধায় দেশছাড়া করে দেবে। একমাত্র রক্ষাকর্তা এই সব দূতাবাস—ডিপ্লোম্যাটরা যাকে খুশি টেমপোরারি নিয়োগপত্র দিতে পারে, নিরীহ আশ্রয়প্রার্থীকে নগর কোটালের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই দেখবেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি ডিগ্রি নিয়েও বাইরের লোক বিদেশী দূতাবাসে ড্রাইভারের চাকরি করছে—এইভাবে কয়েকটা বছর চালালে যদি আসল সবুজপত্র মিলে যায়।"

যে-ভদ্রমহিলা দয়াপরবশ হয়ে চিন্ময়কুমার ঘোষকে ভারতীয় দূতাবাসে একটা কেরানির চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে মনে মনে নমস্কার জানালাম। ঐটুকু সাহায্য না পেলে, যিনি এক বিশ্বজোড়া অধ্যাত্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যিনি হার্ভার্ড, ইয়েল, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ডের মত শত শত বিশ্ববিদ্যালয় চষে বেড়াচ্ছেন তিনি পুনর্মূষিক হয়ে আমাদের দেশের কোনো মফঃস্বল শহরে জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করতেন। যে-মানুষ একদিন গ্রীনকার্ডের জন্য কনিষ্ঠ কেরানি হয়েছিলেন আজ সমস্ত বিশ্বে তাঁকে নিয়ে টানাটানি—রবিবার তিনি নিউ ইয়র্কে তো সোমবারে তিনি ওয়াশিংটনে, পরের

দিন লণ্ডন, তার পরের দিন প্যারিস কিংবা স্টকহোমে। জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন সর্বত্র তাঁর মেডিটেশন সেন্টার রয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকাতেও পা বাড়িয়েছেন—জামবিয়াতে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। জাপানেও কেন্দ্র রয়েছে।

সেনসায়েবকে বললাম, "ভদ্রলোক নিশ্চয় একটি হিউম্যান ডাইনামো বিশেষ। লোকমুখে শুনলাম, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র ঘন্টা দুয়েক বিশ্রাম নেন, বাকি সময় হাজার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ইউ-এন-ওর এক জাঁদরেল অফিসার বললেন, শত শত বই লিখেছেন ইংরিজিতে।"

সেনসাহেবের মন্তব্য, "গেঁয়ো বাঙালীরা হঠাৎ আমেরিকায় এসে কিভাবে ইংরিজিতে তুখড় হয়ে যায় বুঝতে পারি না! আপনি বিবেকানন্দের অসাধারণ ইংরিজি বাকপটুতার কথা ভাবুন—এখনকার নর্থ ক্যালকাটা সিমুলিয়ার ছেলেরা তো ইংরিজির নাম শুনলে ভয় পায়। স্বামী অভেদানন্দও চমৎকার ইংরিজি লিখতেন। ভক্তিবেদান্ত তো ইংরিজি ভাষার মাস্টার—ঐ সামান্য ক' বছরে তিরিশ চল্লিশ খন্ড বই লিখে ফেলেছেন। আর শ্রীচিন্ময় তো শুনেছি ছ'-সাতশ বই ইতিমধ্যেই প্রকাশ করে ফেলেছেন।"

"এঁর ইংরিজি পড়লাম। পূর্বদেশের সরলতা এঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলাভাষার দু-একটি বিশিষ্টতা ইংরিজিতেও চালু করার ইচ্ছে রয়েছে মনে মনে। কিন্তু আজ সকালে একজন ইউ-এন কর্তার সঙ্গে দেখা হলো, তিনি নিজে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি সাহিত্যচর্চা করেছেন, তিনি তো খুব প্রশংসা করলেন ওঁর ইংরিজি লেখার।"

"আর আপনি গদগদ হয়ে সায়েবের সব কথা হজম করে ফেললেন!"

"মোটেই না। আমি বরং মার্কিনী সাংবাদিক স্টাইলে গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিলাম, মহাশয়, এই পৃথিবীতে সব মানুষেরই কিছু-কিছু দুর্বলতা থাকে। ভগবান এখনও নিখুঁত কোনো মডেল তৈরি করেননি। সুতরাং এক-আধটা দোষ খুঁজে দিন। ভদ্রলোক খুব হাসলেন, তারপর বললেন, 'ওঁর হাতের লেখা আমি দেখেছি, এক-আধবার বানান সম্বন্ধে পিছলে পড়েছেন!' সাহেবের কথা শুনে ভরসা পেলাম।"

বিজ্ঞানী মিস্টার সেন বললেন, "ওঁর লেখা থেকে আপনি কি পেলেন?"

"এই ক'ঘন্টায় আর কতটা আন্দাজ করবো বলুন? যেটা দেখছি, এদেশে বসবাস করলে অগোছালো বাঙালীর চিন্তাতেও একটা গোছালো ভাব এসে যায়—যাকে অনেকে বলেন, মানসিক পরিচ্ছন্নতা। ওঁর লেখা থেকেই নোটবইতে কপি করেছি—ঈশ্বরের একজন স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট প্রয়োজন। ভাবছি, মাথা নত করে আমি ঐ পদের জন্য আবেদন করবো'।

"আর একটি কথা লিখে নিয়েছি—'তোমার জীবনপথে অসংখ্য ট্রাফিক লাইটের লাল চোখরাঙানি, তার কারণ তোমার হৃদয় কোনোদিন প্রাণভরে সবুজ আলোর সংকেত চায়নি।' অথবা, 'একবার কোনোরকমে নিজেকে বিশ্বাস করাও, তুমি অপরিহার্য নও। তোমার মন শান্তিতে প্লাবিত হবে।' অথবা, 'আমি সোজাসুজি জ্ঞানের আলোক চাই। অপরের ব্যাখ্যা মানেই তো বাধা।'

"আরও একটি লাইন মন্দ লাগলো না—'ব্যক্তিমানুষ পার্থিব সম্পদের মধ্যে, সুখের মধ্যে এবং কখনও-কখনও ত্যাগের মধ্যেও শান্তি চায়। এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আলাপ-আলোচনা, ডিপ্লোম্যাসি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি সুনিশ্চিত করতে চায়। এই সব প্রাইভেট অথবা পাবলিক কৌশল দীর্ঘ সময়ের স্থায়িত্ব আনে না। বাইরের জগৎ থেকে শান্তি আসে না, তার উৎপত্তি মানুষের হৃদয়ে'।"

মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে চুপি-চুপি অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম। আমার অবিশ্বাসী মন বেশ সজাগ হয়ে রয়েছে—বিশ্বাস করে-করে আমার দেশের অভাগা মানুষ যে বারবার ঠকেছে। কিন্তু এ কথাও তো সত্য, বাজিয়ে না দেখে সব কিছু ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করলেও মানুষের অগ্রগতি হতে পারে না। পশ্চিমের বিজ্ঞানী-মন তাই সারা পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহ্যগুলি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখছে কোথায় সত্য লুকিয়ে রয়েছে। গত কয়েক হাজার বছর ধরে নানা দেশে নানা সময়ে মানুষ কী ভেবেছে তার পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে। এই অনুসন্ধিৎসু পশ্চিমী-মনের কাছে ভারতবর্ষ অবশ্যই একটি স্বর্ণখনি, যদিও আমরা ভারতীয়রা নিজেরা কোনো খোঁজখবর না নিয়ে সায়েবরা কি করে তা দেখবার জন্যে উঁচিয়ে বসে আছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি বলতে একসময় এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং বোঝাতো। এখন নয়। নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু জায়গা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখতে যাবার কথা ছিল সকালে, কিন্তু আমি তার বদলে শ্রীচিন্ময় ঘোষের সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

অবশেষে শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে দেখা হলো। ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টারে যাবার আগে টার্কিশ সেন্টারে বাংলাদেশ মিশনের একটি ঘরে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

খোদ সাহেবের দেশে সন্ন্যাসী নয়, সাধু নয়, হানড্রেড পার্সেন্ট বাঙালী

বাবু—শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ। বয়স পঞ্চান্ন, রঙ কালো, সুশাসিত শরীর, ওজন একশ ষাট পাউন্ড (সাহেব ভক্তদের মহৎ গুণ সব বিবরণ অনুসন্ধিৎসুদের জন্যে রেডি !)। শ্রীচিন্ময় সাদা পাঞ্জাবি পরেছেন, সেই সঙ্গে ধুতি এবং পাম্পসু—যে ধরনের মানুষকে একসময় হাওড়ার বাজারে এবং শিয়ালদহ রেল স্টেশনে শত শত দেখা যেতো। এখন অবশ্য টেরিলিনের কল্যাণে সব বাঙালী পুরুষই সাহেব—খাঁটি বাঙালী বেশবাস দেখতে হলে আপনাকে এখন বিয়ের লগনসার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, অথবা পাসপোর্ট-ভিসা করে এই নিউ ইয়র্কে হাজির হতে হবে।

মানুষটির সবই সাধারণ, শুধু চোখ দুটি ছাড়া। ফিলিপস্ কোম্পানির বিজ্ঞাপনী ভাষায়—একজোড়া আর্জেন্টা ল্যাম্প—যেখানে শুভ্র আলোর স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু ক্ষতিকারক উত্তাপ নেই। আলো দিচ্ছে, কিন্তু জ্বলে-পুড়ে মরতে হচ্ছে না। এই প্রসন্ন আলোই অতিমাত্রায় সফিসটিকেটেড পশ্চিমকে টানছে অজ চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার দিকে। হাডসন রিভার হার মানছে কর্ণফুলির কাছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। অতি সাধারণ সব বাঙালী কথাবার্তা—দেশ কোথায়, কবে দেশ ছাড়লেন। দেশে যান না কেন ? শ্রীচিন্ময় পরিচয় দিলেন নিজের বাংলা সাহিত্যপ্রীতির। একসময় রবি ঠাকুর, নজরুলে বুঁদ হয়ে থাকতেন। কুড়ি বছর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। একসময় নলিনীকান্ত গুপ্তর সেক্রেটারির কাজ করেছেন—এই নলিনীকান্তর জন্ম-শতবার্ষিকী ১৯৮৮তে। বললেন, "নলিনীকান্তর কিছু লেখা অনুবাদ করেছিলাম, অরবিন্দর একটা জীবনীও লিখেছিলাম। তারপর কী ছিল বিধাতার মনে, চলে এলাম সাত সাগরের পারে।"

ওঁর সঙ্গে রয়েছেন লম্বা-চওড়া এক সাহেবভক্ত—ডাক নাম লম্বু, ভাল নাম অধীরতা।

না, এরা নিজেদের ঘরসংসার কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে গুরুসেবার জন্যে আশ্রমে ঢুকে পড়েনি। ইউ-এন অফিসে ভাল কাজ করেন লম্বু। টুক করে একবার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে এলেন গত বছরে, এবারেও ঐ ধরনের কিছু একটা করবেন। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখায় বিশ্বাস করেন শ্রীচিন্ময়—সকালবেলায় পেট ভুটভাট করলে, নাভিদেশে মোচড় মারলে, মাথা ধরলে, দন্তশূল হলে মানুষ ঈশ্বর উপলব্ধির চেষ্টা চালাবে কি করে ? শরীরকে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে হবে সবসময়। এই তো আজ সকালে শ্রীচিন্ময় নিজেই একশ ষাট পাউন্ডের দেহ নিয়ে পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনশ ত্রিশ পাউন্ড ওয়েট লিফটিং করে এলেন।

আমাদের কথা যেন শেষ হতে চায় না। এরপর আমরা চললাম ইউ-এন

মেডিটেশন সেন্টারে। বিরাট একটি ঘর ততক্ষণে নানা বেশের পুরুষ ও রমণীতে ভরে উঠেছে। পুরুষদের সবাই কোটপ্যান্ট পরেন ডিপ্লোম্যাসির এই সুরসভায়। এতো নিখুঁতভাবে ড্রেস করা পুরুষ একসঙ্গে পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাবেন না। মেয়েরা অনেকেই নিজেদের ড্রেস পরেছে, আবার কেউ-কেউ শাড়ি পরিহিতা।

আমি চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি এদের শাড়ি পরতে নির্দেশ দিয়েছেন?"

শ্রীচিন্ময় বললেন, "মোটেই না। আমি ধুতি পরি তো, তাই ওরা ভেবে নিয়েছে ওরা শাড়ি পরলে আমি সন্তুষ্ট হবো।"

হল ঘর ভরে উঠলো। চেয়ার না পেয়ে অনেকেই কার্পেটের ওপর হাঁটু-মুড়ে বসে পড়লেন পরম আনন্দে। অনেক মহিলা জুতো খুলে চেয়ারের উপর পা মুড়ে নিলেন।

মহাশক্তিমান রাজপুরুষ ও রমণীদের এই সভায় আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জুতো খোলা আমার ধাতে নেই।

সর্বত্র এক আশ্চর্য শৃঙ্খলা। কেউ-কেউ নীরবে একটু-আধটু সভার কাজ করে দিচ্ছে। স্বদেশে আমাদের প্রার্থনাসভায় যে অব্যবস্থা, অনিশ্চয়তা এবং হৈ চৈ থাকে তার কিছুই নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্মমহাসভা দেখেছিলেন, আমি দেখলাম বিশ্বধর্মের মিলনসভা। আশ্চর্য এই সভা। কোনো বক্তৃতা নয়, কোনো শাস্ত্রপাঠ নয়, কোনো মন্ত্র উচ্চারণ পর্যন্ত নয়—শ্রীচিন্ময় এঁদের মুখোমুখি বসে ক্রমশ ধ্যাননিমগ্ন হলেন। শতাধিক অপরিচিত বিশ্ববাসীও তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করলেন ঐকান্তিকভাবে। কেউ ধীরে-ধীরে চোখ বন্ধ করলেন, কেউ নতমস্তকে পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

এইভাবে চললো অনেকক্ষণের নীরবতা। আমার মনে পড়লো, ইউ-এন-ও'র কক্ষে চলেছে মানুষের দলবদ্ধ ঘৃণার দ্বন্দ্ব, কোথাও চলেছে গোপন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্বাসের অসহ্য জ্বালা। আর এখানে হঠাৎ কিসের আকর্ষণে মানুষ স্বেচ্ছায় মাথা নত করছে বোয়ালখালি থানার এক কৃষ্ণাঙ্গ বঙ্গসন্তানের কাছে? কী সে দিতে পেরেছে, যা এই বিশাল বিশ্বসভার আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়?

দীর্ঘ নীরবতার শেষে সুবেশী নরনারীর ধ্যান ভঙ্গ হলো। শ্রীচিন্ময় এবার সঙ্গীতের ইঙ্গিত দিলেন এবং এবার আমার চোখ ও কানের বিস্ময় শুরু হলো! সাদা কালো মঙ্গোলীয় ককেশীয় সবাই একসঙ্গে বাংলা গান শুরু করলেন। এঁরা কেউ বাংলা ভাষা জানেন না, কিন্তু হৃদয়ের গভীর থেকে এমন পবিত্র নিবেদনের

গান আমি বাংলাতে কখনও শুনিনি ঃ

"হিয়া পাখি এগিয়ে চলো
দেখো না আর ফিরে
বিশ্ব যাহা দিতে পারে
তা যে তুচ্ছ মিছে।"

ও বার্ড অফ মাই হার্ট ফ্লাই অন, ফ্লাই অন—আমি নিজেই তখন ইংরিজিতে চিন্তার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছি।

গানের পর গান। পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠে গভীর আকুতি ঃ

"ভুলিতে দিও না প্রভু
যদি আমি ভুলে যাই কভু।
তীব্র বেদনে জাগাবে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু
বেদনার তাপে যদি ভুলে যাই
মরণের ঘুম যদি কভু পাই
অমর পরশে জাগাবে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু..."

একের পর এক বাংলা গানের আসর চলেছে। ভক্তের হৃদয়ে তার মূর্ছনা ঃ

"জাগে না জাগে না পরাণ জাগে না
ঘুমঘোর আর ভাঙে না..."

আজ ইউ-এন-ও'র বড় মিটিং আছে। শক্তিমান রাষ্ট্রদূতরা প্রত্যেকে একটি রাঙতায় জড়ানো 'কুকি' শ্রীচিন্ময়ের হাত থেকে নতমস্তকে গ্রহণ করে একে-একে বিদায় নিলেন। তিনি কারও সঙ্গে কোনো কথা বললেন না সেদিন।

পুরুষ ভক্তদের বাংলা নামগুলি এই সুযোগে শুনিয়ে দিই। স্টিভেন হাইন হয়েছেন 'ধ্রুব'। কেভিন কীফ-এর নাম হয়েছে 'অধীরতা'। কীথ ফারম্যান নাম পেয়েছেন 'আশ্রিত'। দুই প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়-ভ্রাতা ম্যাথু ও ল্যারি হোগান হয়েছেন 'ভীম' ও 'তেজিয়ান'। শুনেছি এক জ্যাজ গায়ক মাইকেল ওয়লডেন হয়েছেন 'নারদ'। এবং এক ওলিম্পিক ট্র্যাক চ্যাম্পিয়ান কার্ল লুইস 'সুদেহী'। কার্লো সানতাতা নাম পেয়েছেন 'দেবদীপ'।

অধীরতা ও ধ্রুব দুই বিশিষ্ট ইউ-এন কর্মীর সঙ্গে শ্রীচিন্ময় আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দুপুরের খাবার খেয়ে আসতে। ভারী স্নেহপ্রবণ মানুষ। কে খেলো কে খেলো না সব দিকে নজর রাখেন।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে স্টিভেন হাইন বললেন, "একজন য়ুরোপীয় ওঁকে

প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যা প্রচার করছেন, তা কি ধর্মমত ?' উনি বললেন, 'না আমি ধর্মপ্রচার করি না, কেবল পথের ইঙ্গিত দিচ্ছি। যে-কোন ধর্মে বিশ্বাস রেখেই এই পথ ধরে চলা যায়'।"

কেভিন কীফ বললেন, "ওঁর শিক্ষা অনুযায়ী আমরা সমাজে কোনো বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছি না। সমাজকে মেনে নিয়েই আমরা সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটাতে উৎসাহী। সকলেরই একাজে সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।"

স্টিভেন হাইন বললেন, "ইউ-এন ছাড়াও অন্যত্র শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানসভা বসে। অনেকে নানা প্রশ্ন করেন, শ্রীচিন্ময় উত্তর দেন।"

পশ্চিমীদের মনে কি ধরনের প্রশ্ন জাগে তা জানবার আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। শুনলাম, নানা ধরনের প্রশ্ন ওঠে। কেউ জিজ্ঞেস করেন—কিভাবে ধ্যান করতে হয় ? কেউ প্রশ্ন করেন—ধ্যানের সময় যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি তার জন্যে কি করতে হবে ? কেউ বলেন—ধ্যান করতে বসে এই মনে হয় কিছু হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না, এর কারণ কি ? কেউ জানতে চান—ধ্যান থেকে কী পাওয়া যেতে পারে ? কেউ বলেন—নাভিচক্রে মনঃসংযোগ করছি, কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছে না !

আমি বুঝছি, ভক্তিযোগের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রচারক বলতে যাঁদের বোঝায় শ্রীচিন্ময় তাঁদের একজন।

অন্য ধরনের প্রশ্নও আছে। কিছু কিছু নোটবইতে লিখে নিয়েছি। কিছু নমুনা না দিয়ে পারছি না ঃ

প্রশ্ন ঃ চারদিকে সংঘাত, চারদিকে সংঘর্ষ, এই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা ?

শ্রীচিন্ময় ঃ কখনও-কখনও ঈশ্বরেরই এই লীলা। ভাল এবং মন্দ দুই-ই প্রকাশমান হয়, অবশেষে ন্যায়ের জয় হয়। বর্তমান পৃথিবীর সংঘাত ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে মনে হয় না, মানুষের দুর্বলতা থেকেই সংঘাতের উদ্ভব। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ দেখাতে চান, আমি যা বলি তাই ঠিক, তুমি যা বল সব ভুল। আমি দেখাতে চাই আমি একজন কেউকেটা, তোমার ওপর প্রভুত্ব করার মতন শক্তি আমার আছে, আমার চরণতলে তোমাকে পতিত হতে হবে। আমরা সবাই আমাদের অন্ধ অথরিটির প্রসার সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত।

অনেকগুলি প্রশ্নের মধ্যে পশ্চিমী মানসিকতার গতিপ্রবাহ কিছুটা ধারণা করা যায়। বিজ্ঞানের হিমালয়শিখরে আরোহণ করেও মানুষ এখন নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে কী পরিমাণ উদ্‌গ্রীব তা বোঝা যায়।

প্রশ্ন ঃ চিন্তা এবং ধ্যান কি এক জিনিস ?

শ্রীচিন্ময় ঃ মোটেই এক জিনিস নয়—বরং উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর

মতন। যখন আমরা ধ্যান করি তখন আমাদের লক্ষ্য সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্তি। চিন্তা হলো ব্ল্যাকবোর্ডে একটা ফুটকির মতন। ধ্যানের সময় ওটা মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হয়। ধ্যানের প্রথম স্তরে কিছু চিন্তা এসে যায়, কিন্তু গভীরতম পর্যায়ে চিন্তার কোনো স্থান নেই।

প্রশ্ন ঃ যে-লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে কি ধ্যানের চেষ্টা চালাতে পারে ?

শ্রীচিন্ময় ঃ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে ধ্যান করতে পারে, কিন্তু তার কিছু লাভ হবে না। ধ্যানের পথ আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। যদি আপনার ঈশ্বরবিশ্বাস না থাকে তা হলে আপনি ঐ পথ ধরবেন না এটাই স্বাভাবিক। ধরুন, আপনি অফিসে রয়েছেন। যদি আমি বলি আপনার অফিসের অস্তিত্ব নেই, অথবা আপনার নিজের অস্তিত্ব নেই, তা হলে কি আমি আপনার অফিসটা কোথায় তা জানবার চেষ্টা করবো ?

প্রশ্ন ঃ যে-লোক কিছুই জানে না সে কিভাবে ধ্যানের 'একসারসাইজ' শুরু করতে পারে ?

শ্রীচিন্ময় ঃ যারা অধ্যাত্মপথে প্রবেশ করতে চায় তাদের সবচেয়ে প্রয়োজন সরলতা, নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা। ধ্যানে বসে প্রথমে আপনার মাথার কথা ভাবুন এবং 'সরলতা' কথাটি নিঃশব্দে সাতবার চিন্তা করুন। এবার আসুন হৃদয়ে এবং সাতবার 'নিষ্ঠা' শব্দটি ভাবুন। তারপর নাভিতে মনঃসংযোগ করে 'পবিত্রতার' কথা ভাবুন সাতবার। এবার আপনার দুই ভ্রূ'র সংযোগস্থলের একটু ওপরে তৃতীয় নয়ন সম্বন্ধে সচেতন হোন এবং চিন্তা করুন যে আপনি দ্বিধাহীন। এবার হাতটি মাথার ওপর দিন এবং নিঃশব্দে তিনবার বলুন আমি সরল, আমি সরল, আমি সরল। এবার বুকে হাত দিয়ে তিনবার বলুন, আমার হৃদয়ে নিষ্ঠা রয়েছে। এবার নাভি স্পর্শ করে তিনবার বলুন, আমি পবিত্র। এবার তৃতীয় নয়ন স্পর্শ করে বলুন, আমি দ্বিধাহীন।

ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এবার সজাগ হোন। যদি আপনার প্রেমময় ঈশ্বরকে পছন্দ হয় তাহলে মনের মধ্যে সাতবার বলুন—প্রেম, প্রেম। যদি আপনার শান্তি পছন্দ হয়, তাহলে এইভাবে সাতবার শান্তি আবৃত্তি করুন। যদি আপনার আলো ইচ্ছা হয়, তাহলে বলুন আলো—শুধু প্রাণহীন আবৃত্তি নয়, আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে এমন গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করুন যেন আপনি ভালবাসা, শান্তি ও আলোর ঝরনাধারায় অবগাহন করছেন।

আর একটি অনুশীলন চাই। অনুভব করার চেষ্টা করুন যেন আপনি নিজের হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে আপনার কয়েকজন স্বর্গীয় বন্ধুকে স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এঁদের আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন—ভালবাসা, শান্তি, আলো, আনন্দ। এঁদের আপনি এক একটি মানুষ হিসাবে কল্পনায় আনবার চেষ্টা করুন,

যাতে আপনি মানসচক্ষে এঁদের দেখতে পান। যদি সব বন্ধুকে একই দিনে হৃদয়ে না আনতে পারেন—এক-একদিন এক-একজনকে নিমন্ত্রণ করুন।

এরপর আর একটি অনুশীলন। শ্বাস নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকুন এবং অনুভব করুন আপনি এই প্রাণশক্তি ধরে রাখছেন তৃতীয় নয়নে। এতে আপনার মনঃসংযোগ বাড়বে। দ্বিতীয়বার শ্বাস নিয়ে হৃদয়কেন্দ্রের কথা অনুভব করুন। তৃতীয়বার নাভিকেন্দ্রের কথা ভাবুন। এতেও আপনার কিছুটা সুবিধে হবে।

প্রশ্ন ঃ ধ্যানের শ্রেষ্ঠ সময় কোনটি ?

শ্রীচিন্ময় ঃ শ্রেষ্ঠ সময় সকাল তিনটে থেকে চারটে, যাকে আমরা ব্রাহ্মমুহূর্ত বলি। বৈদিক ঋষিরা এই সময়টিই সবচেয়ে পছন্দ করতেন। কিন্তু পশ্চিমে যাঁরা রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত জেগে থাকেন তাঁদের ঐ সময়ে শয্যাত্যাগ করতে বললে উল্টো ফল হতে পারে। কারণ যাঁরা অধ্যাত্মপথের নতুন যাত্রী তাঁদের সাত-আট ঘন্টার ঘুম প্রয়োজন। আমি বলবো, সকাল সাড়ে-চারটে অথবা পাঁচটায় ধ্যান আরম্ভ করুন। অধ্যাত্মপথে কিছুটা অগ্রগতি হলে আপনি ঘুমের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারবেন। আমার জানাশোনা অনেকে সাড়ে-পাঁচটা এবং ছটার মধ্যে ধ্যান করেন।

প্রশ্ন ঃ আমি শান্তি খুঁজছি। আমার পক্ষে কখন ধ্যান করা যুক্তিযুক্ত হবে ?

শ্রীচিন্ময় ঃ যদি শান্তির প্রয়োজন থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় সন্ধ্যা ছটা এবং সাতটার মধ্যে।—প্রকৃতি এই সময় জীবকে সান্ত্বনা দেয়।

যদি আপনি শক্তির পূজারী হন, তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় দুপুর বারোটা। —দিনের মধ্যে এইটাই সবচেয়ে কাজের সময়।

যদি আপনার আনন্দ প্রয়োজন থাকে তাহলে সকাল পাঁচটা-ছ'টায় ধ্যান করুন। জননী বসুন্ধরা আপনাকে সাহায্য করবেন।

যদি আপনার ধৈর্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে সুযোগ মতো একটি গাছের তলায় বসে সন্ধ্যার শেষে ধ্যান করুন।

যদি ভালবাসাই আপনার লক্ষ্য হয় তাহলে মধ্যরাত্রই শ্রেষ্ঠ সময়। নিজের ছবি সামনে রাখুন—আপনার হৃদয়-মাঝিই আপনাকে সাহায্য করবে।

যদি আপনার পবিত্রতার প্রয়োজন থাকে তাহলে ভোরে বিছানা ছাড়বার আগে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ধ্যান করুন। আপনার আত্মা আপনাকে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন ঃ যদি আমি এই সময়-শৃঙ্খলা মানতে না পারি ?

শ্রীচিন্ময় ঃ প্রত্যেক প্রচেষ্টার একটা শ্রেষ্ঠ সময় আছে, কিন্তু তা বলে ঈশ্বরের দ্বার অন্য সময় বন্ধ থাকে না। ধরুন ব্রেকফাস্ট—সকালে খাওয়াটাই রীতি। কিন্তু ঐ খাবারগুলো যদি আপনি সন্ধ্যায় খেতে চান—খেতে পারেন, পুষ্টির

অভাব হবে না—খাবারগুলো তো খারাপ নয়।

প্রশ্ন ঃ অধ্যাত্মপথে এগোবার জন্যে কি নিরামিষ খাওয়া প্রয়োজন ?

শ্রীচিন্ময় ঃ নিরামিষ আহার অধ্যাত্মজীবনে একটা বড় ভূমিকা নেয়। এই আহার আমাদের পবিত্র হতে সাহায্য করে। আমরা যখন মাংস খাই তখন কিছু পশুপ্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে। মাছ তো আরও খারাপ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আলস্য, সঙ্কীর্ণতা এবং বিবেকহীনতা। শাকসব্জি, ফল আমাদের নম্রতা দেয়, মিষ্টতা দেয় এবং পবিত্রতা দেয়। সুতরাং নিরামিষাশী হলে ভাল। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ঠান্ডা দেশ আছে যেখানে কেবল শাকাহার করে জীবনধারণ করা শক্ত। সেখানে অবশ্যই মাংসাহার করতে হবে। কারণ, তা না হলে মন চাইলেও শরীর বিদ্রোহ করবে। শাকাহারী না হলে ঈশ্বর-অনুভূতি হবে না এ কথা ঠিক নয়। যীশুখ্রীস্ট, বিবেকানন্দ এবং আরো অনেক মহাপুরুষ মাংস খেতেন।

অধ্যাত্মপথ ছাড়াও শত-শত অন্য প্রশ্ন আছে। এই সব প্রশ্ন করেন এমন সব মানুষ যাঁরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে কৃতী, কারও কারও বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

একজনের প্রশ্ন ঃ দুনিয়ার সবাইকে সন্দেহ করার প্রবৃত্তি আমি কিভাবে ত্যাগ করতে পারি ?

শ্রীচিন্ময় ঃ প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে এই সন্দেহপ্রবৃত্তি থেকে আমার কোনো উপকার হয়েছে কিনা। দেখবেন, কিছুই হয়নি। সন্দেহ-বশবর্তী হয়ে আপনি আরও নিচে নেমে গিয়েছেন। তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আমি কি বোকা ? না বুদ্ধিমান ? আপনি নিশ্চয় বোকা নন, সুতরাং আপনাকে বুদ্ধিমানের মতন কাজ করতে হবে।

তারপর খুঁজতে হবে, সন্দেহটা কোথায় ? মনে না শরীরে ? মনের সন্দেহ পর্বতের মতো অনড়। মনের এই সন্দেহকে বলুন—আপনার কাছ থেকে জ্বালা-যন্ত্রণা ছাড়া আমি কিছুই পাইনি, অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আপনি আমার বন্ধু। এখন বুঝছি, আপনি আমার শত্রু, সুতরাং সত্বর আমার এই গৃহ ত্যাগ করুন। আমার এই স্বল্পপরিসরে আপনার জন্য কোনো স্থান নেই।

আরও মনে রাখতে হবে, চিরকাল কেউ শত্রু থাকে না। আপনার অন্তর যখন প্রকৃত আলোকে ভরে উঠবে তখন সন্দেহ আপনার মনে প্রবেশ করলেও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, বরং নিজেই আলোকিত হয়ে উঠবে।

অবশেষে নানা বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীচিন্ময় ঘোষের সঙ্গে। সায়েব-মেমরা সামনে বসে রয়েছেন, কিন্তু তিনি সস্নেহে আমার সঙ্গে বাংলা কথায় মশগুল হয়ে উঠলেন। সায়েবরা কিছু মনে করলেন না—বাংলাকে এঁরা এমনভাবে শ্রদ্ধার আসনে বসালেন কেন কে জানে!

মানুষের অন্তরের শান্তি, পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক, মানব সমাজের অনন্ত জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে সুদূর বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নলিনীকান্ত গুপ্ত অনেক কথাই উঠলো। ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে শৈশব ও বাল্যকাল কাটিয়েও আমি যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে উঠিনি তা হয়তো শ্রীচিন্ময় আন্দাজ করলেন। আমি বললাম, "আমার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পেনডুলাম সারাক্ষণ দুলছে। আমি এই ভাবনাকে বাধা দিইনি, কারণ পরিপূর্ণ সমর্পণ করলে গল্প-লেখকের 'অপ্রত্যাশিত' হবার শক্তি শেষ হয়ে যায়।"

শ্রীচিন্ময় মৃদু হেসে এমারসন থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, "তুমি নিজে ছাড়া কেউ তোমার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে না।"

আমি ভাবছি, আমার সমস্ত বিস্ময়ের পর্ব চুকিয়ে একবার জিজ্ঞেস করবো, "আপনি কোন শক্তিতে বিদেশে এই বিপুল শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন? এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েও, অন্য অনেকের মত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন না, অথবা বিপুল বৈভবের মধ্যে ডুবে রইলেন না—যা এদেশে করা খুবই সহজ ছিল।" (আমার কাছে খবর আছে, তাঁর নিজের একটা গাড়িও নেই—ইউ-এন অফিসের কোনো কোনো স্বেচ্ছাসেবী তাঁকে পালা করে বাসস্থান জামাইকা থেকে মেডিটেশন সেন্টারে নিয়ে আসেন এবং পৌঁছে দেন।)

কিন্তু ঐ সব ব্যক্তিগত প্রশ্নের সময় পাওয়া গেল না। শ্রীচিন্ময় তখন কলকাতার কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় তাঁর ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। চক্রবর্তী চ্যাটার্জির দোকানে বই কিনেছেন। কিছুদিন আগে জন্মভূমি বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন—সে-সব গল্পও চলতে লাগলো। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শিশির ঘোষের কথাও উঠলো।

বুঝলাম, শ্রীচিন্ময় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ডুবে আছেন। সুদূর প্রবাসে নিজের লেখা গানের মধ্যে বারেবারে ওঁর ছায়া এসে যায়।

কথা বলতে-বলতে আমরা দুজনে সুবিশাল রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের পিছনে ইউ-এন ভবন গগন স্পর্শ করছে। সামনেই পরম পরাক্রান্ত মার্কিনীদের ইউ-এন সংক্রান্ত দপ্তর এবং তারই পাশে টার্কিস সেন্টার, আমার পরবর্তী গন্তব্যস্থল।

আমার খুব আশ্চর্য লাগলো, ধুতি-পাঞ্জাবি ও পাম্পশু পরে, নিজের স্বাতন্ত্র্য

সম্পূর্ণ বজায় রেখে, শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের মতন বিশ্ববিজয় করা আজও তাহলে সম্ভব!

শ্রীচিন্ময় ঐসব ব্যাপারে মোটেই ব্যস্ত বলে মনে হলো না।

"দেশের জন্যে চিন্তা হয় না?" আমি জানতে চাইলাম।

"যাদের রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ রয়েছে তাদের আবার চিন্তা কী?" এই বলে উদাসী শ্রীচিন্ময়কুমার নিউ ইয়র্কের রাজপথ ধরে আপন মনে হাঁটতে লাগলেন।

"বিত্তসাধনার দেশ আমেরিকা বেড়াতে এসে শুধু মোক্ষসন্ধানীদের পিছনে সমস্ত ব্যয় করলে চলবে কী করে?"

নিউ ইয়র্কে এসে পুরো দু'দিন আমি শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের খবরাখবর করছি জেনে রসিকতা করলো আমাদের হাওড়া-বিবেকানন্দ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ডাক্তার তপন সরকার—কালি কুণ্ডু লেন টু কাশুন্দে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম টু কলেজ স্ট্রীট মেডিক্যাল কলেজ টু লণ্ডন রয়াল কলেজ অফ মেডিসিন। তারপর লম্বা এক লাফে অতলান্ত মহাসাগর পেরিয়ে নিউ ইয়র্ক এবং সেখানে ডাক্তারি।

যেসব ডাক্তারের 'মাটিয়া কলেজ' চত্বরে বদনামের শেষ নেই তারাই সাগরপারে গিয়ে হীরে-মানিক কুড়োয়। বাঙালী ডাক্তারের ফুল বিদেশে গেলেই ফোটে! তাদের গ্যারেজে থাকে রোলস্ রয়েস এবং মার্সেডিস বেন্জ, সমুদ্রের ধারে বাঁধা থাকে প্রমোদতরণী যার নাম ইয়াট। কেউ-কেউ আবার প্রাইভেট এরোপ্লেন কিনে ছোটবেলায় প্রাণখুলে না-উড়তে পারার বাসনাটা পুরিয়ে নেয়।

তপন সেই ধরনের ছেলে যে বিদেশী ডিগ্রী ও সাফল্যতে মোড়া থাকলেও 'ফিরভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী'। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাওড়া-কাশুন্দে সম্বন্ধেই তার উৎসাহ বেশি। অ্যাণ্ড হোয়াই নট?

সারা আমেরিকার লাখ-লাখ সফল নরনারী এখনও প্রাণভরে তাদের পূর্বপুরুষের ছেড়ে-আসা ইউরোপীয় গাঁ অথবা শহরের প্রশংসা করছে। বলছে, পেটের দায়ে বাপ-পিতামহ দেশত্যাগী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দুনিয়ার এমন জায়গা নেই যেখানে আমার শিকড়—সারা জঁহা সে আচ্ছা!

আর ধন্য এই মার্কিন মুলুক, এখানে নিজের কম্মোটা মন দিয়ে ক'রে লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে মানুষ যা খুশি করার স্বাধীনতা পায়। তোমার

রোজগারের টাকা কোথায় খরচ করবে, কেমনভাবে খরচ করবে এসব বিষয়ে সরকার কোনো ফতোয়া জারি করে না। এমন কি কেউ বলে না, তুমি 'প্রভিনসিয়াল,' তুমি অমুক, তুমি তমুক।

সাফল্যের এই দেশে মানুষের কবজির জোর আছে, শিরদাঁড়া সোজা আছে। তাই লোকে ধরেই নিয়েছে, তোমার বাপ-পিতেমো যদি আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসে থাকেন তাহলে ওই দেশ সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা তো থাকবেই। তুমি ইহুদির লেড়কা, দুনিয়ার ইহুদি সম্পর্কে তুমি তো ভাববেই। তুমি ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত—তুমি তো একটু-আধটু ইতালিয়ানদের দিকে টেনে কাজকর্ম করবেই। কোনা আপত্তি নেই, যতক্ষণ এই কমপিটিশনের বাজারে হেরে গিয়ে নিজের প্যান্টুল খুলে তোমাকে পালাতে হচ্ছে না। যতক্ষণ তুমি অর্থনৈতিকভাবে লড়ে যাচ্ছো এবং যতক্ষণ পাবলিক তোমাকে চাইছে ততক্ষণ তুমি কোনো ভুল করতে পারো না।

প্রতিযোগিতার তীর্থভূমি এই মার্কিনমুলুক। অপদার্থ এবং ব্যর্থদের জন্যে চোখের জল ফেলবার সময় এখানে যেমন কারও নেই, তেমনি বিজয়ীদের পায়ে শিকল পরিয়ে সারাক্ষণ তাদের পিছনে কাঠি দেবার দুঃসাহসও কারও নেই।

কাজকর্মের কেত্তন চলেছে অষ্টপ্রহর। সারা দুনিয়া থেকে মানুষ বুকের মধ্যে অসীম উচ্চাভিলাষ নিয়ে এখানে ছুটে আসছে বিত্তলক্ষ্মীর বিজয়মুকুট নিজের মাথায় পরবার জন্যে। রুজি-রোজগারে ফেল করে মোক্ষ চাও? তাহলে বাছাধন ইণ্ডিয়ায় যাও, ইন্দোনেশিয়ায় যাও।

পকেটে টু-পাইস জমিয়ে তারপর যদি মোক্ষ-টোক্ষ ব্যাপারে মন চনমন করে তাহলে এখানে নো অবজেকশন। ফলে মজার ব্যাপারও হচ্ছে। বিত্তবান ফোর্ডের ছেলে যেমন মোক্ষসন্ধানী হচ্ছে তেমনি মোক্ষের পথ প্রদর্শন করতে এসে সর্বত্যাগী গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, যিনি ঐকদা নিজের দেশে বিরজা হোম নামক নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করেছিলেন, তিনি সোনার শিকলে বাঁধা পড়ছেন।—সন্ন্যাসী চাইছেন রোল্‌স রয়েস, ইঙ্গিত দিচ্ছেন—বলো না কোথায় ললনা?

এক বঙ্গবালা নিউ ইয়র্কে বসে আমাকে বলেছিলেন, "কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সমস্ত জাতটা। এখানে হেরেছো তো মরেছো, এখানে ঠকেছো তো ডুবেছো, এখানে জিতেছো তো সারা দুনিয়াটাই তোমার। সাফল্য-সচেতন সমাজ—রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড সোসাইটি। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে বলে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়েছিলেন। এখানে জন্ম থেকেই শিশুরা জানে, করতে না পারলে মরতে হবেই—হয়তো না খেতে পেয়ে নয়, কিন্তু অপমানে

কিংবা কিছু না করতে পারার দুঃসহ মানসিক জ্বালায়।"

এই মহিলাকে সবিনয়ে বলেছিলাম, "ভদ্রে, আপনার ইঙ্গিত আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, আমাকে একটু চান্স দিন। শুধু মোক্ষসন্ধানীদের গলায় মালা পরাবার জন্যে আমার এই দেশে পুনরাগমন নয়। আমি এবার চোখ এবং কান যতটা সম্ভব খুলে রেখে রাস্তা চলবো—হুজুগে পড়ে সমস্ত সময় অপচয় করার বাঙালীসুলভ দুর্বলতা যতটা পারি এড়িয়ে চলবো।"

ঠিক এই সময় প্রবীর রায়ের খবর পাওয়া গেলো। প্রবীরের কথা প্রথম শুনেছিলাম ডাক্তার তপন সরকারের কাছেই। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে বিপন্ন বঙ্গসন্তানদের অগতির গতি বলতে এই প্রবীর রায়। যে কোনো ব্যাপারে আটকে গেলে বিগতযুগের বাংলায় যেমন হরি ঘোষের গোয়াল ছিল তেমনি বিদেশে বিপদগ্রস্ত বাঙালীদের নিজস্ব ঠিকানা এই প্রবীর রায়ের টেলিফোন নম্বর। স্থানীয় মহলে যা জানা গেলো, পরোপকার করাটা এই বিয়াল্লিশ বছরের বঙ্গসন্তানটির একটি মুদ্রাদোষ অথবা বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে!

তপনের সঙ্গে যখন দেশে দেখা হয়েছিল তখন বলেছিল, "আপনি যখন নিউ ইয়র্কে আসবেন তখন আমি স্টেটসে না-ও থাকতে পারি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, প্রবীর রায়ের টেলিফোন নম্বর তো আপনার কাছে রইলো।"

আমি ভেবেছিলাম বাড়িয়ে বলাটাই বাঙালীদের স্বভাব-ধর্ম। আমাদের যা কিছু সামর্থ্য এবং দুর্বলতার উৎস হলো এই অতিরঞ্জন প্রবণতা। কিন্তু প্রবীর রায় সম্পর্কে সব জানবার পরে প্রবাসী বাঙালীদের আমি অত্যুক্তিদোষ থেকে মুক্তি দিয়েছি।

সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত খবরাখবর নেবার পরে, আমার মনে সন্দেহ রইলো না, নিউ ইয়র্কে ট্যুরিস্ট হিসেবে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দর্শনের পরে কোনো বঙ্গসন্তানের পরবর্তী অবশ্যদর্শনীয় এই প্রবীর রায়।

না, অযথা আশঙ্কা-অনলে দগ্ধ হবেন না। প্রবীর রায় কোনো আধ্যাত্মিক পুরুষ নন। আর পাঁচজন ভোগী গৃহীর মতন বিয়ে-থা করে, স্ত্রীপুত্র নিয়ে প্রবাসে সংসারযাত্রা করছেন চুটিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে উপদেশ দিয়েছিলেন—রোজগারপাতি করে দোলদুর্গোৎসব চালাও। সব লোক এই ভবসংসারে বৈরাগী হবার মনস্থ করলে সৃষ্টিকর্তার মূল উদ্দেশ্যেই তো বালি পড়বে! একবার তো বৌদ্ধযুগে ওই কাণ্ড ঘটেছিল—দেশের সেরা পুরুষগুলো দলে-দলে মুণ্ডিতমস্তকে সঙ্ঘে প্রবেশ করলো, সেকেণ্ড-রেট

মানুষগুলো কেবল ঘরসংসার করলো। ফলে পরবর্তী প্রজন্মে ভারতবর্ষের অকল্পনীয় অবনতি ঘটলো।

কিন্তু সংসারে এক এক জন লোক থাকেন যাঁরা বিষয়ের মধ্যে থেকেও নিরাসক্ত, বৈরাগী—এই ধরনের ক্যারেকটার বাংলা উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা এক সময় খুব পছন্দ করতেন। এঁরা বিষয়-রসে ডুবে থাকলেও এঁদের মনে লোভের চ্যাটচেটে ভাব থাকে না, ফলে কোনো ব্যাপারেই এঁরা অহেতুক সেঁটে গিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা খর্ব করেন না।

আরও শুনলাম, প্রবীর রায় একজন কাজ-পাগলা লোক। সমাজসেবা করেন বলে নিজের বৈষয়িক কাজে মন দেন না এমন নয়।

তপন বলেছিল, "লোকটা কাজের নেশায় মাতাল—ইংরিজিতে যাকে বলে ওয়ার্কোহলিক অর্থাৎ ওয়ার্কের অ্যালকোহলে যে মজেছে। কিন্তু তারই মধ্যে দেশের জন্যেও যথেষ্ট ভাবে এবং কাজও করে। যে কোনো দায়িত্ব ওর ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়—আমেরিকান কর্মদক্ষতা এবং ভারতীয় হৃদয়বেত্তা দিয়ে সে-কাজ প্রবীর করবেই।"

তপন বলেছিল, "যখন দেখা হচ্ছেই তখন প্রবীরের কাছেই শুনবেন, গোটা পঞ্চাশেক চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট—যাদের আপনারা সি-এ বলেন, ১৯৭৯ সালে দুটো ফ্লাইটে কলকাতা ছেড়ে নিউ ইয়র্কে চলে এসেছিল। তারপর তারা কিভাবে দিগ্বিজয় করলো।"

আর একজন রসিকতা করলো, "যারা ভাবে বাঙালী কুঁড়ে, বাঙালীর মধ্যে অ্যাডভেণ্চার নেই, ভেণ্চারও নেই, যারা চুপিচুপি বলে বেড়ায় উদ্যমহীন বাঙালী উচ্ছন্নে গিয়েছে, বাঙালীর দ্বারা 'কিসসু' হবে না, তারা একবার এই পঞ্চশটা বাঙালী সি-এ'র বিদেশযাত্রার ইতিহাসটা সবিস্তারে সংগ্রহ করুক। তারপর বুঝবে এককাট্টা হলে এই ভেতো বাঙালী এখনও কী করতে পারে! যাদের ধারণা পরস্পরের পিছনে লাগা, পরনিন্দা ও পরস্পরকে ডোবানো ছাড়া বাঙালীর অন্য কোনো বিশিষ্টতা নেই তারাও চলে আসুক এই পঞ্চাশটি যুবকের জীবনবিচিত্রা সংগ্রহ করতে। বাঙালী বালকরা স্বদেশের ইস্কুলে বসে শুধু দুলে-দুলে অকুতোভয় শ্বেতাঙ্গ পিলগ্রিম-ফাদারদের কথাই পড়বে, আর সত্তর দশকের দূরদর্শী সংগ্রামী বঙ্গীয় যুবকদের কথা জানতে পারবে না, তা কেমন করে সহ্য হয়?"

প্রবীর রায়ের সঙ্গে প্রথম দিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফস্কে গেলো। তিনি নাকি হঠাৎ ফেঁসে গিয়েছেন। দোষ ওঁর নয়, একজন প্রবাসী বাঙালী মহিলা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। প্রবীর রায় ওই ব্যাপারেই জড়িয়েছেন, তাই দেখা না-হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। শ্মশানসঙ্গী হিসেবে বাঙালীরা যে

পৃথিবীর এক নম্বর জাত তার পরিচয় মার্কিন দেশেও মিললো।

দ্বিতীয় দিনে দেখা হলো। প্রবীর রায়ের সায়েবী অফিসের সুবচনী মেমসায়েব মধুকণ্ঠে কটা বেজে ক' মিনিটে কোথায় মিস্টার রে'র সঙ্গে দেখা হবে তা জানিয়ে দিলেন। এই এক মুশকিল এই দেশে। ডায়াল করেছিলাম, কিন্তু তোমার লাইন পাইনি, বলার উপায় নেই। বেঁচে থাকুন কলকাতা টেলিফোনের কর্তাব্যক্তি এবং কর্মীরা! ওঁদের দোহাই দিয়ে যে-কোনো যোগাযোগ চেষ্টাকে যতদিন খুশি ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব। টেলিফোনে কাউকে পাওয়াটাই যেখানে অঘটন সেখানে যে-কোনো মিথ্যাচার ওঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রাসুখ উপভোগ করা যায়। আর পশ্চিমে চলেছে সামর্থ্যের প্রতিযোগিতা। চব্বিশ ঘন্টার সময়কে রবারের মতন টানতে-টানতে প্রতিটা মিনিট থেকে এরা কর্মরস নিংড়ে নিতে চায়। তাই মিনিট অনুযায়ীই অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়, কাল অনন্ত এই বলে আমাদের মতন হাত গুটিয়ে বসে থাকার উপায় নেই।

প্রবীরের যে ভাবমূর্তি মনে মনে এঁকে নিয়েছিলাম বাস্তবে তার সঙ্গে মিললো না। ভেবেছিলাম একটি মার্কিন ছাঁচে ঢালাই-করা ভূতপূর্ব বাঙালীকে দেখতে পাবো। কিন্তু মোটেই তা নয়। এই রকম হাবভাব ও চালচলনের সাধারণ বাঙালীকেই তো বি-বা-দী-বাগ-এর আশেপাশে ট্রাম-বাস ও মিনির জন্য অপেক্ষা করতে দেখি। একটু লজ্জা হলো। ওঁদের, অর্থাৎ ওই বিবাদীবাগী বাঙালী দেখে ভাবি, মোস্ট অর্ডিনারি, বিশ্বসংসারের কোনও শক্ত কাজ ওঁদের দ্বারা হবে না। ধারণাটা যে বস্তাপচা তা প্রবীর রায়ই প্রমাণ করে দিচ্ছেন। স্লিম শরীরের শ্যামবর্ণ বাঙালী। সাধারণের তুলনায় একটু লম্বা, বেশবাস সম্বন্ধে একটু উদাসীন—কোথাও কোনো এন-আর-আই (অনাবাসী ভারতীয়) ছাপ নেই।

অচিরেই আড্ডা জমে উঠলো। বললাম, "পঞ্চাশজন সি-এর মার্কিনমুলুক-বিজয় সম্বন্ধে কিছু শুনেছি।"

হাসলেন প্রবীরবাবু। "পঞ্চাশ নয়—শেষ পর্যন্ত আটচল্লিশ। দু'জন ফিরে গিয়েছিল ডিজগাস্টেড হয়ে—ওদের জন্যে কিছু করা গেলো না," দুঃখ করলেন প্রবীর রায়। যেন ওই দুটো বঙ্গীয় ব্যর্থতার জন্যে তিনি নিজেই দায়ী।

জানা গেলো, "এই আটচল্লিশজন সি-এ এদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে—কাজকর্ম খারাপ করছে না। আর খারাপ করবেই বা কেন? আমরা তো কোনো ভাবেই কারও থেকে ইনফিরিয়র নই।"

"ইট নিট রেস্তোরাঁর ব্যাপারটা কী? দেশে ফিরে গিয়ে দোকানটা আমাকে দেখতেই হবে।"

"আপনি ডালহৌসি পাড়ার নেতাজী সুভাষ রোডে আমাদের ফেবারিট

চায়ের দোকানটার তথ্যও শুনে নিয়েছেন! একসময় সায়েবপাড়ার চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট ফার্মের ছেলেরা ওখানে আড্ডা জমাতো। ওই দোকানে বসে-বসেই তো আমাদের বিদেশে আসবার পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল।"

প্রবীরের মুখেই শোনা গেলো—সে এক দুঃসময়। সত্তর-একাত্তর-এর কলকাতা—সর্বত্র হতাশা। কলকাত্তাওয়ালী কালীর বেপরোয়া নৃত্য চলেছে—ডুবতে বসেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রমোদতরণী। ব্যবসা থাকলে তো হিসেব, হিসেব থাকলে তো হিসেবরক্ষক। তরুণ চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্টদের চোখের সামনে অন্ধকার। বড় বড় অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে বসে সায়েব সাজার স্বপ্ন উধাও। লাভলক লুইস, ফার্গুসন, প্রাইস ওয়াটার হাউসের মতন বিখ্যাত অডিট প্রতিষ্ঠানের অনেক তরুণের মধ্যেও তখন বিভ্রান্তি। সেই সময় কে খবর আনলো, আমেরিকা দরজা খুলছে। সেখানে এখন যাওয়া সম্ভব।

"তার পরের ব্যাপারটা ড্রামাটিক বলতে পারেন। ১১ই অক্টোবর ১৯৭১ এবং ১৩ই অক্টোবর কলকাতা থেকে দুটো ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে পঞ্চাশজন বাঙালী সি-এ দেশছাড়া হলো—বিগেস্ট এক্সোডাস্ অফ সি-এজ ইন হিস্টরি বলতে পারেন!"

সেই দলে প্রবীরবাবু কেন নাম লেখালেন তা আমি অন্য সূত্রে শুনেছি। যে-অফিসে চাকরি করছিলেন সেখানে সম্পর্কটা ভাল চলছিল না। একটু উত্তেজনা, একটু প্রতিবাদ, একটু কথা কাটাকাটি—বাঙালীর রক্তে বিপ্লব ও প্রতিবাদের জীবাণু তো এখনও সম্পূর্ণ উধাও হয়নি। প্রবীর রায় অবশ্য ওসব কথা তুললেন না, শুধু বললেন, "আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানের মালিকরা এখনও ভীষণ স্বার্থপর, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা—মানুষকে সম্মান দেবার শিক্ষা ওখানে যে কবে হবে!"

আমি বললাম, "হবে, কিন্তু বেশ দেরি হবে। মানুষ যতদিন সহজলভ্য থাকবে, তু করে ডাকলেই যতদিন হাজার-হাজার হা-ঘরে একটা চাকরির জন্যে ছুটে আসবে ততদিন মানুষ তার মর্যাদা ফিরে পাবে না।"

প্রবীর রায় বললেন, "নিউ ইয়র্কে এসে আমরা অথৈজলে পড়লাম। কোথায় হাজার-হাজার ডলার পকেটে পুরে ফরেন গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন, আর কোথায় বেকারত্বের অভিশাপ, তা-ও আত্মীয়হীন বিদেশে। তারপরেই এলো হাড়কাঁপানো শীত। আমাদের দমিয়ে দেবার পক্ষে আদর্শ পরিবেশ। শুধু আমরা নই—নিউ ইয়র্কের পরপর কয়েকটা বাড়িতে তখন প্রায় এক হাজার বাঙালী ইমিগ্র্যান্ট—কারও কোনো চাকরি নেই। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট সবাই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে-কোনো নিয়োগপত্রের জন্যে। এক-এক ঘরে গাদাগাদি করে তিন-চারজন লোক—সবাই একসঙ্গে চাকরি

খুঁজতে বেরুচ্ছে। হাজার-হাজার কপি বায়োডাটা নিয়ে শত-শত নিঃসম্বল মানুষ দরজায়-দরজায় ধরনা দিচ্ছে—অথচ দেশে এদের অনেকেরই রুজিরোজগার ছিল। কে যেন মন্তব্য করেছিল তখন, একেই বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

"তারপর ?" আমি জানতে চাই।

উৎপাটিত বাঙালী তো নেতিয়ে পড়ে না, তার বুকের বাঘটা তো তখনই হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। এই বাঘটাই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এবং রাখবে। এই বাঙালী-বাঘকে সমীহ করে না এমন জীব এখনও সৃষ্টি হয়নি।

প্রবীরবাবু বললেন, "চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্টদের আবার ইউ-এস-এতে বাড়তি মুশকিল। ইণ্ডিয়ান সি-এর শিক্ষাগত যোগ্যতার এদেশে স্বীকৃতি নেই। সি-এর আমেরিকান কাউন্টারপার্ট হলো সি-পি-এ। আমেরিকান সি-পি-এ ফার্মগুলির ধারণা আমরা কোনো আজব দেশ থেকে এসেছি—আমরা ডেবিট ক্রেডিট জানলাম কী করে তাই বুঝতে পারে না।"

বেকার বাঙালীরা সবাই তখন অড্-জব খুঁজছে। প্রবীর রায় বললেন, "সে হোক টেবিল চেয়ার মোছা, বাথরুম সাফ করা বা প্যাকিং বাক্স নড়ানো অথবা লরিতে মাল তোলা—যে কাজই হোক। তখন কলকাতার কত ডাক্তারবাবু এদেশে ঘন্টা হিসেবে নাইট-শিফটে দারোয়ানের কাজ করছেন কয়েকটা ডলারের বিনিময়ে। দেশের আত্মীয়রা ভাবছেন, ছেলে আমার ফরেনে গিয়েছে বড় কাজ নিয়ে !"

প্রবীর বললেন, "তখন আমেরিকান সিস্টেমের হাওয়া কিন্তু আমাদের গায়ে লেগেছে। ডাকে আবেদনপত্র পাঠিয়ে লাভ নেই—অফিসে-অফিসে ঢুঁ মারা। সবাই এক অফিসে ভিড় করে লাভ নেই—পথখরচ বাঁচানোর জন্যে এক-একজন এক-এক অঞ্চলে যাও। তারপর দেখা করো কোনো এক কমন জায়গায়। দিনের শেষে আমরা দেখা করতাম নিউ ইয়র্ক লাইব্রেরিতে। তার একটা কারণ লাইব্রেরির টয়লেট ব্যবহার করা যায়—সারাদিন তো কোথাও ঢোকবার জায়গা নেই। যেখানেই যাই সেখানেই ইণ্ডিয়ানদের জন্যে নো ভেকান্সি। আমরা নিজেরাও বাজার খারাপ করে দিচ্ছি—একই অফিসে চোদ্দ পনেরোজন ইণ্ডিয়ান একই চাকরির জন্য ফোন করছি।"

বিকেল চারটে থেকে এক ডিপার্টমেন্ট স্টোরে অড্-জব করতেন প্রবীরবাবু। "লেম ব্রান্টে আমার কাজ ছিল শীতের কোট ২৮ থেকে ৪৬ সাইজ পর্যন্ত রঙ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা এবং অন্য এক বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। রাত সাড়ে-নটা পর্যন্ত এই কাজ চলতো—তখন প্রতিদিন পেতাম পনেরো ডলারের মতন। আমাদের ঘরভাড়া ছিল সপ্তাহে সাতাশ ডলার। বাকি যা থাকতো তাতে আমাদের ঘরের তিনজনেরই খাওয়ার খরচ চলে যেতো। ওরা দুজন তখন

হোলটাইম চাকরি খুঁজছে—সব অফিসে ব্যক্তিগত রিজিউমে পাঠাচ্ছে, 'অ্যাকাউনটেন্সির হেন কাজ নেই যা আমি নিজের দেশে না করে এসেছি—আমাকে পেলে তুমি বর্তে যাবে'।

"বাঙালী বেকারদের একবার হোলসেল রেটে সাময়িক কাজ জুটে গেলো। একজন এজেন্ট বললো, 'কতজন লোক আনতে পারো' ? বললাম, যত চাও। শেষ পর্যন্ত তিরিশ জনের কাজ হলো ঘন্টায় আড়াই ডলার হিসেবে ব্রু ক্রশ-এ।"

কিন্তু প্রফেশনাল চাকরি ? কেউ অচেনা ইণ্ডিয়ান অ্যাকাউনটেন্ট নিতে উৎসাহী নয়। এক ইটালিয়ান ভদ্রলোক—নাম রবার্ট বেনেগুরা, অবশেষে সহানুভূতি দেখালেন। বললেন, "আমি সিমপ্যাথেটিক—কিন্তু পার্টনারদের বোঝাই কি করে যে তুমি কাজের লোক ?"

প্রবীরের সোজাসুজি উত্তর ঃ "যে কোনো রেটে পনেরো দিন ট্রায়াল দিন। তবে একটি শর্তে।" সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, "মাইনে বাড়াবার শর্ত ?" প্রবীর বললেন, "সেটা আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আমার শর্ত ঃ আমার কাজ পছন্দ হলে আমার আরও কয়েকজন বন্ধুকে চান্স দেবেন।" সায়েব তাজ্জব, কিন্তু রাজি হলেন।

প্রবীর রায় বললেন, "চাকরিতে ঢুকেছিলাম ২৮শে নভেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর ট্রায়ালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। সাড়ে-সাঁইত্রিশ ঘন্টার সপ্তাহের জন্যে মাইনে দাঁড়ালো ১৫০ ডলার এবং সবচেয়ে যা আনন্দের, ক্রমে-ক্রমে বারোটি বঙ্গসন্তানের অন্নসংস্থান হলো ওখানে।"

এই সময় অ্যাকাউন্টিং-এর কাজে যেসব অফিসে যেতেন প্রবীর সেখানেই খোঁজ করতেন লোক লাগবে কিনা এবং লাগলে সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি বেকার প্রবাসীর চাকরির ব্যবস্থা হতো। মেঘ কেটে যাচ্ছে—রবার্ট বেনেগুরা নিজে ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন, তাই এদের দুঃখ বুঝেছিলেন এবং সেই সুবাদেই এদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো।

এরপর সকলের চেষ্টা আরম্ভ হলো, কি করে এদেশে সি-পি-এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান সি-এদের ব্যাপারটা আমেরিকানদের অজানা—পরীক্ষায় কোনো ছাড় নেই। তখন দেখা গেলো এম-বি-এ হলে ব্যাপারটা ওঁদের অনেক সহজ হতে পারে। নিউ ইয়র্কের বাঙালী সি-এ-রা তখন ঝাঁকে ঝাঁকে এম-বি-এ পড়ছে। বাপের হোটেলে থেকে মন দিয়ে পড়াশোনার অভ্যাস করে এসেছে বাঙালী—পরীক্ষায় তাদের বেকায়দায় ফেলা অত সহজ নয়, বললেন প্রবীর রায়।

একটু চান্স পেয়েই, এক বছর পরে প্রবীর রায় পুরনো চাকরিটা ছাড়লেন।

সরে না পড়লে এদেশে মাইনে বাড়ে না। ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে প্রবীরের মাইনে দাঁড়ালো বাৎসরিক পনেরো হাজার ডলার। নতুন অফিসে ছয়-সাত জন বঙ্গসন্তানের কাজও জুটলো।

আত্মোন্নতি ছাড়া তখন এই প্রবাসী যুবসম্প্রদায়ের আর কোনো লক্ষ্য নেই। সবাই নানা বাধা সত্ত্বেও সি-পি-এ পরীক্ষায় বসতে লাগলো। ইন্ডিয়ান ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে ঘাড় গুঁজে লিখিত পরীক্ষায় বাজিমাত করার ব্যাপারে ভারতীয়রা তুলনাহীন।

"আমেরিকান অ্যাকাউনটেন্টের তকমা নিয়ে অবশেষে যে-অফিসে গটগটিয়ে ঢুকলাম তার নাম ল্যাভেনথল অ্যাণ্ড হরওয়ার্থ। ওঁদের দু'শ ব্রাঞ্চ, কাজকর্ম দেখে কর্তারা খুব খুশি। ইঙ্গিতে বুঝলাম এইভাবে এগোলে যথাসময়ে পার্টনারশিপও পাওয়া যেতে পারে। আরও কিছুদিন কাজ করে, ছুটি নিয়ে দুনিয়া দেখতে বেরোলাম। ওয়ার্লড ট্যুর করে এসে হঠাৎ মনে হলো, চাকরির জন্যেই কি বাঙালীর জন্ম হয়েছে? আমরা কি নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পারবো না!"

প্রবীর রায় নিজের মনেই বললেন, "দুম করে চাকরিটা ছেড়ে দিলাম ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে। নিজেই কোম্পানি করলাম। ইন্ডিয়ান ক্লায়েন্ট বেশি ছিল না, বেশির ভাগ এদেশীয়—একজন ইটালিয়ান ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ছিল বাড়ি, কারখানা ইত্যাদি তৈরির কারবার। কনসট্রাকশন লাইন থেকে অনেক বন্ধুকে আস্তে-আস্তে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমার একটা ভাগ্য, যে-ক্লায়েন্ট আসে সে আর চলে যায় না। প্রতি বছরই নতুন কিছু ক্লায়েন্ট জোটে—তাই বাড়তে-বাড়তে একাধিক অফিস আমাকেও করতে হয়েছে। কনসট্রাকশন সংক্রান্ত হিসেব-নিকেশের কিছু স্পেশাল জ্ঞানও হয়েছে।"

বেশ ক'জন সায়েব এখন প্রবীরবাবুর ফার্মে কাজ করেন।

কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সি ফার্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি এই সাক্ষাৎকার নিতে আসিনি। বিদেশে বাঙালীদের সাফল্য সম্পর্কে যে সংবাদ নেবার জন্যে এসেছি তার ইঙ্গিত এবারে দিতে হলো।

প্রবীরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যারা একদিন অড-জবের জন্যে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা এখন গুছিয়ে বসেছে। ভারতীয় সমাজ সম্পর্কেও এই কথাটা বলতে পারেন। এই তো খবর বেরিয়েছে, এ-দেশে যত এথনিক গ্রুপ আছে তার মধ্যে এখন ভারতীয়দেরই গড় আয় সবচেয়ে বেশি! আগে ছিল আইরিশ, তারা পিছু হটেছে। নিজেদের নিষ্ঠা ও সাধনায় ভারতীয়রা এই সম্মান অর্জন করেছেন।"

ব্যাপারটা যে সোজা নয়, বেশ বুঝতে পারছি। এই তো এখানকার কাগজে রিপোর্ট পড়লাম, প্রতি একলাখে ১৩৬ জন মিলিয়নেয়র আছেন এই দেশে। টাকার হিসেবে প্রতি লাখে ১৩৬ জন কোটিপতি ! নর্থ ডাকোটাতে এঁদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রতি লাখে ৫৬৫ জন !

প্রবীরবাবু বললেন, "নিউ ইয়র্ক এবং লাগোয়া আরও দুটি স্টেটে হাই ইনকাম ব্র্যাকেটের অনেক বাঙালীর সঙ্গেই আমার যোগাযোগ। এঁদের অনেকের হিসেবই শুধু আমি রাখি না, টাকাটা কিভাবে খাটানো যায় তার দায়িত্বও আমার ওপরে তুলে দেন এঁরা।"

আমি বললাম, "তাজ্জব ব্যাপার ! কলকাতায় তো বাঙালীরা অন্য প্রদেশের বড়লোকদের হাতে নিজের ভদ্রাসন বেচে দেবার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে, বাঙালীর নিজস্ব ভিটে বলতে কিছুই এই চার্নক সায়েবের নগরীতে থাকবে না। এইসব শুনে যখন মন খারাপ হচ্ছিল তখন শুনলাম বাঙালীরা নিউ ইয়র্ক শহরে বিরাট এক ম্যানসন বাড়ি কিনে নিয়েছে যেখানে বত্রিশটি পরিবার থাকতে পারে। বাড়ির নতুন নাম ঃ বঙ্গভবন। নিউ ইয়র্ক শহরের কাছে বিরাট এক সম্পত্তির মালিকানাও এখন তাঁদের হাতে। সেখানে নাকি নতুন একটা শহরের পত্তন হবে।"

প্রবীরবাবু স্বীকার করলেন, আমি খুব মিথ্যে শুনিনি। ছ'মাইল লম্বা একটা জমি নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র একশ মাইল দূরে কেনা হয়েছে। সেখানে ৮২৫ একর জমিতে চোদ্দ মাইল রাস্তা তৈরি হবে।

আমার মাথা ঘুরছে। এ-জানলে, একাত্তর সালে কলকাতায় আরও একটু গোলমাল করতাম, দুখানার জায়গায় চারখানা প্লেনভর্তি যুবক পাঠাতাম নতুন-ভূ-খন্ডে ভাগ্যের সঙ্গে নতুনভাবে মোকাবিলা করতে !

প্রবীরবাবু একটু লজ্জা পেলেন। ওঁর কথা হলো, সব সম্প্রদায় যখন লক্ষ্মীর সাধনায় এগিয়ে চলেছে তখন আমরাই বা পিছিয়ে পড়বো কেন ? জমি-জমা সম্পত্তির ব্যাপারে ইন্ডিয়ানরা অবশ্যই মন দেবে, আমরা কী চিরকাল এই বিদেশে ছন্নছাড়া হয়ে থাকবো ?

কনস্ট্রাকশন সংক্রান্ত কোম্পানির হিসেব-নিকেশ করতে-করতে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা হয় প্রবীর রায়ের। তারপর ইচ্ছা হলো সেটা কাজে লাগাবার। যাঁদের কিছু সঞ্চয় আছে তাঁরা নিরাপদ-ব্যবসায় কেন টাকা খাটাবে না ? সেই সঙ্গে এদেশে যাঁরা অনেক বেশি আয় করেন তাঁদের ট্যাক্সের হার কমাবার নানা আইনসঙ্গত পথ আছে।

এসব জিনিস আমার মাথায় তেমন ঢোকে না। অঙ্কটা কোনদিনই আমার প্রিয় বিষয় নয়। কিন্তু প্রবীরবাবু ছাড়বার পাত্র নন। রসিকতা করলেন,

"আপনিই তো চিন্ময় ঘোষের উদ্ধৃতি দিলেন—চ্যালেঞ্জ ইওর লিমিটেশন। নিজের সীমাবদ্ধতাকে নিজেই চ্যালেঞ্জ করো। ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। আমেরিকান সরকার মানুষকে নতুন-নতুন বিষয়ে ঝুঁকি নিতে উৎসাহ দেয়—সেই-সব উদ্যমে ডলার বিনিয়োগ করে লোকসান হলে তা ট্যাক্স থেকে কাটা যায়। সম্পত্তি সৃষ্টির ব্যাপারটা এই রকম। যাঁরা টাকা ঢালছেন, তাঁরা গোড়ার দিকে লোকসানের জন্যে তাঁদের দেয় ট্যাক্স থেকে কিছুটা রেহাই পাচ্ছেন—কয়েক বছর পরে সম্পত্তির দাম বাড়ছে, তখন হচ্ছে মূলধনী লাভ—ক্যাপিটাল গেইন্স।"

প্রবীরবাবুর বিনিয়োগ পরিকল্পনায় যাঁরা টাকা রাখছেন তাঁদের বিনিয়োগের দাম প্রতি বছর ডবল হচ্ছে, সেই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে ট্যাক্স রেহাইয়ের আইনসঙ্গত পথ।

প্রবীরবাবু বললেন, "প্রথমে একটা আকর লোহার খনি কিনেছিলাম। বহু টাকা লোকসান হলো। দাঁড়াতে পারতাম না, কিন্তু অন্য প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টে লাভের মুখ দেখা গেল।"

এখন ওঁদের গ্রুপের মধ্যে প্রচুর বাঙালী এবং কিছু ইহুদি ও ইটালিয়ান আছেন। সম্পত্তির দাম হবে অন্তত ষাট কোটি টাকা। নতুন লগ্নি আসছে প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকা এবং সেই লগ্নির জোরে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে পঁচিশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাচ্ছে বিভিন্ন পরিকল্পনায়। প্রতি বছর ডেভেলপ-করা একটা সম্পত্তি বেচে দেওয়া হচ্ছে এবং নতুন দুটি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে। কোথায় কোন্ জায়গায় বাড়ি করলে লাভ হবে তা ঠিক করা এদেশে এক জটিল কাজ—এর জন্যে উকিল, রাজনীতিবিদ, নগর-পরিকল্পনাবিদ থেকে আরম্ভ করে তদ্বিরকারক পর্যন্ত অনেক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়।

নতুন শহর পত্তন করার ব্যাপারে প্রবীরবাবু বললেন, "হ্যাঁ স্বীকার করছি। দেশের লোকদের বলতে পারেন, আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র ১০০ মাইল দূরে ছ'মাইল জমি কিনেছি, একটা পাহাড় সমেত। মোট ৮২৫ একর জমি। এখানে শ'আড়াই প্রাসাদ তৈরি হবে। সব মিলিয়ে প্রায় ৬০/৬৫ কোটি টাকার পরিকল্পনা।"

এসব শুনেও আনন্দ। বললাম, "আপনি আমাদের মরা গাঙে জোয়ার আনছেন। এসব থেকে শুধু আপনাদেরই সমৃদ্ধি হচ্ছে না, দেশে আমাদেরও উপকার হবে। আমরা ভাবতে পারবো, বাঙালীরা নিজেদের বুদ্ধিতে এবং শক্তিতে মার্কিন দেশে গিয়েও বিজয়ী হতে পারে। কে বলে প্রতিযোগিতায় গোহারান হারবার জন্যেই আমাদের জন্ম হয়েছে?"

প্রবীরবাবু বললেন, "আমরা ভার্জিনিয়াতে কেবলমাত্র বাঙালীদের জন্যে

একটা বার্ধক্যনিবাস তৈরির কথাও ভাবছি। কুড়ি বছর আগে যখন আপনি এদেশে এসেছিলেন তখন বাঙালীর সংখ্যা হাতে গোনা যেতো—দেশে ফিরে যাবার জন্যে সবাই উঁচিয়ে থাকতো। বয়সটাও ছিল খুব কম—তখন তো কেবল তারুণ্যের জয়গান। তারপর নতুন করে দরজা খুললো আমেরিকার, আমরা কিছু মানুষ ঐ সাতের দশকের গোড়ায় রিস্ক নিয়ে চলে এলাম। সেই সব তরুণের এখন বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। গড়পড়তা বয়স বলতে পারেন পঁয়তাল্লিশ। এখন থেকে পনেরো-ষোলো বছর পরেই বার্ধক্যের সমস্যা দেখা দেবে বেশ বড় ভাবে। আমেরিকায় প্রতিপালিত নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বার্ধক্যে একত্রে বসবাস সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কারণ, এদেশের সামাজিক পরিবেশকে অস্বীকার করে আমাদের ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হচ্ছে না।"

প্রবীরবাবুর মতে, "টাকা থাকলেও নিজের বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করা বুড়ো বয়সে অসম্ভব ব্যাপার। কে ঝাঁট দেবে ? কে বরফ তুলবে ? তাই আমরা ভাবছি একটা সমান্তরাল ইন্ডিয়া সেন্টারের কথা—যার একটা শাখা থাকবে ভারতবর্ষে, আর-একটা এদেশে। কারও কোনো নির্দিষ্ট ফ্ল্যাট বা ঘর থাকবে না। তবে যেখানে যখন খুশি গিয়ে থাকতে পারবে। ইচ্ছে হলে ছ' মাস দেশে চলে যাও। মন চাইলে ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি এসো। ইটালিয়ান বা গ্রীকদের সঙ্গে একই হোমে শেষ জীবন কাটানো ভেতো বাঙালীর পক্ষে বোধহয় সম্ভব হবে না।"

"কিন্তু এই যে এবারেও অনেকে বললেন, তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন ?" আমার প্রশ্ন।

মাথা নাড়লেন প্রবীরবাবু। "আমার মনে হয় না এখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারবে। এদেশের প্রবেশপথ আছে, প্রস্থান-দ্বার নেই ! যে এসেছে সে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো এক মোহিনী মায়ায় এই বিচিত্র সমাজদেহে লীন হয়ে গিয়েছে। এদেশে প্রবাসী ভারতীয়রা মাঝে মাঝে ভুলে যান যে তাঁরা যেমন ইন্ডিয়ান তেমন দু'একটি আমেরিকান সিটিজানের জনক-জননী।"

প্রবীরবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। বাঙালী সমাজের সেবায় তাঁর অনেকটা সময়ে কেটে যায়। যেখানে যত সমস্যা তার খবর প্রথমেই ওঁর কাছে এসে যায়। ভদ্রলোকের দুঃসাহসও আছে। সুযোগ পেলেই দেশের আত্মীয়-স্বজনদের এদেশে আনিয়েছেন। আর কতশত চেনা-অচেনা মানুষকে নিজের দায়িত্বে স্পনসর করিয়েছেন তার হিসেব নেই।

প্রবীরবাবুর স্ত্রী এখন মার্কিন নাগরিক। প্রবীরবাবু নিজের মনেই বললেন, "উপায় ছিল না। সিটিজানশিপ না নিলে নিজের ভাইকে এদেশে আনাতে পারতো না। পাসপোর্টের রঙ যাই হোক, মানুষের জন্মের ইতিহাসটা তো মুছে ফেলা যায় না। আমাদের বুকের মধ্যে ভারতবর্ষের ছাপ চিরকাল আঁকা

থাকবে—আপনারা আমাদের নিজের দেশের লোক বলুন, চাই না বলুন।"

প্রাণ হাতে করে ম্যানহাটানের মস্ত এক রাস্তা পদব্রজে পার হচ্ছি, সেই সময় নির্ভেজাল হাওড়ীয় উচ্চারণে কে যেন পিছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো।

এখানে রাস্তা পার হবার সময় কোনো সৌজন্য নেই, সামাজিকতা নেই, একেবারে হিজ-হিজ হুজ-হুজ। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—এই উপদেশ আনোয়ার ও মলি আমাকে পই-পই করে দিয়েছিল। পথ পেরোতে গিয়ে একেবারে ভবসাগর পেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা বিদেশে এতোই সহজ যে ডবল সাবধান হওয়াটা মোটেই বোকামির কাজ নয়। সুতরাং আমি নিজের হাওড়ার প্রাণহরা ডাক শুনেও মনঃসংযোগ না হারিয়ে প্রথমেই পথ পেরোনোর কাজটা সেরে ফেললাম।

হাওড়া-কাশুন্দিয়ার ভয়েস ততক্ষণে আমার খুব কাছে চলে এসেছে। বলছে, "আরে শংকর না ? তুই এখানে ? দুনিয়াটা সত্যিই ছোট হয়ে গিয়েছে।"

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে অবাক ! "মিছরিদা না ?" সত্যিই মিষ্টি এক সারপ্রাইজ !

মিছরিদা ততক্ষণে আমার হাত চেপে ধরেছেন। বলছেন, "ফরেনে ইণ্ডিয়ান দেখলেই আনন্দ হয়, আর খোদ কাশুন্দেপাড়ার ছেলে 'কাশুণ্ডিয়ান' দেখলে তো ভেরি ভেরি স্পেশাল আনন্দ।"

দুই দেশোয়ালির দেখা হওয়ায় আমরা ফুটপাথের একধারে সরে এলাম। মিছরিদার ভাল নাম মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, বয়সে আমার থেকে অন্ততঃ ছ'বছরের বড়। মেদহীন শরীর, সাড়ে পাঁচফুট লম্বা। চুলগুলো কাঁচায়-পাকায় মেশানো। একেবারে গেরস্ত মানুষ। মিছরিদা এবার বলে উঠলেন, "তা তুই এখানে ? বলা নেই কওয়া নেই খোদ নিউ ইয়র্কে ?"

আমি মাথা নিচু করে বললাম, "পাকে-চক্রে হয়ে গিয়েছে মিছরিদা। কোনো আগাম পরিকল্পনা ছিল না। ছুটি নিয়ে শিবপুরের বাড়ির কেঠো চেয়ারে বসে মাথা নিচু করে উপন্যাসের শেষ কয়েকটা পরিচ্ছেদ লিখছিলাম—শেষ দিকে ভীষণ কনসেনট্রেশন লাগে আপনি জানেন তো ! গল্প হচ্ছে উড়োজাহাজের মত—যা কিছু বিপত্তি তা হয় টেক-অফ না-হয় ল্যাণ্ডিং-এর সময়। বিশেষ

করে ওই ল্যাণ্ডিংটা খুবই বিপজ্জনক! তা লেখার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি, এমন সময় প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে বিকল বাড়ির টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। ফোনের ওধারে আমার 'নাইনটিন ফরটি-এইট মার্কা' বন্ধু সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সুপ্রিয় যে টোয়েন্টি ইয়ারস্ এগো আমাকে ওভারকোট ধার দিয়ে প্রথম ফরেনে পাঠিয়েছিল। সে-ই ফোন করছে।"

"তা কী বললো সেই ছোকরা?"

"খুব ড্রামাটিক। বললো, 'বাড়ি থেকে বেরিও না। আধঘন্টার মধ্যেই ফরেন থেকে একটা ফোন-কল পাবে। প্লিজ স্ট্যাণ্ড বাই'। আপনি তো জানেন, ফরেনের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, একমাত্র ফরেন বুক ছাড়া। তা আধঘন্টার মধ্যে ফোন এলো, ক্লিভল্যাণ্ড ওহায়ো থেকে। ডক্টর রণজিৎ দত্ত—তিনিও নাইনটিন ফর্টিএইটে ম্যাট্রিক পাশ করে ভায়া প্রেসিডেন্সি কলেজ ফরেনে কেষ্টবিষ্টু হয়েছেন। সুপ্রিয়ই আমাকে টিপস্ দিয়েছিল, 'মার্কিন মুলুকের বঙ্গ-সন্তানের সঙ্গে আলাপ হলেই নির্ভয়ে সারনেমের আগে একটা ডক্টর জুড়ে দিতে পারো—নাইন আউট অফ টেন কেসে ভুল হবে না'।"

মিছরিদা শুনে যাচ্ছেন। বললাম, "ডঃ রণজিৎ দত্ত আমার চক্ষু ছানাবড়া করে দিলেন। উত্তর আমেরিকা—অর্থাৎ ইউ-এস-এ ও কানাডার বঙ্গীয় সমাজ তিনদিনব্যাপী এক বেঙ্গলি কনফারেন্স করছেন। সেখানে একজন 'দ্যাশ'-এর লোক নিয়ে যাবার অভিরুচি হয়েছে উদ্যোক্তাদের, সুতরাং আমি নিশ্চয় যাচ্ছি। কথা বলবো কী, হঠাৎ আর একটা বাঙালী গলা কোথা থেকে ভেসে এলো—'চলে আসুন!' আমি সঙ্গে সঙ্গে রণজিৎবাবুকে বললাম, সর্বনাশ! ফরেন কলেও ক্রশ কানেকশন হয়েছে, একজন লোক মাঝখান থেকে টিপ্পনি কাটছে।

"রণজিৎবাবু আমাকে আবার তাজ্জব করলেন। 'ক্রশ কানেকশন নয়—আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে টেলিফোন কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা করে কনফারেন্স লাইন নিয়েছি। ওদিকে রয়েছেন আমাদের সেমিনার সেক্রেটারি ডক্টর দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, আপনার সঙ্গে আপনার বক্তৃতার বিষয়ে কথা বলে নেবে।'

"অতীব সুখের কথা! একটি বক্তৃতা থেকেই যদি রাহা খরচ জোটে! কোনো সিরিয়াস বিষয় নয়—দেশের গপ্পোগুজব শোনবার জন্যে আমেরিকার বঙ্গীয় সমাজ নাকি উপোসী ছারপোকার মত হয়ে রয়েছেন, রসিকতা করলেন দিব্যেন্দুবাবু।

"কিন্তু হাতে মাত্র একসপ্তাহ সময়। আমি রণজিৎ দত্তকে বললাম, আমার পাসপোর্ট নেই। ওসব পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি। দত্ত-ভট্টাচার্য

কনফারেন্স লাইনে ক্লিভল্যাণ্ডের দুই প্রান্ত থেকে হাসাহাসি করলেন। বিশ্বাস করলেন না যে পাসপোর্ট নামক বস্তুটি আমার সত্যিই নেই। 'আপনি তাহলে কোন্ ফ্লাইটে আসছেন জানিয়ে দেবেন্, আমরা সোজা মার্কিন ভিসা অফিসকে স্পনসরশিপ পাঠাচ্ছি'—এই বলে আমাকে অথৈ জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁরা লাইন কেটে দিলেন।"

মিছরিদা বললেন, "গাঁজাখুরি মারার জায়গা পাসনি ! তুই বলতে চাচ্ছিস, পাসপোর্ট অফিস, পুলিস অফিস, ভিসা অফিসকে ডিঙিয়ে তুই এই শর্ট টাইমে ফরেনে এসেছিস !"

"মোটেই গাঁজাগুলি নয়, মিছরিদা। পাসপোর্ট অফিসে এখনও অনেক দয়ার শরীর রয়েছে। ওই অফিসের খোদ কর্তা যেমনি শুনলেন বঙ্গীয় সমাজের ডাকে আমি বিদেশে যেতে চাই, সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধে হবে না, যদি পুলিশ আপনাকে তাড়াতাড়ি ছাড়ে।' পরবর্তী দৃশ্যে হাওড়া পুলিশের কাছে আমি করজোড়—দু'দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিন।' ওখানকার ডি-আই-বি প্রধান দত্তসায়েব বললেন, 'আপনার কথা রাখতে পারলাম না ! দু'দিন নয়, এখনই রিপোর্ট পাঠাচ্ছি'।

"সব যেন ম্যাজিকের মতন হয়ে গেলো, মিছরিদা। আমি উড়ে এসে জুড়ে বসলাম ক্লিভল্যাণ্ডে। তারপর পাক খেতে-খেতে এই নিউ ইয়র্কে—দুনিয়ার মানুষ যেখানে আসার স্বপ্নে মাতাল !"

"তা তোর বঙ্গীয় সম্মেলনের কী হলো ?" মিছরিদা জিজ্ঞেস করলেন।

"সে সমস্ত গল্প, অনেক সময় লেগে যাবে। মার্কিনী দক্ষতার সঙ্গে বাঙালী মেজাজের খাদ মিশলে যা-হয় তার নাম গিনি সোনা—বাইশ ক্যারাট। কিন্তু তার আগে আপনার কথা বলুন।"

মিছরিদা বললেন, "ওরে হতভাগা, এটা তোর হাওড়া-কাশুন্দে কিংবা বাজেশিবপুর নয়। এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইভাবে কথা বলা ঠিক নয়। চল কোথাও গিয়ে একটু ড্রিংক করবি।"

ড্রিংক ! মিছরিদা ! এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে ! নিষ্ঠাবান, রক্ষণশীল ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পরিবার, সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। তিন ভাই, পিক্যুলিয়র ডাক নাম—পাটালি, মিছরি ও বাতাসা।

মিছরিদা হাওড়ায় টোটো করে ঘুরে বেড়ান, আমাদের খুব ভালবাসেন। জোর দেন প্লেন লিভিং ও হাই থিংকিং-এর ওপর। সত্যি কথা বলতে কি, অফিস যাবার সময় ছাড়া মিছরিদাকে আমরা শহরের কোনো জায়গায় ফতুয়া এবং লুঙি বাদে অন্য কোনো ড্রেসে দেখিনি। আমরা বলতাম, হাওড়া কোনোদিন কলকাতার খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হলে

ওই ফতুয়া এবং লুঙিই হবে আমাদের ন্যাশনাল ড্রেস। আমি মানসচক্ষে দেখলাম, ফতুয়া-লুঙি পরে ম্যানহাটানের বার-এ বসে আমি ও মিছরিদা ড্রিংক করছি।

মিছরিদা কিন্তু একটু হতাশ করলেন। "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রকৃত সেবাইত আমরা—মদের লাইনে যাবো না। আমরা ড্রিংক করবো কোকাকোলা অথবা কফি।"

"হোয়াট অ্যাবাউট চা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

জিভ কাটলেন মিছরিদা। "ছিঃ ছিঃ—এখানে চায়ের নামে যা চলে তা চা নয়। এই নিউ ইয়র্কে এসে বুঝতে পারলাম, কেন স্যার পি. সি. রায় বলতেন, চা পান না বিষ পান! এ-জানলে, কলেজ স্ট্রীটের সুবোধের দোকান থেকে কিছু চা সঙ্গে নিয়ে আসতাম, লোকে বুঝতো চা কাকে বলে।"

মিছরিদা বুঝিয়ে দিলেন, আপ্যায়নের খরচ তিনিই দেবেন। "এখানে আমার পয়সার কোনো অভাব নেই রে! এসেই এক ডাক্তারের দুটো ছেলের পৈতে দিয়ে দিয়েছি। কিছুতেই শুনলো না, গামছায় তিনশ ডলার বেঁধে দিয়েছে। কি করে খরচ করবো বুঝে উঠতে পারছি না।"

মিছরিদা বললেন, "তোর যদি জানাশোনা কোনো ছোকরা পুরোহিত থাকে তো পাঠিয়ে দে। এদেশে টু-পাইস করবে।"

"কিন্তু গ্রীন কার্ড?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"হিন্দু ধর্মটা যে হাই-টেকনলজি তা বোঝাতে পারলেই স্পেশাল সুযোগ পেয়ে যাবে। তাছাড়া এদেশের বাঙালী মেয়ে বিয়ে করলে তো কোনো কথাই নেই। মেয়ের বাপরা এতোদিন দেশ থেকে ডাক্তার ইমপোর্ট করছিল। এখন সে-গুড়ে স্যাণ্ড! ইণ্ডিয়ান ডাক্তার কিছুতেই আমেরিকান লাইসেন্স পাচ্ছে না। পাবে কী করে? এখানকার ডাক্তারি আর ওখানকার ডাক্তারি তো আকাশপাতাল তফাত হয়ে গিয়েছে। ফলে গ্রীন কার্ড-হোল্ডার বউ থাকা সত্ত্বেও ইণ্ডিয়ান ডাক্তারবাবু এখানে নাইট দারোয়ানগিরি কিংবা দোকানে চাকর-বাকরের কাজ করছে। আর এই সব আমেরিকায় বড় হয়ে-ওঠা বাঙালী মেয়েদের কথাও কী বলি! একটা কমবয়সী পুরুত দেশ থেকে আনলে তার গৃহিণী হিসেবে অনেক বেশি সুখে থাকবে।"

মিছরিদা কোকাকোলা অর্ডার করলেন। "যদ্দিন এখানে আছিস, একটু খেয়ে নে। দেশে তো ও-জিনিস পাবি না। আর এই কোকাকোলার স্বাদ যার ভাল লেগেছে তার পোড়া মুখে আর কিছু রুচবে না। বাহাদুর কোম্পানী বটে—কোলায় কী মেশায় তা কেউ এখনও ফাঁস করতে পারলো না। গোপন ফর্মূলায় বিশ্ববিজয় করলো।"

মুখ বেঁকালেন মিছরিদা, "দ্যাখ, আমেরিকানরা বোকা। ওরা যদি সম্রাট অশোকের পলিসিটা মন দিয়ে স্টাডি করতো তা হলে গায়ের জোরে দুনিয়া কনট্রোল করার স্বপ্ন না-দেখে কোকাকোলা দিয়েই বিশ্ববিজয় করতে পারতো। সম্রাট অশোক তো এই লাইনকেই বলেছিলেন ধর্মবিজয়।"

মিছরিদা কলকাতায় এক প্রাইভেট অফিসে মাঝারি কাজ করেন। অবসর সময়ে একটু-আধটু পুরোহিতগিরি চলে। "সাত পুরুষের লাইসেন্স, ইচ্ছে করলেই ফেলে দেওয়া যায়নারে।"

"এবার বলুন, আপনি হঠাৎ আমেরিকায়?"

"প্রফেশনাল কাজে, তোরই মতন," গম্ভীরভাবে ঠোঁট বাঁকালেন মিছরিদা। "তফাতের মধ্যে, তুই একটা টেলিফোন কলেই চলে এসেছিস, আমি পরপর সাতখানা চিঠি পেয়েও নট নড়ন-চড়ন ছিলাম। তুই তো আমার ছোটভাই বাতাসাকে চিনতিস, যার ডাকনাম অনাদি। এখানে অ্যানডি হয়েছে। অনেক বছর রয়েছে এখানে মেমসায়েব বিয়ে করে। আমাদের সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ ছিল না। বছরে এক-আধখানা চিঠিচাপটা চলতো। সেই অ্যানডির মেয়ে সমত্থ হয়েছে, বিয়ের ঠিকঠাক। মেয়ের ইচ্ছে একেবারে বাঙালী মতে বিয়ে হোক।

"তা সেই খবর পেয়ে আমরা লিখলাম, পাত্রী নিয়ে দেশে চলে এসো। বরযাত্রীও আসুক পিছু-পিছু। এখানে এই ধরনের বিয়ে এক-আধটা হচ্ছে। সায়েবরা মন্তর-টন্তর পড়তে পেলে খুব খুশি হচ্ছে। কিন্তু বাতাসা লিখলো, খুব বড়লোকেরা ওই ধরনের বিয়ে দেশে গিয়ে দিচ্ছে। বরযাত্রীরা গিয়ে উঠছে কলকাতার ওবেরয় গ্র্যাণ্ডে, ওখানকার রাজকীয় বলরুমেই ছাদনাতলা হচ্ছে। কিন্তু বাতাসা অত খরচ করতে চায় না। তখন ঠিক হলো দেশ থেকে পুরুত আসবে।"

এরপর মিছরিদা যা বললেন তা এই রকম ঃ পুরোহিতের বংশ। সুতরাং কোনো অসুবিধে নেই। প্রথমে দাদাকে (যাঁর ডাকনাম পাটালি) ধরা হলো। পাটালিদা নিষ্ঠাবান ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। রাজি হলেন না। বললেন, ম্লেচ্ছ সংসর্গে বাতাসার সবই তো নষ্ট হয়েছে, এখন আবার হিঁদুয়ানি কেন? স্বস্ত্যয়ন করে দোষটোশ কাটিয়ে নেবার প্রস্তাব উঠেছিল। এমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়, সেই আদিযুগ থেকেই হিন্দুরা তো হিন্ট দিচ্ছেন—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। বাতাসার বিদেশী বধূটি সত্যিই রত্নবিশেষ। কিন্তু পাটালিদা সাহস পেলেন না।

অগত্যা মিছরিদা সাহস দেখালেন। "বড্ড মিষ্টি মেয়ে আমার এই ভাইঝিটা। পাঁজি, পুরোহিতদর্পণ ইত্যাদি ব্যাগে পুরেই সোজা চলে আসতে হলো। ঠিক হয়েছে ছোটভাই নিজেই সম্প্রদান করবে, আর আমি পুরোহিতগিরি করবো।

আমি তো অন্তত শ'দেড়েক বিয়ে দিয়েছি।"

মিছরিদা জানালেন, "এসে হাজির হয়েছি। কিন্তু বিয়ে এখনো হয়নি। দিন কয়েক বাকি। সেই সময়টা একটু ঘুরে নিচ্ছি। দেশটা দেখলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়—তুই এদের সম্বন্ধে লিখে যা খণ্ডের পর খণ্ড। বাহাদুর জাত বটে। এমনভাবে এদের জীবন দেখবি এবং এমনভাবে লিখবি যাতে আমাদের দেশের ছোঁড়ারা ভিরমি খায়! এই দেখ না, আমার কেসটা—দেশে তো শ্রাবণের বৃষ্টি উঠে যেতে বসেছে, সবাই রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বর-বউ হবার জন্যে ছটফট করছে। আর এখানে আমার হবু ভাইঝিজামাই রিং করছে হিন্দু প্রিস্ট-এর সঙ্গে লম্বা ডিসকাশনের জন্যে। বলছে রিহার্শালে আপত্তি নেই তার। দেশ থেকে ম্যারেজের কোনো ভিডিও টেপ নিয়ে এসেছি কিনা ফর ট্রেনিং পারপাস। আমি কোন্ লজ্জায় বলি, ওরে বাপধন, দেশের বিয়ে দেখলে তোমার এই ধরনের বিয়েতে অরুচি ধরে যাবে। বাঙালী বিয়েবাড়িতে সবাই খেতে এবং খাওয়াতে ব্যস্ত। ব্যাচ বসছে আর উঠছে। পুরোহিত কী মন্ত্র পড়লেন তা সিকি আনি দুয়ানি সাইজের বাচ্চা ছাড়া কেউ শোনে না।"

"মিছরিদা, এদেশে যা-যা দেখছেন, দু'একটা পয়েন্ট এই অধমকে দিন। আমি একেবারে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছি—এই ক'দিনে কী এমন দেখবো যা দেশের পাঠকের পাতে দেওয়ার মতন হবে?"

আমার কাতর আবেদন কর্ণগোচর হওয়া মাত্র ধ্যানের ভঙ্গিতে চোখ বুজলেন মিছরিদা। বললেন, "তুই আমাকে 'কোট' কর—আমি বলছি, ওয়ার্লডে আমেরিকার মতন গ্রেট দেশ নেই। এখানে আসবার পথে আমি ফরাসীদেশ এবং ইংলণ্ডে এক-একদিন কাটিয়ে এসেছি।"

আমি জানতে চাইলাম, কেন এমন কথা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মিছরিদা বলছেন? আমেরিকার বিপুল বৈভব আছে বলে? বিরাট বিরাট কমপিউটার আছে বলে? হুট করে বোতাম টিপে মহাশূন্যে যানবাহন পাঠাতে পারে বলে? মিছরিদা আমার কথা শুনছেন, কিন্তু ইমপ্রেস্‌ড হচ্ছেন না। "এসব তো অজানা নয়, দেশে থাকতে থাকতেই পড়েছি।"

"তা হলে, মিছরিদা, আপনি কি ক্ষেপণাস্ত্র, আণবিক অস্ত্র, তারকা যুদ্ধ ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলছেন?"

"ছোটখাট সাইজে ওসব যন্ত্র আমরা ইণ্ডিয়াতেও তৈরি করতে শিখেছি রে! যদিও দু-একখানা মিসফায়ার হয়ে যায়।" মিছরিদা এখনও আমার কথায় সন্তুষ্ট হচ্ছেন না।

"এখানকার মানুষরা আপনাকে তাহলে মজিয়ে দিয়েছে। ভাবী ভাইঝি-জামাইয়ের দেশকে আপনার 'সারা জাঁহা সে আচ্ছা' মনে হচ্ছে স্রেফ বাৎসল্য

রস থেকে!"

চোখ বুজেই মাথা নাড়লেন মিছরিদা। "আমরা হাওড়া-কাশুন্দের লোকরা হানড্রেড পারসেন্ট স্বদেশী। আমরা জানি, চান্স পেলেই এখানকার সরকার আমাদের সরকারের পিছনে কাঠি দেয়, আমাদের শত্রুদের টাকাপয়সা জোগায়—তবু এবার আমি নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম গ্রেটেস্ট কানট্রি বলতে 'ইউ-এস-এ'কেই বোঝায়।"

"তাহলে বলছি, আপনি এদেশের হাসপাতালগুলো দেখেছেন। ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিক দেখে আমার নিজের চোখই তো ছানাবড়া। ওখানে বাঙালী মহিলা শুভা সেন পাকড়াশীকে দেখে আমার বুক তো গর্বে ফুলে উঠলো।"

মিছরিদা হারবার পাত্র নন। "আমেরিকান হাসপাতালে চোখ দু'বার ছানাবড়া হয়—একবার চিকিৎসার দক্ষতা দেখে, আর একবার চিকিৎসার বিল পেয়ে। হার্ট উইক থাকলে তখনই হাসপাতালে রি-অ্যাডমিশন!"

"তাহলে কিসের গ্রেটনেসের কথা বলছেন মিছরিদা!"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন মিছরিদা। "আমি ঠিক করে এসেছিলাম, পরের মুখে ঝাল খাবো না। নিজে চেক করবো সব কিছু—স্বামী বিবেকানন্দ তো সাবধান করে দিয়েছিলেন, খাজা আহাম্মকের চোখে বিদেশকে দেখবে না। করছিও তাই—লাস্ট দশ বারো দিন তিনটে স্টেটে আমি শত-শত এক্সপেরিমেন্ট করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।"

এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন মিছরিদা। "আমাদের অফিসের পিলকিংটন সায়েব আমাকে চুপি-চুপি বলেছিলেন—এ জেন্টলম্যান ইজ নোন বাই হিজ শুজ্—জুতোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কে কেমন ভদ্রলোক। তেমনি এ নেশন ইজ নোন বাই....." আবার থামলেন মিছরিদা। "আমি অফিসের স্যানিটারি ডিমার্টমেন্টে কাজ করি তাই সহজে জাতটার মহত্ত্ব বুঝতে পারলাম। আমি বিভিন্ন জায়গায় চান্স পেলেই অন্তত শ তিনেক টয়লেট ফ্লাশ টানলাম। অবাক কাণ্ড, ইণ্ডিয়ার কেউ বিশ্বাস করবে না, প্রতিটি ফ্লাশ কাজ করলো। পৃথিবীতে এমন দেশ থাকতে পারে, আমার কল্পনাতেও ছিল না। ইণ্ডিয়াতে কোনো পাবলিক বাথরুমে ফ্লাশ কাজ করতে দেখেছিস তুই? পিলকিংটন সায়েব ভেবেচিন্তেই বলেছিলেন, এ নেশন ইজ নোন বাই ইটস্ টয়লেটস্—বেঁচে থাক ভাই এই দেশ! লাখ-লাখ বাইরের লোক ঢুকিয়েছে, তবু ফ্লাশ চালু রাখার অসাধ্য সাধন করেছে।"

গাঁইয়ার মতন কোকের পরে আমরা কফির অর্ডার দিয়েছি। মিছরিদাকে বললাম, "শুধু ভাল দেখবেন না, একটু-আধটু দুর্বলতাও এদেশের দেখুন। এই দৃষ্টি না-থাকলে এখানকার কোনো খবরের কাগজের অফিসে আপনি চাকরি

পাবেন না!"

"যারা কুটুম হতে চলেছে তাদের দোষ ধরতে নেই। কিন্তু তুই যখন নাছোড়বান্দা তখন একটা স্টেটমেন্ট নে ঃ জন্মাবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ জায়গা এই ইউ-এস-এ, আর মরবার পক্ষে ইণ্ডিয়ার এখনও তুলনা নেই।"

"সব দেশের লোকই তো বলে সার্থক জনম মাগো, জন্মেছি এই দেশে।"

"এক দেশে জন্মে আর এক দেশে পেটের তাগিদে যাওয়ার মতন দুঃখ কিছুতে নেই। আমেরিকায় ভূমিষ্ঠ হওয়া মানেই গ্রীন কার্ড নিয়ে জন্মগ্রহণ করা—সে তোমার বাবা-মা যে-দেশের নাগরিকই হোক না। শুনলাম, তাই এদেশে পোস্টিং পেয়ে, অনেক দেশের ডিপ্লোম্যাটদের মধ্যে সন্তানের জন্ম দেবার জন্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। এদেশে একটা বেবি হওয়া মানেই—অন্তত ১৮ বছর পরেও একজন আমেরিকানের গার্জেন হয়ে বাবা-মায়ের এখানে ফিরে আসার সুযোগ রইলো।"

"ওঃ, মিছরিদা, আপনি বাঘা-বাঘা গোপন খবর জোগাড় করেছেন! পৃথিবীর যত কার্ড আছে তার মধ্যে এখন মহামূল্যবান এই গ্রীন কার্ড—সারা বিশ্বে এই সবুজপত্র পাবার জন্যে হাহাকার।"

মিছরিদা হাসলেন, "আমি এসবের মাহাত্ম্য বুঝতাম না। এখানে এসে ক'দিন পাড়া বেরিয়ে আমার চোখ খুলে গেলো। পাকিস্তানী বল, বাংলাদেশী বল, শ্রীলঙ্কাবাসী বল, ইণ্ডিয়ান বল গ্রীন কার্ডে কারও অরুচি নেই। এই কার্ড পাবার জন্যে কোনো কষ্টই কষ্ট নয়।"

এরপর মিছরিদা আরও দু'একটা গল্প বললেন। "সেদিন হঠাৎ পাইকপাড়ার আকবরের সঙ্গে এই নিউ ইয়র্কেই দেখা হয়ে গেলো। খুব কিন্তু-কিন্তু করতে লাগলো। তবু ছাড়লুম না, গেলুম ওর বাড়িতে। খুব ছোট্ট বাড়ি। বললুম, তুমি না জার্মানিতে ছিলে?"

পাইকপাড়ার আকবর প্রথমে কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না। তারপর মিছরিদা যা জানতে পারলেন, জার্মানিতে থাকা আকবরের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। তখন আরও কিছু পাকিস্তানী এবং ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে সে বাহামাতে হাজির হলো। মাথাপিছু কয়েক হাজার ডলারের বিনিময়ে রাতের নৌকো বাহামা থেকে ফ্লোরিডায় নামিয়ে দিয়ে যায়। ভারতীয় অথবা বাংলাদেশী বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীর জীবন এইভাবে শুরু হয়। তারপর জনারণ্যে মিশে যাবার জন্যে অনেকে নিউ ইয়র্কের মতন বড় বড় শহরে হাজির হয়।

আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অবশ্যই উকিলের শরণাপন্ন হতে হয়। রাতকে দিন করতে আমেরিকান উকিল অন্য কোনো দেশের উকিলের থেকে কম যায় না। মক্কেলের টাকা থাকলে তারা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের মামলা

শুর করে দেয়। এখানে একটা সুবিধে, মামলা করলে তার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত কোনো আশ্রয়প্রার্থীকে বিতাড়িত করা যায় না। উকিলবাবু চেষ্টা করেন রাজনৈতিক আশ্রয়ের মামলা যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আকবর ওসব হাঙ্গামায় যায়নি। ওর ঘরে গিয়ে মিছরিদা একটু অবাক হলেন। রাস্তায় আকবর বললো, সে ব্যাচেলার। অথচ ঘরের সর্বত্র মেয়েদের ব্রা ও প্যান্টি ঝুলছে একটু অশোভনভাবেই।

ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না মিছরিদার। নিউ ইয়র্কের ছেলে হবার আগে আকবর তো পাইকপাড়ার ছেলে ছিল, এরকম নির্লজ্জ তো হবার কথা নয়!

তারপর ব্যাপারটা চোখের জল ফেলতে-ফেলতেই স্বীকার করলো আকবর ছোকরা। ইমিগ্রেশন ম্যারেজ ছাড়া উপায় ছিল না। হাজার তিন-চার ডলার দিলেই এদেশী মেয়ে পাওয়া যায়। এরা নাম-কা-ওয়াস্তে বহিরাগতকে বিয়ে করে—আমেরিকান ললনার বিদেশী স্বামীকে কে দেশছাড়া করে? পৃথিবীর সর্বত্র ঘরজামাই-এর স্পেশাল স্ট্যাটাস! এই কাগুজে বউ প্রয়োজনে ইমিগ্রেশন আদালতে তোমার পক্ষে সাক্ষী দিয়ে আসবে।

আকবরের বউ কি কাজকর্ম করে জানতে চেয়ে খুব লজ্জা পেয়েছিলেন মিছরিদা—'কাজ' করে, কলগার্লের।

মুশকিল হলো ইমিগ্রেশন ইনেসপেক্টরদের নিয়ে। তারা মাঝেমাঝে হামলা করে, সরেজমিনে তদন্ত করতে আসে, কেমন ঘর-সংসার হচ্ছে। সেই জন্যে বাড়িতে মেয়েদের জামাকাপড়, অর্ন্তবাস বেশ কিছু পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন কিছু চিঠিপত্তর—অন্তত খামের ওপরটুকু, যাতে বউ-এর নাম এবং ঘরের ঠিকানা লেখা আছে।

মিছরিদা বললেন, "বেচারার হয়েছে উভ-সঙ্কট। থাকার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হলে কাগুজে বউকে তালাক দিয়ে সে নিজের ঘরসংসার পাতবে। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। কাগুজে বউ তাল বুঝে বেঁকে বসেছে। সে প্রতি মাসে বাড়তি তিনশ ডলার আদায় করছে। না দিলে এখুনি পুলিশকে সব বলে দেশছাড়া করে দেবে।"

বেচারা আকবর! সে দুটো কাজ করে—দিনের বেলায় রেস্তোরাঁয় এঁটোকাটা পরিষ্কার, তারপর কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়ে গ্যাস স্টেশনে গাড়িতে তেল ভরার রাত-ডিউটি।

মিছরিদা জানালেন, "আকবর ছোঁড়াটাকে বললাম, ফিরে চল পাইকপাড়ায়। কাগুজে বউয়ের খপ্পরে পড়ে এমনভাবে জীবনটা নয়ছয় করার কোনো মানে হয়? কিন্তু গ্রীন কার্ডের নেশা ওকে চেপে ধরেছে। একদিন ওর আইনের সমস্যা

মিটবে—তখন অন্য অনেকের মতন সে-ও গাড়ি চাপবে, বাড়ি কিনবে এবং কপালে থাকলে আসলি মেমসায়েব সাদি করবে, তখন সুখের শেষ থাকবে না।"

মিছরিদা এরপর বললেন, 'দুদিন আমি এক ডিপ্লোম্যাটিক অফিসারের বাড়িতে অতিথি ছিলাম। ওঁদের রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা। সেখানে এক ড্রাইভার ছিল—নাম চি চো। ভগবান জানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোন্ দেশ থেকে এসেছে—বোধহয় ভিয়েতনাম।"

এই ডিপ্লোম্যাট কিছুদিন আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এখানেই, তবে নিজের দেশের ছেলের সঙ্গে। গৃহিণী বললেন, বর বউকে চি চো-ই ড্রাইভ করেছিল বিয়ের পর। কিন্তু লোকটার বোধহয় মাথায় ছিট আছে। মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বলে খুব খুশি। কিন্তু হঠাৎ বলে বসলো, বেবি চাই। খুব তাড়াতাড়ি—এবং এখানেই। ভেরি গুড প্লেস টু হ্যাভ বেবি।

"মেয়ে জামাই শাশুড়ি সবাই চি চো'র কথা শুনে লজ্জায় অস্থির। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না।"

মিছরিদার সংযোজন : "জানিস তারপর একদিন গাড়িতে এই উচ্চশিক্ষিতা গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা করছি। আমারও তো ফিলজফি অনার্স ছিল। গৃহকর্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে যাবার পরে চি চো হঠাৎ আমার সঙ্গে ওয়েস্টার্ন ফিলজফি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলো। আমি তো অবাক।"

মিছরিদা তারপর শোনলেন, "চি চো নিজের দেশে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ করেছিল। ওইসব ডিগ্রি নিয়ে কোন্ দুঃখে যে বাছাধন এই দূর দেশে ড্রাইভারি করতে এলো!"

তারপরের খবরটা দুঃখের। চি চো বিয়ে করেছিল। একটি মূক ও বধির পুত্রের জন্ম হওয়ার পরে স্বামী-স্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়লো। গরিব দেশে সুস্থ মানুষেরই কোনো মূল্য নেই—বিকলাঙ্গ মানুষকে কে দেখবে? খোঁজখবর নিয়ে চি চো জেনেছে, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও স্বাধীন জীবনযাপনের পক্ষে আমেরিকাই হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ। তাই সে বহু কষ্টে নানা পথ ঘুরে এখানে পালিয়ে এসেছে। একদিন নিশ্চয় সে এখানে সসম্মানে বসবাসের সুযোগ পাবে, তখন তার প্রথম কাজ হবে ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব ছেলেটিকে এবং তার মাকে এদেশে নিয়ে আসা। ছেলেটি এখানে পড়বে, তারপর কমপিউটরের কাজে ঢুকে যাবে—চি চো মরে যাবার পরেও তার কোনো অসুবিধা হবে না।

ইতিমধ্যে অবশ্য বেশ কিছু মুশকিল রয়েছে। বে-আইনীভাবে যারা এদেশে প্রবেশ করেছে তাদের পক্ষে এ-দেশে থেকে যাবার সব চেয়ে সহজ উপায় কোনো বিদেশী কুটনৈতিক অফিসে কাজ নেওয়া। এদেশের এমপ্লয়মেন্ট

সংক্রান্ত আইন-কানুন ওঁরা মানতে বাধ্য নন। কেউ এমব্যাসিতে কাজ করছে এই সার্টিফিকেট দেখালে পুলিশ তাকে স্পর্শ করতে সাহস পায় না।

মিছরিদা বললেন, "আমার চোখ খুলে গেলো, ব্রাদার। বিদেশ-বিভুঁইতে এসে অভাগা সন্তানের প্রতি এমন অসাধারণ ভালোবাসা দেখবো তা কল্পনা করিনি। আমার বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না, কেন চি চো বিয়ের দিনেই কনেকে বলেছিল, হ্যাভ বেবি কুইকলি। চি চোর ছেলেটা যদি এখানে ভূমিষ্ঠ হতো তাহলে বেচারার কোনো কষ্টই থাকতো না।"

আমি এবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। হাতে এখনও কিছু সময় আছে। মিছরিদা বিদেশের মাটিতে দেশের লোককে পেয়ে তাকে ছাড়তে চাইছেন না।

আমি বললাম, "মিছরিদা, আপনি যে মূল্যবান স্টেটমেন্ট দিয়েছেন একটু আগে, তাতে বলেছিলেন, জন্মাবার শ্রেষ্ঠ জায়গা এই মার্কিন মুলুক—কিন্তু মরবার পক্ষে সেরা হলো ইণ্ডিয়া। প্রথম পার্ট তো ব্যাখ্যা হলো, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা তো পরিষ্কার হচ্ছে না।"

মিছরিদা বললেন, "ওই সাবজেক্টটা বেশ জটিল। ব্যাপারটা বুঝতে হলে তোকে আমার সঙ্গে এখনই একটু বেরুতে হবে।"

ম্যানহ্যাটানের চায়ের দোকানে (থুড়ি ! কফি বার-এ) বসে বাজে শিবপুরের ব্রাহ্মণ সন্তান মিছরিদার মুখের দিকে আবার তাকালাম। বুকের মধ্যে একটু ধুকপুকুনি রয়েছে—খোদ মার্কিন মুলুকে ভাগ্যলক্ষ্মীর এই ভদ্রাসনে আমরা দুই হাওড়ীয় বঙ্গসন্তান যে রং-ফন্টের মতন বিরাজ করছি তা কি সায়েবদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে ?

প্রুফ-রিডিং-এর ভাষায় রং-ফন্ট-এর উল্লেখ করায় মিছরিদা জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। ঠোঁট উল্টে চিবুক শক্ত করে তিনি বললেন, "মেক নো মিসটেক—এরা যদি স্মলপাইকা হয়, তা হলে আমরা ইণ্ডিয়ানরা অবশ্যই পাইকা। এরা যদি লিকলিকে 'রোমান ফেস' হয় তা হলে আমরা বোল্ড।"

আমার নিবেদন, 'দুষ্টজনরা বলে, আমরা হলাম 'ইটালিকস'। অর্থাৎ কিনা সায়েবরা সোজাসুজি মানুষ—আমরা একটু বাঁকা !"

মিছরিদার মধ্যে এই মুহূর্তে গভীর আত্মপ্রত্যয়। "আমরা হলাম কিনা প্রাচীন সভ্যতার প্রতিনিধি—ওল্ড সিভিলাইজেশনে মানুষের মন অনেক জটিল ভাবনার ধারক হয় ! যারা 'কালকা যোগী' তারা সব কিছু বুঝে উঠতে পারে না—ট্যাঁকের জোর তাদের যতই থাকুক ! সুতরাং ওরা তো আমাদের বাঁকা দেখবেই। কিন্তু দেখবি সমন্বয় শক্তি যদি কারও থাকে সে আমাদের। আমরা অতি সহজে ডুডুও খাই টামাকুও খাই—সায়েবরা পারে না।"

এবার আহ্বান জানালেন মিছরিদা, "চল্ একটু হাঁটা যাক—জুতোর হিল খইয়ে একটু চরে না বেড়ালে দেশ দেখা যায় না।"

আমরা দু'জনেই শিবরাম চক্রবর্তীর অমরসৃষ্টি হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনের মতন বিরাট নিউ ইয়র্ক শহরের লীলাখেলা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। "বাড়িগুলোর ডগা দেখার চেষ্টা করিস না—বিদেশ বিভুঁইয়ে ঘাড়ে সটকা লেগে গেলে কে দেখবে ?" মিছরিদা সাবধান করে দিয়ে বললেন, "গগনচুম্বী প্রাসাদ নয়, স্রেফ আকাশের পেটে চাক্কু মেরে তার মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বাড়িগুলো আরও ওপরে উঠে গিয়েছে।"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেন্ট্রাল পার্কে হাজির হয়েছি। মিছরিদা বললেন, "মোক্ষম জায়গা এই সেন্ট্রাল পার্ক—এখানে একটু সাবধানে ঘুরতে-ফিরতে বলেছে আমার মেমসায়েব ভাইবউ।"

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম—সব পাশাপাশি বিরাজ করছে এই পার্কে। কেউ গাঁজা খেয়ে গুম হয়ে বসে আছে—কেউ মাতাল হয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে মাতামাতি করছে—আবার কেউ আপন মনে প্রভু যীশুর গুণগান গাইছে। মিছরিদা বললেন, "এইখানে কেত্তন গেয়েই তো আমাদের হুগলি শাহাগঞ্জের ভক্তিবেদান্ত (অভয়চরণ দে) বৃদ্ধবয়সেও যে বিশ্ববিজয় করা যায় তা দেখিয়ে দিলেন। বাঙালীদের সব আছে, শুধু থিংক বিগ-এর উদ্দীপনা নেই। ছাইপাঁশ ন্যাকামি এবং অবিশ্বাসের গপ্পো না-লিখে তোরা বাঙালীকে একটু সাধনা ঔষধালয়ের সঞ্জীবনী সালসা খাওয়া। বল, তোমরা বাঘের বাচ্চা—কেন ভেড়া সেজে ব্যা-ব্যা করছো ? তোমরা কি কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, সুভাষচন্দ্র বসু, ভক্তিবেদান্ত, কালীপ্রসাদ চন্দ'র নাম শোনোনি ?"

"লাস্ট লোকটি কে দাদা ?"

"তোরা লেখক হয়েছিস কিন্তু লেখাপড়া করিস না ! কলিকাতা নিবাসী বাবু রসিকলাল চন্দ মহাশয়ের পুত্র বাবু কালীপ্রসাদ—ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে যিনি অভেদানন্দ হলেন। এই নিউ ইয়র্কে হাজির হয়েছিলেন ১৮৯৭ সালে—বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাধনায় আমেরিকানদের তিনি তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।"

মিছরিদার সাজসজ্জা এই সেন্ট্রাল পার্কের পরিবেশের সঙ্গে বেশ মিশে গিয়েছে। চৌকো চৌকো ডিজাইনের ব্রাউন টুইডের কোট পরেছেন, সেই সঙ্গে ম্যাচিং ট্রাউজার। নিজেই বললেন, "দেশে আমার ... মূর্তির সঙ্গে মিলছে না তো ? আমি এখন সমন্বয়ে বিশ্বাস করি। এসেছিলা... ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বেশে ধুতি পাঞ্জাবি পরে, সঙ্গে নামাবলিও এনেছি—কিন্তু মেমসায়েব ভাইবউ

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে নিয়ে গিয়ে এই সায়েবী সাজ কিনে দিলো। কিন্তু যেটা তোকে বলতে চাইছিলাম, পুরনো সিভিলাইজেশনের লোক বলে আমরা সহজেই সমন্বয় করতে পারি। কোট-প্যান্ট পরে সায়েব হয়েছি বটে, কিন্তু গলায় পৈতা ঠিক ঝুলছে। আজ সকালে তো মজার কাণ্ড। এক অফিসের টয়লেটে গিয়েছি, ওখানে একটু পরে আমাকে নিয়ে টানাটানি—ইন্টারভিউ দিতে হলো। ওদের কিউরিয়সিটির কারণটা বুঝতে পারছিস তো ? ইউরিন্যাল ব্যবহার করার আগে আমি কানে পৈতেটা জড়িয়ে নিয়েছিলাম। ওরা এই ধরনের পার্শোনাল ডিসিপ্লিন কখনও দেখেনি। বললুম, ব্রাহ্ মিন হওয়া সহজ নয়, অনেক 'হ্যাপা' সামলাতে হয়। তবে সে পুরোহিতের মর্যাদা পায়।"

"মিছরিদা, আপনি সত্যিই ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্টের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠছেন !"

খুব খুশি হলেন মিছরিদা। "শুধু আমি কেন, আমাদের পুরো ফ্যামিলিটাকেই তো ইষ্ট-ওয়েষ্ট জংশন বলতে পারিস। আমার ছোট ভাইটাকে দেখ। গোঁড়া ভটচায্যি বামুন, সকালে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতো। মায়ের কাছে পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বিদেশে বিধর্মীয় কিছু করবে না। সেই বেচারা এই বিদেশে ঈশ্বরের লীলাখেলায় কমবয়সী কিন্তু বিদুষী মেমসায়েবের নজরে পড়লো। নিজের মনেও যখন দুর্বলতা আসছে বুঝলো আমার ভাই, তখন ভীষণ অবস্থা। দিনের পর দিন মেমসায়েব বান্ধবীর সঙ্গে সে ঘুরছে, প্রবল আকর্ষণ বোধ করছে, কিন্তু দেহ স্পর্শ করার প্রশ্নই ওঠে না। মেমসায়েবও এমন পুরুষমানুষ কখনও দেখেনি—ডেটিং-এ যায়, কিন্তু দূরত্ব কমায় না।"

মিছরিদা বললেন, "তুই এখন গপ্পোটপ্পো লিখিস, প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিস, ব্যাপারটা জেনে রাখ—পরে কোথাও লাগাতে পারবি। প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাশার দ্বন্দ্ব হলে মানুষ কীভাবে জ্বলে-পুড়ে মরে তার একটা নমুনা পাবি। আমার ভাইয়া তো টানা-পোড়েনে পড়ে তার এক বাউণ্ডুলে বন্ধুর কাছে নিজের সমস্যার কথা খুলে বললো। সে বন্ধু পরামর্শ দিলো, 'যস্মিন দেশে যদাচার।' এদেশে বিয়ে-থা করতে হলে প্রেম-টেম করতে হয়। প্রেম করতে হলে এই সমাজে একটু-আধটু দেহ স্পর্শ প্রয়োজন। তুমি ব্যাচেলার লোক, তোমার বান্ধবীও অপরের বিবাহিতা নয়—সুতরাং কোথাও কোনো অন্যায় নেই। প্রজাপতির নাম করে প্রাণের ইচ্ছাকে একটু প্রশ্রয় দাও।"

গল্পটা বেশ জমে উঠেছে ! মিছরিদা বললেন, "আমার ভাই তখন বন্ধুর কাছে আসল সমস্যাটার দিকে আলোকপাত করলো। এদেশের প্রত্যেক মেমসায়েব বীফ খায়। গোখাদিকার দেহস্পর্শ করা মানেই তো গোমাংস ভক্ষণ করা। নিষ্ঠাবান ভট্চায্যি ব্রাহ্মণের সন্তানের পক্ষে এই অধঃপতন কল্পনা করাও কষ্ট। আমার ছোটভাই এতোখানি নিষ্ঠাবান যে সে-বেচারা মেমসায়েবের সঙ্গে

দেখা করাই ছেড়ে দিল। কারণ ডেটিং-এ বেরুলে ইন্দ্রিয়গুলি যদি স্পর্শসুখের জন্যে কাতর হয়ে ওঠে।"

"আহা! তাহলে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হলো না।" এর আগে পটলদার মেমসায়েব বউয়ের ব্যাপারে শুনেছিলাম, স্রেফ সার্ভিস প্রিভির স্যানিটারি কারণে এডিথ মেমসায়েব শাশুড়ির ঘর ছেড়ে চলে এলেন, ইষ্ট-ওয়েষ্টের সফল মিলন হলো না। এবার জানছি, নিষিদ্ধ মাংসভোজীর শরীরও নিষ্ঠাবানের পক্ষে নিষিদ্ধ—স্পর্শ থেকেই সবরকম সংক্রমণের শুরু! ভাল একটা গল্প হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও এদেশের লোকরা বলবে, ইন্ডিয়ান হিন্দু যে কতটা ধর্মান্ধ এবং আচার বিচারের অনুশাসনে কীভাবে বন্দী তার প্রমাণ এই তরুণ-তরুণীর প্রণয়-ব্যর্থতা।"

"মেমসায়েব মেয়েটি কিন্তু আমার ছোটভাইকে দেখে মুগ্ধ। সে বেচারা তো ততক্ষণে হৃদয় দিয়ে ফেলেছে। ছোটভাইও যে মুগ্ধ তা সে বুঝতে পেরেছিল।"

আমি বললাম, "এটা তো মিছরিদা, ট্রাজেডির একটা বিশেষ রূপ। যদি আমাকে খেলিয়ে গল্পটা লিখতে হয়, তা হলে অনেক ডিটেল নোট করতে হবে। কিন্তু মেন ব্যাপারে এর কোনো গুরুত্ব নেই—কারণ হিন্দুমতে বলুন, খ্রীষ্টীয় মতে বলুন, স্পর্শহীন বৈবাহিক মিলন তো সম্ভব নয়।"

মিছরিদা অধৈর্য হয়ে উঠে আমাকে বকুনি লাগালেন। "আগে ধৈর্য ধরে আমার কথাটা শোন্। বিয়ে হয়েছিল এবং সেই বিয়ের প্রথম কন্যাসন্তানের বিবাহে পৌরোহিত্য করবার জন্যে আমি শিবপুর থেকে এখানে এসেছি, সঙ্গে রয়েছে হাওড়া সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির ফুল। তোদের সন্দেহপ্রবণ মন। তোরা ভাবছিস গোখাদক বাপমায়ের কন্যাকে হিন্দুমতে সম্প্রদানের জন্যে আমি এখানে এসেছি। মোটেই না।"

মিছরিদা এরপর রহস্য উদঘাটন করলেন। গোমাংসে পরিপুষ্ট রমণীশরীর স্পর্শ অবশ্যই গোমাংস ভক্ষণের সমপর্যায়, এই কথা ভেবে ছোটভাই তো দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলো। বেচারি মেমসায়েব বুঝে উঠতে পারছে না হঠাৎ কী হলো! ভট্‌কারিয়া কি শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো স্বর্ণকেশিনীর সংস্পর্শে এলো? খুব মনে দুঃখ তার। সেই সময় অন্য বন্ধুর কাছে আসল ব্যাপারটা জেনে সে একদিন ভট্‌কারিয়া অর্থাৎ ভট্টাচার্যির অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলো। কমন বন্ধুও সেই সময় উপস্থিত। বন্ধু বললো, সমন্বয়ই হচ্ছে ভারতবর্ষের শক্তি—পরস্পরবিরোধী মতকে একই ধারায় প্রবাহিত করতে ইন্ডিয়ানরা দুনিয়ার সেরা। মেমসায়েব বললো, "বীফ এমন কিছু প্রিয় খাদ্য নয়, ইচ্ছে করলেই ছেড়ে দিতে পারি।"

কিন্তু যে-শরীর এতোদিন গোমাংসে পরিপুষ্ট হয়েছে? বন্ধু বললো, "খুব

সহজ ব্যাপার। দেশ থেকে আসবার সময় তুমি তো বোতলে করে গঙ্গাজল নিয়ে এসেছো। ওর সঙ্গে মেশানো যাক হাডসন নদীর জল। আর্যরা এই ভূখণ্ডে এলে গঙ্গা গোদাবরী যমুনার সঙ্গে হাডসনের জলও হয়ে উঠতো পবিত্র।" সেই জল ছড়িয়ে অস্পৃশ্য মেমসায়েবকে 'স্পৃশ্য' করা হলো এবং তার কয়েক মাস পরেই শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেলো।

"কী হলো ? এখনও গোমড়া মুখ করে আছিস কেন ?" কোশ্চেন করলেন মিছরিদা।

"গল্পটা যদি লিখি এবং কোনোক্রমে ইংরিজিতে অনুবাদ হয়ে সায়েবদের হাতে পড়ে তাহলে খুব খারাপ ফল হবে, মিছরিদা। একটি মেয়ের দুর্বার প্রেমের সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা তাকে বীফ খাওয়ার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করলো !"

মিছরিদা হা-হা করে হাসলেন। "আমারও মাঝে-মাঝে তাই মনে হতো। অনুরাগে রক্তিম কোনো রমণীকে তার বিশেষ সাধ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত করার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, বরং নিষ্ঠুরতা আছে। কিন্তু আমার ভাইবউ এবারে আমাকে কী বলল জানিস ? 'বিশ বছর আগে আমি যা ত্যাগ করেছিলাম এখন সমস্ত আমেরিকাই তা ত্যাগ করতে চলেছে।' ভট্‌চায্যি বাউনের কথা যারা কানেও তুলতো না ডাক্তারের ওয়ার্নিং-এ তারাই গোমাংস ত্যাগ করছে—বীফের বিক্রি অর্ধেক হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এখন মাংসখেকো সায়েবদের নজর পড়েছে মাছ আর শাকসব্জির ওপর। এই রেটে চললে বাঙালী আর আমেরিকানের আহারের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। আমার ভাইঝিটা ফোড়ন কাটলো, 'সাধে কী আর গীতায় লিখেছে হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে, দ্য ওয়ার্লড থিংকস্ টুমরো' !"

"গীতা ! ওটা তো মহামতি গোখলের উক্তি।"

"আমি কি আর তা জানি না ভাবছিস ? কিন্তু 'দ্য গীতা' থেকে যখন ও নিজেই কোটেশন দিচ্ছে তখন দিক না—লোকে যদি একটু বেশি বিশ্বাস করে তো করুক। বাঙালীদের সম্বন্ধে এক-আধটা ভাল কথা বলার চান্স পেলে মিস্টার অর্জুনের ড্রাইভার কিষণজী নিশ্চয় আপত্তি করতেন না।"

মিছরিদা এবার সগর্বে মণিবন্ধের এইচ-এম-টি'র দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বললেন, "সময়ের মাপজোকটা আমি বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নই। আমার ছোটভাই বিশ বছরে যতই সাহেব হোক,

হাতের দিশি ঘড়ি ছাড়েনি। আমি তো নতুন জামাইয়ের জন্যেও দেশ থেকে এইচ-এম-টি নিয়ে এসেছি ভাইবউয়ের রিকোয়েস্টে। বিয়ের যাবতীয় জিনিসপত্তর ইন্ডিয়া থেকে আসুক এই ছিল ওদের ইচ্ছে।"

"পান নিয়ে আসেননি তো? একবার কাস্টমসের খপ্পরে পড়লে দেশছাড়া করে দেবে।"

"সুপুরি এনেছি বুক ফুলিয়ে। পান এখন প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে নিউ ইয়র্কে। পাত্রী নিজেই হবু জামাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে কিনে এনেছে—ওদের কেবল দুঃখ এই পান ইন্ডিয়ার নয়। ভিয়েতনাম না কোথা থেকে এসেছে।"

মিছরিদা বললেন, "এলাম শুভ কাজে—কিন্তু জড়িয়ে গেলাম দুর্দৈবে। যেদিন পৌঁছলাম তার পাঁচদিন পরেই ভাইবউয়ের দূর সম্পর্কের কাকা মারা গেলেন। কী কুক্ষণে বলেছিলাম, হাজার হোক কুটুম। দাহের সময় শ্মশানে যাওয়া লোকাচার।"

"দাহ কোথায়? এখানে তো মাটি দেওয়া!"

"ওই হলো। পঞ্চভূতে লীন হবার তিন-চারটে রুট আছে—হয় ভস্মীভূত হওয়া, না হয় ক্ষুধার্ত পশুপক্ষীকে দেহ উপহার দেওয়া, না হয় গোরস্থ হওয়া।"

"আপনি ইনভাইটেড হয়েছিলেন তো মিছরিদা?"

খুব বিরক্ত হলেন মিছরিদা, "ওরে হতভাগা, আমি ম্যারেজের কথা বলছি না। লোকের বিপদ-আপদে শ্মশানযাত্রী হবার জন্যে কেউ ছাপানো রঙীন কার্ড প্রত্যাশা করে না। খবর শুনলেই যেতে হয়।"

কিন্তু দাহ, অশৌচ ইত্যাদির ব্যাপারে ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছেন মিছরিদা। "এখন বুঝতে পারছি, এখানে কেউ মরতে চায় না কেন? যে করে হোক বেঁচে থাকাটা খুব প্রয়োজন, বুঝলি। মরার হাঙ্গামাটা বড্ড বেশি।"

প্রথমে মিছরিদাই বলেছিলেন, "দুঃসংবাদ যখন এসেছে, তখন তালুইমশাইয়ের বাড়িতে কাকিমার সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।"

প্রথম ধাক্কা ওখানেই। মিছরিদা শুনলেন, এখানে কেউ নিজের বাড়িতে মরে না। মৃত্যু হয় রাস্তায় পথ-দুর্ঘটনায় অথবা হাসপাতালে। মরবার পরেও ডাক্তার-বদ্যির হাত থেকে মুক্তি নেই—কেন মরণ হয়েছে তার একটা ফাইনাল ডায়গনোসিস প্রয়োজন। মিছরিদার দুঃখ : "মরা অবস্থায় নিজের বাড়িতেও তুই ঢুকতে পাবি না। এখানে মড়াদের পৃথিবীটাই আলাদা।"

মরার খবর রটলেই সেলসম্যানদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। হাসপাতাল থেকে বডিকে ফিউনারাল হোম-এ নিয়ে যাবার জন্যে কোন্ কোম্পানীর গাড়ি ভাড়া করবেন স্যার?

"মরলি আর সঙ্গে-সঙ্গে জানাশোনা লোকের কাঁধে চড়ে কেওড়াতলায়

হাজির হলি, ওসব তড়িঘড়ি ব্যাপারে সায়েবরা নেই। মরেছো তো কী হয়েছে? সাজগোজ করো, কয়েকটা দিন এয়ারকন্ডিশন ঘরে থাকো। এই ফিউনারাল হোমগুলোকে মড়াদের হোটেল বলতে পারিস! টুপাইস থাকলে মড়া অবস্থাতেও ফাইভস্টার কমফর্ট পাবি।"

"আমি দেখলাম, ভাইবউ জেনিফার একটা টেলিফোন পেয়ে পুরনো ছবির অ্যালবাম খুঁজতে লাগলো। কাকার একটা বহুকাল আগেকার ছবি সেলসম্যানের হাতে দিয়ে দিলো।"

মিছরিদা পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় জেনিফারের সঙ্গে ফিউনারাল হোমে গিয়ে কাকুকে দেখে তাজ্জব। জেনিফারের সঙ্গে কাকুর শেষ ছবিটা মিছরিদা দেখেছেন—মুখখানা রোগে এবং বার্ধক্যের প্রকোপে শুকনো কিসমিসের মতন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কফিনে শোওয়া মূর্তি দেখে মিছরিদা তো অবাক। কাকু মরার আগে তাঁর যৌবন ফিরে পেয়েছেন। ফুটফুটে জামাইবাবুটি যেন সুখনিদ্রা যাচ্ছেন।

"আহা! এতো সুন্দর শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে মানুষটা চলে গেলো!" মিছরিদা দুঃখ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ভাইয়ের কাছে যা শুনলেন তাতে দমে গেলেন।

"যার যত পয়সা আছে মরার পরে সে তত ছেলে-ছোকরা হয়ে যেতে পারে!" ফিউনারাল হোমের স্পেশালিস্টরা মরাকে বাঁচাতে পারে না, কিন্তু বৃদ্ধকে যুবক করতে ওস্তাদ। শুধু হুকুম করুন, কোন্ বয়সে ফিরে যেতে চান। দিয়ে দিন সেই বয়সের একটা ছবি। তারপর কয়েকটা ঘন্টা ওদের মেকআপের জন্যে দিন। ছুঁচসুতো প্যাড ইত্যাদি দিয়ে আর্টিস্টরা অসাধ্যসাধন করে দেবে।

যত বয়স কমাতে চাইবেন তত খরচ বেশি।

মিছরিদা বললেন, "আমার চক্ষু ট্যারা! কাকাবাবুকে মেক-আপ দিতে লেগেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? একবার চাই দু'বার তো কেউ মরবে না! সুতরাং মাটি-চাপা পড়বার আগে মরণোত্তর সাধ-আহ্লাদগুলো তুমি মেটাবে না কেন?"

সাজগোজের নাম ক্লিন-আপ। কিন্তু ক্লিন-আপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে কফিনের ব্যাপারটা। "একখানা কফিন বাক্সের দাম কত হতে পারে শুনলে তোরা ভিরমি যাবি। সবচেয়ে কম ১৮০ ডলার—ওসব গরিবদের জন্যে। পছন্দসই কফিন রয়েছে ৯০,০০০ টাকা দামে। তাতে কত সুখের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া এই স্টেজেই জানাতে হবে, নাইট ভিউয়ের সময় তুমি শরীরের কতটা দেখতে চাও—সেই অনুযায়ী স্প্রিং-এর ব্যবস্থা থাকবে। এবং মেক-আপ আর্টিস্টরা শরীরের ততটুকু অংশকেই স্পেশাল সাজগোজ করাবে।"

নাইট ভিউতে কত লোক আসবে তা-ও আগাম জানাতে হবে, সেই

অনুযায়ী বড় বা ছোট হলঘরের ব্যবস্থা হবে। পয়সা ঢাললে কোনো অসুবিধে নেই—ফিউনারাল এখানে মস্ত এক ব্যবসা।

মিছরিদা বললেন, "আমেরিকানদের যত তড়িঘড়ি বেঁচে থাকার সময়, মরবার পরে এরা শান্ত। অনেক গয়ংগচ্ছ করে এরা কবরে যায়! আমরা বেঁচে থাকি গয়ংগচ্ছ ভাবে, কিন্তু মরলেই তড়িঘড়ি—বাসিমড়া শাস্ত্রবিরোধী।"

তবে একটা ব্যাপারে মোহিত হয়েছিলেন মিছরিদা। "ওরা বলে সার্ভিস। জানাশোনা লোক সব আসছে, গাইছে মৃতের গুণগাথা। কে বলে সায়েবরা স্বভাবচাপা—ভাব প্রকাশ করতে চায় না? সার্ভিসের বক্তৃতা শুনে আমার তো চোখে জল এসে গেলো। একজন এলেন স্থানীয় ক্লাব থেকে। বললেন, 'জন-এর মতন মানুষ লাখে একটা হয় না। সবসময় আমাদের ক্লাবের কথা ভাবতেন।' আর একজন এলেন স্কাউট থেকে—বললেন, তুলনাহীন মানুষ এই জন। মনুষ্যত্বের সঙ্গে দেবত্বের সংমিশ্রণ যারা দেখতে চায় তারা জন সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর করুক।"

একের পর এক বক্তা দশ-পনেরো মিনিট ধরে বলে চলেছেন আর চোখ দিয়ে জল ঝরেছে মিছরিদার। প্রয়াত মানুষটা একবার তাঁকে ক্রিসমাস কার্ড পাঠিয়েছিলেন, কেন তিনি ওঁর সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করেননি!

মিছরিদা চোখ মুছতে-মুছতে দেখলেন, পাথরপ্রতিমার মতন জনের বিধবা বসে আছেন কালো ড্রেস পরে। মাঝে-মাঝে বক্তৃতা শুনছেন আর চোখ মুছছেন, কিন্তু 'ওগো আমাকে কোথায় রেখে গেলে গো। আমার কী হবে গো? আমায় কে দেখবে গো?' বলে বাঙালী স্টাইলে মরাকান্না নেই।

মিছরিদা স্বীকার করলেন, "সার্ভিসে ইংরিজি বক্তৃতা শুনে সায়েবজাতটা সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। ইংরিজিতে কী গভীর ভালবাসার প্রকাশ, কী সুখস্মৃতির প্রাবল্য, কী কৃতজ্ঞতার ধারাবর্ষণ। ইংরিজি ভাষা যে বাংলা থেকেও ইমোশনাল এবং হৃদয়গ্রাহী হতে পারে তা বুঝলাম জনের পরিচিতজনদের বক্তৃতায়। দুর্জনের মুখে শুনেছিলাম, বড্ড ব্যস্ত জাত এরা, কারুর জন্যে কারুর সময় নেই, যে যার কাজ নিয়ে মশগুল। কিন্তু নিজের চোখে যা দেখলাম, নিজের কানে যা শুনলাম তাতে জানলাম, এতোদিন নির্জলা মিথ্যে বুঝেছিলাম।"

দু'এক জন পড়শীও বক্তৃতা করলেন। আরও বক্তৃতা হবে দু'তিন দিন ধরে। একজন বৃদ্ধা তো স্বগতোক্তি করলেন, হাউ লাকি ইজ জন। ওঁর গিন্নিরও কত ভাগ্য, নিজের কানে স্বামী সম্বন্ধে এইসব সুন্দর কথা দিনের পর দিন শোনার সৌভাগ্যবতী।

রাত হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক আত্মীয়বন্ধুরা বিদায় নিচ্ছেন। জেনিফার

হঠাৎ আসছি বলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর ফিরে এসে ক্ষমা চাইলো মিছরিদার কাছে দেরি হবার জন্যে।

কাকিমা আসলে জেনিফার-এর ওপর কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। মিছরিদা বলতে যাচ্ছিলেন, আমার এদেশ সম্বন্ধে অন্য ধারণা হলো, মানুষ মানুষকে কতখানি ভালবাসতে পারে তা বুঝলাম। সেই সময় জেনিফারের মুখে শুনলেন, "কাকিমা নিজে পারলেন না। আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন বক্তাদের পেমেন্টগুলো মিটিয়ে দিতে। ওরা খুব রিজনেব্‌ল—প্রতি পাঁচ মিনিট বক্তৃতার জন্যে মাত্র একশ ডলার চার্জ করলো। খুব অনেস্ট—ঠিক যত মিনিট বক্তৃতা করেছে তার জন্যে টাকা নিলো।"

মিছরিদা বললেন, "জীবনে আমি কখনও এমন শক খাইনি ! তোকে বলছি, এখানে মরার কোনো মানে হয় না।"

দু'দিন পরে পাদ্রির বক্তৃতাও শুনেছিলেন মিছরিদা ! অসাধারণ বক্তৃতা—অ্যাওয়েক সার্ভিস—অর্থাৎ কিনা জাগরী।

ফাদার বললেন, "অসাধারণ পুরুষ এই জন—যার সমগ্র জীবনটি যেন বহু পরিচ্ছেদে বিভক্ত একটি মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখছি শিকাগোতে জন জন্মগ্রহণ করছে। পিতৃ ও মাতৃ পরিচয় কী দেবো ? এমন বংশ গৌরব নিয়ে আমরা ক'জন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি ? মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখছি, শিশু জন হামাগুড়ি দিচ্ছে এবং বিরাট এই বিশ্ব থেকে মহামূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করছে।"

কৈশোর, বাল্য ও বিদ্যাশ্রমের অধ্যায় পেরিয়ে পুরোহিত এবার ব্যবসায়ী জীবনের সুকঠিন সাধনায় মগ্ন জনকে চিত্রিত করলেন। "ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখছি ব্যবসায়ে সফল জনকে। জন তার প্রথম মিলিয়ন ডলার এই সময়েই উপার্জন করে। কিন্তু এর পরের অধ্যায়ে আমরা দেখছি দশলক্ষপতি হয়েও জন আমাদেরই লোক—আওয়ার ম্যান। তার আচরণ, তার বিনয়, তার মিষ্টতা দেখে কে বলবে একটা নয়, চারটে ডাইংক্লিনিং দোকানের সে কর্ণধার ? কে বলবে জন ইতিমধ্যেই তিনটি ফ্ল্যাট কিনেছে ? আমি বলবো, শুধু জন ধন্য নয়, ধন্য তার সুযোগ্য বর্তমান সহধর্মিণীও, যাঁকে এই জীবনের ষষ্ঠপর্বে জন নিজের আপনজন হিসেবে পেয়েছিল। জন চিরদিন বেঁচে থাকবে আমাদের হৃদয়ে, জনকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারবো না। আপনারা জেনে খুশি হবেন, আগামীকাল আমাদের স্থানীয় প্রিয় রাজনৈতিক নেতাও জনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।"

মিছরিদা বললেন, "কোন্ কুক্ষণে আমি ফাদারের বক্তৃতার প্রশংসা করেছিলাম। প্রত্যুত্তরে শুনলাম, ইনি কৃতী প্রফেশনাল। পনেরো মিনিটের

বক্তৃতার জন্যে হাজার ডলার চার্জ করেছেন। আর যেহেতু জনের জীবন সম্বন্ধে আমরা ঘটনাগুলি সাজিয়ে দিইনি সেজন্য বাড়তি পাঁচশ ডলার ওঁর গবেষণা-পারিশ্রমিক। রাজনৈতিক নেতাও আসছেন, ওঁকে দু'হাজার ডলার দেওয়া হবে বলে। শোক দেখাবো অথচ পয়সা পাবো না তা এই কাজের দেশে কেমন করে হয়?"

মিছরিদা বললেন, "মৃত্যুসংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের দেশ এখনও তুলনাহীন। সেই ট্রাডিশন এই মার্কিন মুলুকের বাঙালীরা সমানভাবে চালু রেখেছে। বেঁচে থাকতে যতই জ্বালাক, কেউ চোখ বন্ধ করলে বাঙালী এখনও ওয়ার্লডের এক নম্বর। যে-বাঙালী পরনিন্দা না করে অন্নগ্রহণ করে না সেই বাঙালী তোমার মৃত্যুতে ঝরঝর করে চোখের জল ফেলবে বিনা পারিশ্রমিকে। যে-বাঙালী-সংবাদিক তোমাকে সারাজন্ম ধরে অপদার্থ বলে চিহ্নিত করেছে সে-ই লিখবে, তোমার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হলো তা কোনোদিন পূরণ হবে না। যে তোমাকে চিরদিন আড়ালে স্ত্রীর ভ্রাতা বলে গালি দিয়েছে সেই-ই হৃদয় থেকে বলবে তুমি ছিলে প্রাতঃস্মরণীয়।"

এরপর মিছরিদা বললেন, "চল তোকে একজন আশ্চর্য মানুষের কাছে নিয়ে যাই, বিপদ-আপদে সব মানুষকে কাছে টেনে নিতে, প্রবাসে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে যার তুলনা নেই। ছেলেটাকে দেখে আমি মজে গিয়েছি। আদর্শ শ্মশানবন্ধু বলতে পারিস—সস্তায় কী করে মরতে হয় সে ব্যাপারেও একজন আন্তর্জাতিক অথরিটিও বটে।

বাসে চড়িয়ে মিছরিদা আমাকে যার কাছে হাজির করলেন তাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই তো। মিছরিদা বললেন, "শরৎ চাটুজ্জ্যে বেঁচে থাকলে একে নিয়ে চমৎকার একটা ক্যারাকটার সৃষ্টি করতে পারতেন। এর নাম প্রবীর রায়।"

প্রবীর রায়! আবার দেখা হয়ে গেলো। বাঙালীর বিত্তবাসনা ও সাধনার প্রতীক প্রবীরবাবু এবারে মৃত্যু সম্বন্ধে কথা বললেন।

"জানাশোনা লোকের মৃত্যুতে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যে বাঙালীরাও কি পয়সা নিতে শুরু করেছে?"

আমার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন প্রবীর রায়। বললেন, "এখানকার বাঙালীদের বয়স বাড়ছে—মৃত্যু এখন তেমন দুর্লভ ঘটনা নয়। এক একটা মৃত্যু আসে, সমস্ত সমাজকে আচমকা নাড়া দিয়ে চলে যায়। ন্যায্যমূল্যে মরবার খরচ-খরচা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে রেখেছি—দুঃসময়ে মানুষের কাজে লেগে যায়।"

এখানকার ফিউনারাল খরচ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ দিলেন প্রবীরবাবু। একটু

হাত খুলে কাজ করতে গেলে লাখ তিন-চার টাকা কিছুই নয়।

ধরুন কবরের জমির দাম। প্রাইভেট কবরখানা চমৎকার বিজনেস—টাকা বিনিয়োগ করার পক্ষে অতীব প্রশস্ত। একটু ভাল জায়গা নব্বুই বছরের লিজে নিতে হলে আড়াই লাখ টাকা। ফুলের ঘায়েও মূর্ছা যেতে পারেন আপনি! হাজার তিনেক টাকার ফুল কিছুই নয়। যাঁরা শ্মশানযাত্রী তাঁরাও সবাই ফুল দেবেন। এফ-টি-ডি বলে ফুলওয়ালাদের ইউনিয়ন আছে—আমেরিকার যে-কোনো জায়গায় তারা কুড়ি মিনিটের মধ্যে আপনার নাম করে ফুল পাঠিয়ে দিতে পারে।

আর ডোম তো ক্যাডিলাক হাঁকিয়ে আসবে। কফিনের মাপ তাকে আগাম দিতে হবে—ড্রেজার যন্ত্র দিয়ে সে কিছুক্ষণের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে দিয়ে হুশ করে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে যাবে। চেহারা দেখে মনে হবে ফিল্মস্টার—আমাদের শ্মশান-ডোম দেখলে ভয়ে হার্টফেল করার অবস্থা হয়। এখানে সুদর্শন লোককে এই কাজের জন্যে নির্বাচন করা হয়, যাতে পারলৌকিক কাজের সময় পারিপার্শ্বিক স্নিগ্ধতা বজায় থাকে। গাঁটের পয়সা খরচা করে যমদূতের মতন ডোম আপনি ভাড়া করবেন কেন?

ফুল শুধু কবরের দিন দিলে চলবে না। কয়েকদিন নিকটজনরা প্রত্যহ ফুল দিয়ে যাবেন। তারপর কোম্পানিকে স্থায়ী অর্ডার—তারা নিয়মিত ফুল রেখে যাবে আপনার নির্দেশিত জায়গায় বছরের পর বছর। মৃত্যুদিনে স্পেশাল ফুলে সাজিয়ে দেবে স্মৃতিস্তম্ভ।

কিন্তু এসবের জন্যে প্রয়োজন অর্থ। দূরদর্শী লোকরা তাই বয়স থাকতে-থাকতে মরবার টাকা জোগাড় করতে আরম্ভ করেন। তিরিশ বছর বয়স থেকে প্রতিমাসে ইনসিওর কোম্পানিকে ষাট-সত্তর ডলার দিলে পরিণত বয়সে নিশ্চিন্তে মরার হিল্লে হয়ে গেলো। মরার পরে ছেলেমেয়ে যদি শুনলো আপনি শ্মশান-খরচার জন্যে আলাদা অর্থের ব্যবস্থা করে যাননি তাহলে হয়ে গেলো আপনার অবস্থা—মরেও আপনার শরীরের জ্বালা কমবে না। যে বাপ-মা ছেলের ঘাড়ে মরতে চায় তাদের দুর্দশা অনেক। ছেলে বা ছেলের বউ কেউ এ-ব্যাপারে খুশি হবে না।

আর টাকার ব্যবস্থা যদি থাকে তো সমস্ত ব্যাপারটা ছবির মতন হয়ে যাবে। সব খুঁটিনাটির তদারকি করার জন্যে লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কোম্পানিই এসে জিজ্ঞেস করবে—খবরের কাগজে শোক-সংবাদ কিভাবে প্রচার হবে? ছবি কোন্ সাইজে ছাপা হবে? কাদের খবর দেওয়া হবে? কতগুলো কালো ড্রেস ভাড়া নিতে হবে? অথবা আপনি যদি নাকউঁচু সমাজের সভ্য হোন একেবারে ড্রেশ কিনে নেবেন?

শোকে মুহ্যমান হলে নিজে গাড়ি চালানো শোভন নয়। কোনো চিন্তা নেই,

ফিউনারাল কোম্পানিই প্রত্যেককে বাড়ি থেকে তুলে নেবে, আবার বাড়ি পৌঁছে দেবে। প্রতিটি লিমোজিন ঘন্টায় একশ ডলার এবং ড্রাইভারের পারিশ্রমিক ঘন্টায় মাত্র পঞ্চাশ ডলার। যত ঘন্টা খুশি রাখুন, প্রাণভরে শোক করুন। এইসব গাড়ি যখন শোভাযাত্রা করে আপনার কফিন-গাড়ির পিছন-পিছন যাবে তখন ট্রাফিক পুলিশও আপনাকে রাজকীয় সম্মান দেখাবে—লাইফে একবারই ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে, পুলিশকে কলা দেখিয়ে আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন।

"ভারতীয়দের তো তাহলে এদেশে মরার কোনো মানে হয় না।" মনের দুঃখে মিছরিদা বললেন, "বেঁচে থাক আমার বাঁশতলা, নিমতলা, কাশীমিত্তির, কেওড়তলা।"

প্রবীরবাবু বললেন, "পুড়ে ছাই হয়ে যাবার মধ্যে লজিক আছে। নব্বুই বছরের লিজ প্রয়োজন হলো না। তবে প্রতি পদে দরদস্তুর করতে হয়। আমাকে অনেকবার এইসব দায়িত্ব নিতে হয়েছে—শোকের সময় নিকট-আত্মীয়দের এসব বোঝাপড়ার শক্তি থাকে না। হাসপাতাল থেকে হোম পর্যন্ত ট্রান্সপোর্টেশন খরচ থেকেই সাবধানে শুরু করতে হয়। ক্লিন আপ, নাইট ভিউ, ইত্যাদি আমরাও নিই। লিমোজিন আমরা ভাড়া করি না। নিজেরাই ড্রাইভারি করি। আমাদের পুরোহিত খুব এফিসিয়েন্ট—ব্যাগের মধ্যে দাহকাজের সব জিনিসপত্তর নিয়ে চলে আসেন মিস্টার পট্টবর্ধন। আগে দক্ষিণা ছিল সাড়ে ছ'শ টাকা এখন হাজার দুয়েক হয়েছে। ইলেকট্রিক ক্রিমেটোরিয়ামে দাহকার্য সম্পন্ন করে দশ ডলার দিলেই খামের মধ্যে চিতাভস্ম পাওয়া যাবে। ইচ্ছে হলে ওই ভস্ম দেশে পাঠিয়ে দাও—মিশে যাক গঙ্গাযমুনায়।"

এখানে একটা মুশকিল। দাহকার্যে ইণ্ডিয়ান ধূপধুনো জ্বালানো নিষিদ্ধ—পরিবেশ দূষণের কথা ভেবে কোনোরকম গন্ধদ্রব্য পোড়ানো যাবে না। "এই নিষেধটা আন্দোলন করে আমাদের তুলতে হবে। লক্ষ লক্ষ লোক বিড়ি-সিগারেট ফুঁকছে চলমান চিমনির মতন, তাতে কিছু হচ্ছে না, পরিবেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে ডজনখানেক ধূপ জ্বালালে।"

প্রবীববাবু আশ্বস্ত করলেন, "আমাদের এখনও বক্তৃতা দেবার জন্যে লোক ভাড়া করতে হয় না। বিদেশে বিপদের সময় ভারতীয়রা তুলনারহিত—খবর পেলেই তাঁরা ছুটে আসেন সব কাজ ছেড়ে, চরম বিপদের সময়ে নিঃসঙ্গ বোধ করার কোনো ভয় নেই।"

মিছরিদার মন্তব্য, "সায়েবদের শ্মশানের পরিচ্ছন্নতা আমার খুব ভাল লেগেছে। এরা টু-পাইস হাতিয়ে নেবার জন্যে ছটফট করে বটে, কিন্তু সর্বত্র শৃঙ্খলা। আমার ভাল লাগলো, সবাইকে খাতায় সই করতে হলো, আমিও

নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম। সুতরাং কে এসেছিল, কে আসেনি তা জানবার জন্যে জনের বিধবাকে ছটফট করতে হবে না।"

মিছরিদার প্রস্তাব, "এই সিস্টেমটা তোরা দেশেও চালু কর। মৃত্যুর পরে যাঁরাই বাড়িতে আসবেন বা শ্মশানে যাবেন সবাই খাতায় নাম-ঠিকানা লিখবেন। একটা পারিবারিক রেকর্ড থেকে যাবে।"

প্রবীরবাবু শুনলেন, কিন্তু মন্তব্য করলেন না। বললেন, "যত কমেই হোক, বিদেশে মরতে গেলে অন্তত হাজার দুই তিন ডলার আপনার রেডি রাখতে হবে।"

মিছরিদা সেই শুনে বললেন, "অনেক ভেবে-চিন্তেই আমি তোকে বলেছি, জন্মাবার পক্ষে বেস্ট জায়গা এই আমেরিকা, কিন্তু মরবার পক্ষে ইণ্ডিয়া এখনও এক নম্বর।"

নিউ জার্সিতে মিছরিদা-সান্নিধ্যে প্রবীর রায়ের বাড়িতে বসে মৃত্যুকেন্দ্রিক মার্কিনী ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাবার্তা শুনে কান খাড়া হয়ে উঠছিল।

মুখে একটু মুখশুদ্ধি পুরে মিছরিদা আমার দিকে একটি বটিকা এগিয়ে দিলেন। (বহু কষ্টে আমেরিকান কাস্টমসের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে বস্তুটি তিনি এদেশে নিয়ে এসেছেন। দুটি শিশির একটি লালু কাস্টমসদাকে নমুনা-উপহার হিসেবে ছেড়ে এসেছেন, রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, গোলমেলে কিছু আছে কি না!)

চোখ বুজে মুখশুদ্ধির রস গভীরভাবে উপভোগ করে মিছরিদা বললেন, "মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা একেই বলে! যদি ঠিকমতন মালকড়ি না থাকে তাহলে বংশধরদের মুখ চেয়ে কারুর মরতেই ইচ্ছে করবে না স্রেফ ঘাটখরচের ভয়ে।"

মিছরিদার পরবর্তী বক্তব্য, "তোকে কি বলবো, লোকগুলো একেবারে বে-আক্কেলে! ডলারের ব্যাপারে কোনো রকম লজ্জাশরম নেই। আমিও হচ্ছি বাপধন হাওড়া-কাশুন্দের মিছরি ভট্চায্যি, চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে একটু-আধটু বাগিয়ে নিয়েছি—এই দ্যাখ!" বলে মিছরিদা আমাকে একটা ঝকঝকে দামী চাবির রিং দেখালেন।

"কি ব্যাপার মিছরিদা?"

"নেহাত গোরস্থানের ডোমদের ব্যাপার, না হলে দেশে ফিরে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির পুরুতমশাইকে উপহার দিতাম। ও বেচারা অনেকদিন আমার কাছে একটা ভাল চাবির রিং চাইছে।"

মিছরিদা এবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন। "শ্মশানে-গোরস্থানে কিংবা ক্রিউনারাল হোমে গেলে নাম-ঠিকানা নিজের হাতে খাতায় লিখে রাখার

সিস্টেমটা আমার প্রথম খুব ভালে লেগেছিল। তখন তাই ভাই-বউয়ের কাকার অন্ত্যেষ্টিতে নিজের নাম-ঠিকানা লিখেছিলাম। ভিতরের ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝিনি। ওমা! ঠিক তিনদিন পরে বাতাসার ঠিকানায় আমার নামে ঝকঝকে একটি চিঠি এলো।"

মুখশুদ্ধির রসটা টেনে নিয়ে মিছরিদা বললেন, "আমেরিকান কোম্পানি বুঝতে পারেনি যে আমি দু'দিনের অতিথি, ভাই-ঝি'র বিয়েটা দিয়েই আমি কেটে পড়বো, আর কখনও এদেশে আসবো না। কোম্পানি ভেবেছে আমি এখানেই মরতে এসেছি!"

"তারপর?"

"তারপর আর কি!" মুখ বেঁকালেন মিছরিদা অর্থাৎ মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য। "আমার ভাই বাতাসা, আমার ভাই-বউ খুব লজ্জায় পড়ে গেলো। আমার তো ধারণা ছিল চৈত্র মাসে কাপড়ের দোকানেই শুধু সেল দেয়। ওমা! এখানে মড়ার ব্যাপারেও সেল! ঠিক দিনক্ষণ দেখে মরতে পারলে অনেক রেট সস্তা হয়!"

"কী যা-তা বলছেন মিছরিদা!"

"দেখ না, তুই। মড়া-কোম্পানির চিঠিটা তো আমার পকেটেই রয়েছে। শোন কী লিখছে কোম্পানির সায়েব ভাইসপ্রেসিডেন্ট: 'আশা করি সেদিনের গভীর দুঃখের রেশ কাটিয়ে উঠে তুমি আবার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে বিপুল বিক্রমে দৈনন্দিন কাজ শুরু করবার মানসিক শক্তি সংগ্রহ করেছো। যদি তোমার দুঃখের মুহূর্তে কোনো সঙ্গীসাথী প্রয়োজন হয় তা হলে জানাতে দ্বিধা কোরো না। আমাদের প্যানেলে স্পেশালি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক আছে, মাত্র ঘন্টায় কুড়ি ডলারের বিনিময়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে সানন্দে তোমার দুঃখের ভাগিদার হবে।

'এইসঙ্গে আমরা একটি স্মারক চাবির রিং পাঠালাম। সেই স্মরণীয় দিনটি যাতে সুন্দর একটি উপহারের মাধ্যমে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে।

'কিন্তু সেইসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় কথা। তোমার ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারছি তুমি একজন শহুরে মানুষ। জীবিতকালে অর্থোপার্জনের জন্যে গাড়িঘোড়ার আওয়াজ, শহরের নানা ঝামেলা তোমাকে মুখ বুজে সহ্য করতেই হবে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই চাও না, সব কর্মের শেষে তুমি যখন চিরশান্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে তখনও ওইসব গাড়ির আওয়াজ, কংক্রিটের গরম তোমাকে জ্বালাতন করে। সেইজন্যেই চমৎকার আগাম ব্যবস্থা। চিঠির সংলগ্ন ম্যাপ দেখো। যেখানে তুমি শুয়ে থাকবে, তার চারিদিকে সবুজ গাছ, রঙিন ফুলের শোভা। এইসব জমি দ্রুত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তুমি মাসে-মাসে

শতখানেক ডলার জমা দিয়ে আগাম ব্যবস্থা করে রাখো যাতে মৃত্যুর পরে কোনো হাঙ্গামা না থাকে। একদিন অনুগ্রহ করে, আমাদের প্রতিনিধিকে তোমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দাও। সবকিছু জলের মতো সে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। ভবদীয়.....

'পুঃ অমুক তারিখ পর্যন্ত আমাদের বিশেষ সেল চলেছে। দশ পার্সেন্ট কমে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করার এমন চমৎকার সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া কোরো না'।"

মুখ থেকে মুখশুদ্ধিটা বার করে বেসিনে ফেলে এলেন মিছরিদা। বললেন, "ভাগ্যে তোর বউদি সেই হাওড়া থেকে এখানে আসেনি। হার্টের দোষ রয়েছে। চিঠিটা দেখলে কী অবস্থা হতো বল দিকি।"

মিছরিদা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু বাতাসা বললো, ওতে বিপত্তি বাড়বে। দু' তিন সপ্তাহ পরে কম্পিউটার থেকে আবার অটোমেটিক রিমাইণ্ডার আসবে।

ফলে বাধ্য হয়ে চিঠির উত্তর দিতে হলো। মিছরিদা দামী লেটার হেডে নিজের হাতে লিখলেন—"আমার মরণোত্তর সুখসুবিধে সম্পর্কে আপনাদের গভীর উদ্বেগের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। মরার পরে সব দুশ্চিন্তা বিসর্জন দিয়ে চিরকাল পা-ছড়িয়ে শুয়ে থাকার জন্যে আপনার শান্ত জায়গাগুলিই যে সব থেকে মনোহর সে-সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু সাত সমুদ্র পারে হাওড়ার বাঁশতলা ঘাটে আমি ইতিমধ্যেই ডি-লাক্স বক্স বুক করে রেখেছি—আমার বহু জানাশোনা লোক আড়ালে-আবডালে বহুদিন ধরে জানতে চাইছে কবে আমি বাঁশতলা ঘাটে ভিজে কাঠের বেদিতে উঠবো। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে আপনাদের স্পেশাল কনসেশনের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হলো না। আপনার মনোমোহন চাবির রিংটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এটি আমি যথাসময়ে বাঁশতলার ডোমের হাতে তুলে দেবো। ভবদীয়—শ্রীমিহিরকিরণ দেবর্শমণঃ"

মিছরিদা বললেন, "আমার ভাই বাতাসা চিঠি পড়ে বললো, 'সব ভাল, কিন্তু ভট্টাচার্য লেখো—কম্পিউটার হচ্ছে বুদ্ধিমান-বোকা। দেবর্শমণঃ দেখে ঘাবড়ে যাবে, ভাববে অন্য কেউ চিঠি লিখেছে, ফলে আবার রিমাইণ্ডার পাঠাবে'।"

মনের দুঃখে মিছরিদা লিখলেন, "হোয়াট ইজ ফিফটি-টু ইজ অলসো ফিফটি থি। ইওরস ফেথফুলি—মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য।"

"ওটা কী হলো, মিছরিদা?"

ঠোঁট উল্টে মিছরিদা ব্যাখ্যা করলেন, "সায়েবদের বুঝিয়ে দিলুম, যাহা বাহান্ন

তাহা তিপ্পান্ন। ভট্টাচার্যই খাটে উঠে ঘাটে যাবার সময় দেবর্শমণঃ হয়। তাতে বাইবেল, গীতা, কোরাণ অশুদ্ধ হয় না।"

প্রবীর রায়ের নিউজার্সিভবন থেকে বেরিয়ে মিছরিদা বললেন, "এখন কোথায় যাবি? এর নাম আমেরিকা! বউমা 'এখনো কেন বাড়ি ফিরছে না' ভেবে তোর জন্যে মুখ শুকিয়ে থাকবেন না, চল দুজনে একটু এধার-ওধার ঘুরে বেড়াই।"

"আপনি কি শেষ পর্যন্ত নাইট ক্লাবে যাবার কথা ভাবছেন, মিছরিদা?"

জিভ কাটলেন মিছরিদা। "আমরা হলাম কিনা বিবেকানন্দর সেবায়েত। উনিওতো এসেছিলেন এ-দেশে, কিন্তু গিয়েছিলেন কি কোনো নাইট ক্লাবে? আসল ব্যাপারটা কি জানিস, আমরা যে অভাগা দেশে জন্মেছি তা তমসাচ্ছন্ন! সমস্ত দেশটাতেই যখন নাইট তখন আর ক্লাবে গিয়ে কি এমন বাড়তি সুখ হবে?"

আমরা এবার নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে ফিরে এলাম। মিছরিদার প্রস্তাব, "চল আমার ভায়ের বাড়ি। বাতাসার জল খেয়ে শরীরটা একটু ঠাণ্ডা করে নিবি।"

মিছরিদা আমাদের অবাক করলেন। ভাইপো ভাইঝিদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দেবার জন্যে সঙ্গে করে সত্যিই পাটালি, মিছরি এবং বাতাসা এনেছেন। "বাপের ডাক-নাম যে বাতাসা এবং তার অর্থ যে সুইট তা তারা জানে, কিন্তু আসল বস্তুটি কি তা আন্দাজ করতে পারেনি। এবারে ভাইঝি লিখেছিল, আঙ্কেল, যদি পারো সঙ্গে 'ব্যাটাসা' এনো। আনতে হলো। বোঝাতে হলো, যে সুইটের মধ্যে বাতাসা অথবা এয়ার ইনজেক্ট করিয়ে দেওয়া হয়, তারই নাম বাতাসা। লর্ড বিষ্ণু, ইনচার্জ অফ মেইনটিন্যান্স-এর স্পেশাল ফেভারিট এই বাতাসা। খুব পেট ঠাণ্ডা রাখে।"

বললুম, "বছর তিরিশেক আগে এদেশে এলে ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে পারতেন বাতাসা ম্যানুফ্যাকচার করে। গভীর দুঃখের ব্যাপার, এখন সারা দেশটাই মাংস এবং মিষ্টি ছেড়ে দিতে চায়। এই রেটে খাবারে অনীহা হলে গোটা আমেরিকান জাতটাই না শেষ পর্যন্ত বিবাগী হয়ে বনে চলে যায়, মিছরিদা।"

"রাখ ওসব বাজে কথা। স্রেফ বাতাসা দেখতে আমার ভাইয়ের বাড়িতে কত সায়েব-মেম আসছে। ভাইঝি একটা জবরদস্ত নাম দিয়েছে—ক্যাণ্ডিয়ানা!

ওটা বুঝলি তো ? ক্যান্ডি প্লাস ইন্ডিয়া প্লাস আনা অর্থাৎ ইন্ডিয়া থেকে আনা মিষ্টি !"

একটা ব্যাপারে মনটা খচখচ করছিল। বললাম, "মিছরিদা, শ্মশানের কোনো জিনিস ব্যবহার করলে অমঙ্গল হতে পারে। আপনি ওই চাবির রিংটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরবেন না !"

মিছরিদা হাসলেন। "তুই ভাবছিস বিদেশে দৈবের বশে যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় ! কিন্তু শুনে রাখ, এখানে মরা খুব শক্ত ! সমস্ত দুনিয়ার জ্ঞান আহরণ করে, শত শত যন্ত্রপাতি নিয়ে ডাক্তাররা এখানে যমকে প্রায় লে-অফ করে রেখেছে। আমাদের কালী কুণ্ডু লেনের ডাঃ তপন সরকারেরও তো বেশ নামডাক। যমের যত তেজ ইন্ডিয়াতেই—এখানে উনি মাথা নিচু করে হাত গুটিয়ে বসে আছেন, আর বুড়োরা টপাটপ ষাট, সত্তর, আশি এমনকি নব্বুই পেরিয়ে কেন সেঞ্চুরি করবে না তার এক্সপ্লানেশন চাইছে ডাক্তারের কাছে।"

মিছরিদা বললেন, "অনেক কাঠ-খড় না পুঁড়োলে এখানে মরা সম্ভব নয়। দেহটাকে এরা মোটরগাড়ির মতন করে ফেলেছে—সব রকম স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়, যেটা অকেজো সেটা পাল্টে দিয়ে তোমাকে চাঙ্গা করে তুলবে। তোমার পকেটে যতক্ষণ পয়সা আছে ততক্ষণ যমও তোমাকে খাতির করে চলবে, কাছে ঘেঁসবে না !"

মিছরিদা বললেন, "বড্ড ভাল লাগলো, এখানকার ডাক্তারবাবুরা রোগীদের ভীষণ ভয় করেন। পান থেকে চুন খসেছে তো লাখ-লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রোগীকে। ডাক্তারি ডকে উঠবে এক মামলায় !"

মিছরিদা : "আমি তো নিজের চোখে নিউ ইয়র্ক হাসপাতাল দেখে এলাম। তাজ্জব ব্যাপার। তুই ওইসব ডিজনিল্যাণ্ড বা গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন-ফ্যানিয়ন না-দেখে এক-আধটা হাসপাতাল ভিজিট করে যা, মানব জন্ম সার্থক হয়ে যাবে। মানুষকে এরা কতটা মূল্যবান মনে করে তার প্রমাণ হাতে-নাতে পেয়ে যাবি। তোরা তো কবিতা লিখে, গান গেয়ে, মানুষই সবার ওপরে ইত্যাদি বুলি কপচে জাতীয় কর্তব্য শেষ করলি। আমাদের চোখের সামনে এই ক'বছরে দেশের হাসপাতালগুলো কেন কসাইখানার অধম হয়ে গেলো সে-বিষয়ে সাহিত্যিকমাথা ঘামালি না। ইন্ডিয়া যতই অধঃপতনে যাক পৃথিবীতে এমন দেশ আছে যেখানে মানুষের চিকিৎসা উচ্চতম সাধনার পর্যায়ে উঠে গিয়েছে তার রিপোর্ট এবার তুই দে, আমাদের দেশের মানুষ অন্তত জানুক।"

আমি চুপ করে রইলাম। বড় দুর্বলস্থানে আঘাত করেছেন মিছরিদা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আমাদের আত্মীয় শৈলেন তখন দেশের এক হাসপাতালের ডাক্তার, এক রাতে এগারোখানা ডেথ সার্টিফিকেট

দিলো—মর্গে পর্যন্ত মাথাগোঁজার জায়গা নেই। কিন্তু এ নিয়ে কর্তাব্যক্তি কারও মাথাব্যথা নেই। সেই শৈলেন মনের দুঃখে দেশত্যাগী হয়ে এদেশে এসে চমৎকার কাজ করছে। হাসপাতালে প্রচণ্ড সুনাম হয়েছে।"

আমি জানি, ব্যক্তি হিসেবে আমরা যতই এক নম্বর হই, প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে বাঙালীরা বোধহয় দুনিয়ার নিকৃষ্ট। আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের যে কোনো হাসপাতাল বলে দেবে কি করে যৌথ দায়িত্ব পালন করতে হয় তা আমরা জানি না। যেখানেই মিলি-মিশি করি কাজ-এর প্রয়োজন সেখানেই আমাদের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি। এবং সবচেয়ে যা লজ্জার, অবস্থা ক্রমশ খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ পরিচালনা-বিজ্ঞান ব্যাপারটি আমাদের কাছে নিষিদ্ধ মাংসবৎ। আমাদের অধ্যাপক জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অপদার্থ, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার প্রযুক্তিতে নমস্য কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাগৈতিহাসিক, আমাদের ডাক্তারবাবু চিকিৎসাবিদ্যায় কৃতী কিন্তু হাসপাতাল পরিচালনায় অক্ষম। অথচ এই বেড়ালই যে বনে গিয়ে বন-বেড়াল হয় তা পূর্বেই বলেছি।

মিছরিদা ও আমি ম্যানহাটানের এক চাইনিজ দোকানে ঢুকেছি কিছু খাবার জন্যে। মিছরিদা বললেন, "দ্বারিক অথবা নকুড় এখানে একটা সেলস্ কাউন্টার করলে পারতো—টু পাইস বাড়তি রোজগার হতো স্বচ্ছন্দে!"

এবার মিছরিদা বকুনি লাগালেন, "তুই তা হলে অ্যাদ্দিন এখানে করলি কি? একটা চিকিৎসাকেন্দ্র পর্যন্ত দেখলি না!"

আমি বললাম, "দেখেছি মিছরিদা। আমেরিকার গর্ব ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিক। আমি ওখানকার এক নামকরা গবেষকের সঙ্গে ঘুরে দেখে নিয়েছি। দেখলে ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।"

মিছরিদার ভবিষ্যদ্বাণী, "বহু মানুষের তপস্যায় চিকিৎসাবিজ্ঞান এদেশে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত এরা হয়তো ভীষ্মের মতন ইচ্ছামৃত্যুর আশীর্বাদ লাভ করবে। এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে যমদেব ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড অফিস ইণ্ডিয়ায় সরিয়ে নিয়েছেন।

ফ্রায়েড রাইস ও আমেরিকান চপসুয়ে ভোজন করতে-করতে আমি ওহায়ো রাজ্যের ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিক পর্যটনের কথা স্মরণ করতে লাগলাম।

এক বয়োজ্যেষ্ঠ বাঙালী অধ্যাপক তাঁর যথাসর্বস্ব বেচে দিয়ে একমাত্র সন্তানের চিকিৎসার জন্যে তখন ক্লিভল্যাণ্ডেই রয়েছেন। একজন বললেন, "ভদ্রলোক বাড়াবাড়ি করছেন, দেশে কি আর চিকিৎসা হয় না?" আর ভাগ্যহীন সেই পিতার কাতরোক্তি, "আমার একমাত্র সন্তান। সব জেনেশুনে কি করে হাতগুটিয়ে বসে থাকি? একবার শেষ চেষ্টা করার জন্যে যথাসর্বস্ব বেচে দিয়ে এদেশে এসেছি।"

আর একজন দুঃখ করলেন, "প্রতি বছর বেশ কয়েকজন ভারতীয় এইভাবে বহু বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে এখানে চলে আসেন চিকিৎসার জন্যে। সেই টাকাগুলো একত্র করলেই তো কয়েকটা ভাল চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা যেতো। ইণ্ডিয়ার ডাক্তার তো এই হাসপাতালেও কাজ করছেন।"

আমি লজ্জায় যা বলতে পারলাম না, সমস্যাটা অর্থের নয়, সমস্যাটা ম্যানেজমেন্টের। আমরা যৌথভাবে কিছু পরিচালনার বিদ্যাটা আয়ত্ত করতে আগ্রহী নই।

জীবন, মৃত্যু, শরীর ও চিকিৎসার কথা যখন উঠলোই তখন একবার ক্লিভল্যাণ্ড ওহায়োতে ফিরে যাওয়া যাক—যেখান থেকে আমার মার্কিন মহাদেশে পরিক্রমা শুরু হয়েছিল।

প্রথমেই এসে পড়ে প্রখ্যাত পাকড়াশী দম্পতির কথা। স্বামী ব্রজেশ একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, যাঁর কার্ডিওলজি ক্লিনিকে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে রোগীর আগমন হয়। কৃত্রিম হার্টভালভ আবিষ্কারের ব্যাপারেও তাঁর বোধহয় কিছু অবদান আছে। ব্রজেশ-গৃহিণী শ্রীমতী শুভা সেন পাকড়াশী একজন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা-গবেষক। তিনি শুধু নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্সের কো-চেয়ারপার্সন নন, উচ্চ রক্তচাপের বিষয়ে তাঁর কাজকর্ম পৃথিবীর ডাক্তারি মহলে নানাভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আশুতোষ কলেজের ছাত্রী শুভা সেন কলকাতার মেয়ে। এম-এস-সি পড়াশোনা করে এক সময়ে ব্যাগে আট ডলার নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্যে। তিনি এখন ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকের লাগোয়া ক্লিভল্যাণ্ড ফাউণ্ডেশন গবেষণা কেন্দ্রের একটি স্তম্ভ। ভবানীপুর হরিশ পার্ক থেকে ক্লিভল্যাণ্ড অনেক দূর—কিন্তু কলকাতায় যেসব কাজ করার ইচ্ছে থাকলেও করে উঠতে পারেননি তাই ক্লিভল্যাণ্ডে সম্ভব হয়েছে।

শাড়িপরা শ্যামাঙ্গিনী স্নেহময়ী শুভাকে রাস্তায় দেখে আপনার মনে হবে আর-একটি মধ্যবয়সিনী বঙ্গবধূ। কিন্তু ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকের গবেষণাকেন্দ্রে কোটি কোটি ডলারের বিচিত্র যন্ত্রপরিবেষ্টিতা এই মহিলার দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখলে বুঝতে পারবেন কেন তাঁর এতো সম্মান। ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকের আয়োজন

চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যৌথ প্রচেষ্টায় মানুষের কর্মদক্ষতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তা এইসব প্রতিষ্ঠানে না-এলে বোঝা যায় না।

কলকাতার মন্ত্রী, ডাক্তারবাবু, নার্স, ওয়ার্ডবয়, কুক, দারোয়ান সবাইকে একবার এখানে বেড়াতে নিয়ে আসতে ইচ্ছা হয় আমার। নিজের চোখে তাঁরা দেখে যান দুটো চোখ, দুটো হাত আর একখানা মাথা এবং কিছুটা প্রতিভা নিয়ে যৌথভাবে এখনও লেগে পড়লে আমরাও কিছুদিনের মধ্যে কোথায় পৌঁছতে পারি।

ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকে প্রতিদিন সকালে কয়েক ডজন হার্ট সার্জারি হয়। অন্য সার্জারি শত শত। রোগীরা আসেন পৃথিবীর সব দেশ থেকে। ক্লিনিকের আর্থিক লাভ থেকে ক্লিভল্যাণ্ড ফাউণ্ডেশনে গবেষণার কাজকর্ম চলে।

ক্লিভল্যাণ্ড ফাউণ্ডেশনে শুভা সেনের গবেষণাগারে একটি ভারতীয় মহিলার সঙ্গে আলাপ হলো। চিত্রা দামোদরণ এম-ডি করে হাইপার টেনশন সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। আমি যখন ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম চিত্রা তখন একটি ইঁদুরের ব্লাডপ্রেসার মাপতে ব্যস্ত।

হার্ট-সংক্রান্ত অপারেশনে পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতনামা হাসপাতাল এই ক্লিভল্যাণ্ড। হার্টের ওপর হাইপারটেনশনের প্রতিক্রিয়া হলো শুভার গবেষণার লক্ষ্য। আরও একটি ভারতীয় মেয়েকে দেখলাম, বিজয়াস্বামী।

শুভা সেন এখানকার পড়াশোনা শেষ করে একবার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু একাত্তর সালের অশান্ত কলকাতায় কিছু হলো না। বিপ্লবের নাম করে কয়েকজন কমবয়সী ছেলে বিশ্ববিদালয়ের গবেষণাগারে ঢুকে তাঁর বই ও কাগজপত্র পুড়িয়ে দিলো। মনের দুঃখে শুভা আবার দেশত্যাগী হলেন।

ক্লিভল্যাণ্ড হাসপাতাল নয় তো, একটা শহর। এই হাসপাতালের বর্ণনা করতে গেলে একটা বই লিখতে হয়। এখানেই প্রথম হার্টের বাইপাস সার্জারি সফল হয়েছিল। সেই-সময় এখানে কলকাতার এক ডাক্তার ছিলেন—ডক্টর অমর সেনগুপ্ত। আমি দেশে ফিরে আসবার পরে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেলাম।

বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকের একটি প্রমাণ সাইজের জনসংযোগ বিভাগ আছে এবং ওঁদের পি. আর. ও. আমাকে যত্ন করে ভিডিও প্রোগ্রামে হাসপাতালের বিচিত্র কর্মধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শুনলাম, ইন-ডোর ছাড়াও, প্রায় পাঁচ-ছ লাখ রোগী প্রতি বছরে আউটডোরের সুবিধে নেন। এঁদের চমৎকার একটি নিয়ম আছে—যে দেশ থেকে রোগী ভর্তি রয়েছেন সে-দেশের ফ্ল্যাগ ওড়ানো হবে। ফ্ল্যাগের সংখ্যা দেখলে আপনি তাজ্জব হবেন। বলা বাহুল্য ইণ্ডিয়ান ফ্ল্যাগও উড়ছে পাকিস্তানের

ফ্ল্যাগের সঙ্গে।

না, যমে-মানুষের লড়াইয়ে মানুষ কিভাবে বিজয়ী হচ্ছে, তার বর্ণনা দিয়ে নিজের দেশের মানুষদের দুঃখ ও হতাশা আর বাড়াবো না। শুধু যা না বলে থাকতে পারছি না, এইসব প্রতিষ্ঠানও বিশিষ্ট ভারতীয়দের মাথায় করে রেখেছেন। নাম শুনলাম ডক্টর অতুল মেহতার, এঁর সুন্দরী স্ত্রী বাঙালী। অতুল মেহতা নাকি কলকাতায় পড়াশোনা করতেন। ভাল জিনিস যে বাঙালীরা সবসময় হাতছাড়া করে না জামাতা অতুল মেহতা তারই একটি প্রমাণ! ডঃ মেহতা কাজে ব্যস্ত, দেখা হলো না।

যাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ পেলাম তাঁর নাম ডাক্তার শারদ দেওধর, চেয়ারম্যান অফ ইমিউনো-প্যাথলজি, ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিক। শারদের পিতৃদেব আমাদের কৈশোরকালের হিরো, মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত ক্রিকেটার সংস্কৃতের অধ্যাপক ডি বি দেওধর। শারদের মুখেই শুনলাম, বয়সী পিতৃদেব মোটামুটি সুস্বাস্থ্য নিয়েই নিজের দেশে বসবাস করছেন। ছিয়াশির জানুয়ারিতে শারদ পুণায় এসেছিলেন পিতৃদেবের পঁচানব্বইতম জন্মজয়ন্তীতে অংশগ্রহণ করতে। শারদের মাতৃদেবী কুড়ি বছর আগেই দেহরক্ষা করেছেন।

শারদ দেওধরের সঙ্গে আমেরিকার যোগসূত্র অনেকদিনের। উনিশ বছর বয়সে ১৯৫০ সালে বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে এখানে এসেছিলেন। তারপর পেনসিলভেনিয়া থেকে পি-এইচ-ডি এবং এম-ডি। ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১৯৬৪ থেকে। মার্কিনী তনয়া বিবাহ করেন ১৯৫৫ সালে। তিনটি সন্তান। বড় মেয়েটিকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন ধ্রুপদী নাচ শিখতে। কর্মব্যস্ত মানুষ শারদ দেওধর আমার সঙ্গে প্রায় বিনা নোটিশেই কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলেন। দেশ ছাড়লেও দেশের মানুষদের মায়া ছাড়া যে কঠিন ব্যাপার, তা শারদ দেওধরকে দেখে আর একবার বুঝলাম।

শারদ মানুষটি অত্যন্ত বিনয়ী। শান্তভাবে বললেন, "চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশই এমন জটিল হয়ে উঠছে যে একজন মানুষের পক্ষে সর্বজ্ঞ হয়ে থাকা এখন আর সম্ভব নয়। তাই এখন মিলিত হয়ে টিম হিসেবে প্র্যাকটিস করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। এইজন্যেই ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিক এখন বিশ্বের এক তুলনাহীন প্রতিষ্ঠান। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের স্পেশালিস্টরা সুসংহত দল হিসেবে কাজ করেন। কারণ শেষ পর্যন্ত রোগীকে একটা মানুষ হিসেবেই চিকিৎসা করতে হবে।"

আকারে-ইঙ্গিতে দেওধর যা বললেন তার অর্থ হলো, এই টিমওয়ার্কের ব্যাপারটা এখনও ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে স্বীকৃতি পায়নি। আমরা ফুটবল খেলবো, ক্রিকেট খেলবো টিম হিসেবে, কিন্তু চিকিৎসা করবো একা-

একা ! এর ফলেই বহু প্রতিভাধর মানুষ থাকা সত্ত্বেও দেশটা চিকিৎসার ব্যাপারে শোচনীয়ভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে।

দেওধর বললেন, "ভারতবর্ষে যা দরকার তা হলো চিকিৎসাক্ষেত্রে পুলিং অফ আইডিয়াজ। এর থেকেই চিকিৎসার মান ক্রমশ উন্নত হতে আরম্ভ করবে।"

দেওধর কিন্তু দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে অনবহিত নন। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, "মেডিক্যাল কেয়ারের মান ধরে বিচার করলে ইউ-এস-এই পৃথিবীর এক নম্বর দেশ। কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই, এখানে খরচ অসম্ভব।" তফাতটা কোথায় জানতে চাইলে দেওধর বললেন, "অন্য দেশেও বড় বড় ডাক্তার আছেন বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু প্রথমে একজনের কাছে যাও, তারপরে আর একজন স্পেশালিস্টের কাছে যাও, তারপর আর একজনের কাছে। আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব কিছুটা টেকনলজির, কিন্তু বেশিরভাগ হলো, সমস্ত বিশেষজ্ঞ একসঙ্গে পরামর্শ করে রোগীর চিকিৎসার জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন। শরীরের যত রকম জটিল রোগ আছে তা একসঙ্গে নিয়ে কেউ ক্লিভল্যাণ্ডে আসুক, ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পরীক্ষা করে চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়ে যাবে। একটা জটিল ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশনে দরকার হলে কুড়ি জনের টিম একসঙ্গে কাজ করবে। অবশ্য তেমন একটি জটিল কেসে বারো-তেরো লাখ টাকা খরচ হতে পারে।"

আমার আর এক প্রশ্নের উত্তরে দেওধর বললেন, "চিকিৎসা গবেষণাতেও আমেরিকা এখন পৃথিবীর এক নম্বর দেশ।" নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানালেন, "এরপরে যদি তিনটে দেশের নাম করতে হয় তা হলো জাপান, জার্মানি ও সুইডেন।" চিকিৎসার খরচ সম্পর্কে দেওধর বললেন, "ইনসিওরেন্স আছে বলেই এই ধরনের খরচের ভার রোগীরা বইতে পারেন। যাঁরা বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করেন তাঁদেরও চলে যায়। সমস্যা হলো গরিবদের, বেকারদের—যাঁদের মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স নেই, তাঁদের। এঁদের যেতে হয় সরকার পরিচালিত কম্যুনিটি কেয়ার হাসপাতালে—যেখানে চিকিৎসার মান এখানকার মতন উন্নত নয়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, যতই গরিব হোক, কোনো আমেরিকানকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয় না। এইসব জায়গায় যে কোয়ালিটি অফ কেয়ার পাওয়া যাবে তা তুলনায় একটু নিরেস এই যা।"

ডাক্তার দেওধর সবিনয়ে স্বীকার করলেন, "আমেরিকার ভারতীয় ডাক্তারদের যথেষ্ট সম্মান, কারুর তুলনায় ভারতীয়দের মাথা নিচু করে থাকবার প্রয়োজন নেই। যাঁরা কিছুদিন আগে এসেছেন তাঁদের অনেকেরই এখন যথেষ্ট খ্যাতি।" ইণ্ডিয়ান ডাক্তারদের সম্পর্কে আমেরিকান কর্তাদের সাধারণ

ধারণা—এঁরা পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানুষ। সুদূর প্রাচ্যের সবার তুলনায় ইণ্ডিয়ান গ্র্যাজুয়েটরা তাই একটু প্রিমিয়মে রয়েছেন।

দেওধরের বয়স ছাপান্ন। দেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। শান্তভাবে বললেন, "যখন এখানে এসেছিলাম তখন ভেবেছিলাম চার বছর পরেই ফিরে যাবো। কিন্তু পাকেচক্রে ফেরা হল না, ছত্রিশ বছর রয়ে গেলাম। বাবা একটু কষ্ট পেলেন, এই যা। তিনি একবার এখানে এসেছিলেন পঁচাশি বছর বয়সে, ১৯৭৫ সালে। আমি দূরে আছি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সাফল্য আমাকে আনন্দ দেয়, ভারতবর্ষের কষ্ট আমাকে এখনও কষ্ট দেয়।"

দেওধরের টেলিফোন বেজে উঠলো। কিডনি গ্রাফটিং-এর একটা অপারেশনের টিম কনফারেন্স এখনই শুরু হবে, আমাকে শুভা সেন পাকড়াশীর হাতে তুলে দিয়ে ডাক্তার শারদ দেওধর বিদায় নিলেন।

ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকে গেলে মনে হয় না হাসপাতালে এসেছি। যেন ফাইভ-স্টার কোনো আনন্দলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানকার হালচাল দেখে অনেক রোগ নিজেই ভয় পেয়ে দেহ ছেড়ে পালাবে!

শুভা সেন জানতে চাইলেন, "অপারেশন দেখবেন? রোগীর আত্মীয়দের অপারেশন দেখাবার জন্যে টিভিতে বিশেষ ব্যবস্থা আছে।"

আমি বললাম, "ওসবের মধ্যে আমি একদম নেই। চিরকাল এসপ্লানেড থেকে ট্রামে কলেজ স্ট্রীট যাবার সময় আমি 'মাটিয়া কলেজের' সামনে মিনিট-পাঁচেক চোখ বুজে থেকেছি।"

ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকের নানা বিভাগের মধ্য দিয়ে আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই। মানুষের এইটুকু শরীরের তদারকির জন্যে কতরকম যন্ত্রপাতি যে বেরিয়েছে তা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। নিজের দেশের হাসপাতালে তো একটা ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্রপাতি ঠিক থাকে না, আর এখানে এতো কলকব্জা এরা সামাল দেয় কি করে!

শুভা বললেন, "এ আর কি? এখানে রয়েছে বৃহৎ এক আণবিক বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন। আণবিক বিদ্যা শুধু বোমা মারবার জন্যেই ব্যবহৃত হয় না, ডাক্তারিতেও তার নিত্য ব্যবহার।"

"ওসব আমাকে দেখাবেন না, ডক্টর সেন পাকড়াশী। আমরা ভারতীয়রা হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর স্টেথিসকোপটা ঠিক থাকলেই বর্তে যাই।"

"কী বলছেন শংকরবাবু? এখানে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের যন্ত্রপাতি যিনি সামাল দিচ্ছেন তিনি তো আমাদেরই লোক। নিউক্লিয়ার মেডিসিন না দেখুন, অন্তত একজন বিখ্যাত বাঙালী দেখে যান!"

গোপালবন্ধু সাহা ওপার বাংলার মানুষ। জন্ম ও আই-এসসি পর্যন্ত পড়াশোনা চট্টগ্রামে। ১৯৫৯ সালে ঢাকা থেকে বি-এসসি এবং পরের বছরে এম-এসসি। তারপর ফেলোশিপ নিয়ে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওখান থেকেই পি-এইচ-ডি। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত গোপালবন্ধুবাবু আরকানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। পরের তিন বছর পুরো প্রফেসর। এরপর নিউ মেক্সিকোতে, মেডিক্যাল কলেজে প্রফেসর ডিরেক্টর খুব অল্পবয়সে। ১৯৮৪-তে চলে এলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিক ফাউণ্ডেশনে।

শুভা সেন চুপি চুপি বললেন, "মেয়ে এবং গিন্নির চাপে পড়েই নিউমেক্সিকো ছাড়লেন গোপালবন্ধু সাহা। ওখানে কাছাকাছি কোনো বাঙালী পরিবার নেই। মেয়ে বাংলা গান গাইবার জন্যে পাগল। কিন্তু ওখানে বাবা এবং মা ছাড়া কে বাংলা শুনবে?"

কোটি কোটি টাকার জটিল যন্ত্রের সাহায্যে গোপালবন্ধু সাহার গবেষণার বিষয় শুনে আমার মতন আনাড়ি বঙ্গসন্তানের মাথা ঘুরতে আরম্ভ করলো। রিঅ্যাকটর ও সাইক্লোট্রন প্রোডাকশন অফ রেডিও নিউক্লাইডিস থেকে শুরু করে, হাই-পারফরম্যান্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি এবং নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং ইত্যাদি কত সব বিচিত্র শব্দ, যার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি জানি না।

গোপালবন্ধুবাবু অতি অমায়িক ভদ্রলোক। এমনভাবে বসে থাকেন যেন মফস্বলের সরকারী হাসপাতালের ভাঙা স্টেথোসকোপ এল-এম-এফ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর কোনো তফাতই নেই।

আমি বললাম, "আমার মাথা ঠিক থাকছে না সাহামশাই। এতোসব যন্ত্রপাতি, কিন্তু খারাপ হয় না কেন? আপনারা ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র ঠিক রাখেন কি করে? আমাদের দেশে নাড়ি-টেপা ডাক্তাররাই তো এখনও ধন্বন্তরী, উইদাউট এনি যন্ত্রপাতি শ খানেক টাকা ফি-এর চেম্বার অষ্টপ্রহর বোঝাই রেখেছেন।"

গোপালবন্ধু সাহা আশা দিলেন, "হয়ে যাবে। আস্তে-আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। যে-দেশে রবিঠাকুর জন্মেছেন সে-দেশে কিছু আটকে থাকবে না। আমাদের শুধু ধৈর্য ধরে মানুষকে কলকব্জার ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ শেখাতে হবে।"

আমি বললাম, "সায়েবদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠবো না। যন্ত্রপাতি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণে ওদের জন্মগত অধিকার।"

স্বভাববিনয়ী গোপালবন্ধুবাবু চুপ করে রইলেন। কিন্তু সুরসিকা শুভা সেন

পাকড়াশী বললেন, "কি বলছেন শংকরবাবু ? আপনি কি জানেন, আমেরিকান সাহেব-ডাক্তাররা মেডিক্যাল কলেজে কার বই পড়ে নিউক্লিয়ার ফার্মাসি শিখছে ? বইটার নাম হচ্ছে ঃ ফাণ্ডামেন্টাল্‌স্ অফ নিউক্লিয়ার ফার্মাসি। লেখক চাটগাঁইয়া, নাম গোপালবন্ধু সাহা। আর আপনি ধরে নিচ্ছেন, বাঙালীরা কখনই যন্ত্রপাতি ঠিক রাখতে পারবে না !"

গোপালবন্ধু লজ্জা পেলেন। তারপর বললেন, "চিন্তা করবেন না। তেড়ে-ফুঁড়ে লাগলে সব হবে, হতে বাধ্য। অচল গাড়িটাকে ঠেলেঠুলে একটু স্টার্ট দিয়ে দেওয়া, তারপর দেখবেন গাড়ি ছুটছে।" গোপালবন্ধু এবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

নিউ ইয়র্কের চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বসে মিছরিদা মন দিয়ে আমার ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিক পরিক্রমা সংবাদ শুনলেন। আমি কিছুটা হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের দেশের গাড়ি সত্যিই কি কখনও স্টার্ট নেবে, মিছরিদা ?"

আমার দিকে একটা মুখশুদ্ধি বটিকা এগিয়ে দিয়ে মিছরিদা বললেন, "সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগোবার মনোবৃত্তি ছিল না বলেই আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র একদিন মরে গিয়েছিল। আমাদের ডাক্তারিরও সেই অবস্থা হতে চলেছে—নাড়ি টিপে বড়ি বেচার দিন শেষ। মিলেমিশে হাসপাতাল চালানোর বিদ্যেটা ইণ্ডিয়াতেই শুরু হয়েছিল—পৃথিবীর প্রথম হাসপাতাল এই ইণ্ডিয়াতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের স্রোতে এবং উদ্যমের অভাবে আমরা লাস্ট বয় হয়ে গেলাম। শারদ দেওধর তোকে খুব দামী কথা বলেছে—সায়েবরা টিমওয়ার্কের রাজা। আমরা যেদিন টিমওয়ার্ক শুরু করবো মন দিয়ে, সেদিন দেখবি এখানকার সায়েবরাই ছুটবে কলকাতার মাটিয়া কলেজে চিকিৎসা করাতে।"

"সেদিন কবে গো কবে ?" আমি মিছরিদার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

কোন্ এক পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। নিউ ইয়র্কের রাস্তা ধরে সান্ধ্য-পরিক্রমায় বেরিয়ে আমার মনে হলো, বাঙালীর মতন নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে কম সচেতন জাত বোধহয় পৃথিবীতে নেই। নিজের শক্তি সম্পর্কে অতিমাত্রায় অবহিত হলে যেমন

জাতিগত ঔদ্ধত্য গড়ে ওঠে (যার অবশ্যম্ভাবী ফল পতন) তেমন আত্মবিশ্বাসহীন মনুষ্যকুলেরও অবক্ষয় অনিবার্য।

এক প্রচণ্ড অ্যাডভেঞ্চারাস জাতের কপালে কেমন করে কুপমণ্ডুক শিরোপা জুটলো তা সামাজিক ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত।

ম্যানহাটানের পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে মিছরিদা বললেন, "ব্যাপারটা খুব সহজ। দোষটা তোদের, হতভাগা বাঙালী রাইটারদের। প্যানপ্যানে প্রেমের পানসে গপ্পো লিখেই সারা জীবন তোরা নিজেদের ব্যস্ত রাখলি, দুঃসাহসী বেপরোয়া বাঙালীর বিজয়পর্বটা তোরা খোঁজখবর করে বইতে জড়ো করলি না। কিছু মনে করিস না, বাঙালী লেখকদের সমাজচেতনা বড্ড কম। ইতিহাস তোদের লেখায় ঠিকে-ঝিয়ের মতন মাথা নিচু করে বাসন-মেজে যায়—জাতটা তাই প্রাণশক্তি আহরণ করতে পারে না।

"তবু তো বাঙালীকে দাম্ভিক এই অপবাদ সহ্য করতে হয়," আমি মিছরিদাকে মনে করিয়ে দিই।

"যেসব জাত হেরে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, দিশেহারা হয়ে পড়ছে দাম্ভিকতার অম্লরস তাদের পক্ষে প্রয়োজন। তোরা গুজব ছড়াচ্ছিস, বাঙালীর যা কিছু তা ওই গোল্ডেন এজ নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অচেনা-অজানা বাঙালী এই টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতে যা সব কাণ্ড করেছে তার পুরো ইতিবৃত্ত জোগাড় হলে আমাদের শিরদাঁড়া এইভাবে লাউডগার মতন নুইয়ে নরম হয়ে পড়তো না।"

"মিছরিদা, আপনি বাঙালী ডাক্তার আর বাঙালী খালাসীর কথা লিখতে বলছেন আমাদের?"

"কেন নয়? এরাই তো সেই আদ্যিকাল থেকে দুনিয়াটাকে বুড়ো আঙুলের কাছে এনে ফেলেছে। পানামা, আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়া, ইউ-এস-এ, কানাডা, বাহামা—দুনিয়ায় কোথায় তুই বাঙালী ডাক্তার অথবা জাহাজ-পালানো খালাসি দেখবি না? এরা তো ইউরোপীয় সাহেবদের মতনই বিশ্ববিজয় করেছে, কিন্তু আমরা কোনো স্বীকৃতি দিইনি। দিলে লাভ হতো। আমাদের ছেলেগুলো হাফ-হিজড়ের মনোবৃত্তি ত্যাগ করে পুরুষসিংহের মতন গর্জন করতো। দুনিয়ার লোক আমাদের একটু সমীহ করে চলতো, কথায়-কথায় মাথায় চাঁটি মারবার আগে একটু ভেবে-চিন্তে দেখতো।"

হঠাৎ মিছরিদা থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি নিউ ইয়র্ক রাজপথের একটি সাইনবোর্ডে নিবদ্ধ। দর্শনের নিষ্ঠা দেখে মনে হচ্ছে মিছরিদা লাইফে প্রথম তাজমহল দেখছেন। মিছরিদা বিড় বিড় করলেন, "দ্যাখ, দ্যাখ! সাইট ফর দ্য গড্‌স! কলকাতায় বাংলা সাইনবোর্ড নির্বংশ হতে চলেছে, আর এখানে

বঙ্গসন্তানরা কী করছে একবার পরান ভরে দেখে নে! সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।"

সত্যিই দেখার জিনিস। বাংলা ভাষায় নিউ ইয়র্কের দোকানের মাথায় জ্বল জ্বল করছে, "কৈ মাছ ও পাবদা আছে।"

মিছরিদা চোখটা একটু মুছে নিলেন, বোধহয় নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"কী দেখছেন দাদা?" আমাদের দুজনকে বাংলায় কথাবার্তা বলতে শুনে আর এক বঙ্গসন্তান ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

"আমাদের কলকাতায় বাংলায় সাইনবোর্ড উঠে গিয়েছে, তাই ভাই প্রাণভরে দেখছি, কিছু মনে করবেন না।"

এই ভদ্রলোক বাংলাদেশী মুসলমান। বললেন "আর একটু এগিয়ে যান। ফার্স্ট অ্যাভিনিউ ও সেকেণ্ড অ্যাভিনিউয়ের মধ্যে সিক্সথ স্ট্রীটে পুরো রাস্তা ধরে অন্তত বারোখানা বাঙালী দোকান দেখতে পাবেন। সবই শিলেটি, যদিও লেখা আছে ইণ্ডিয়ান ফুড।"

"আহা কী সব নাম!" মিছরিদার চোখ দিয়ে প্রায় জল বেরিয়ে আসে আর কী। "শা বাগ, আনার বাগ, মিতালী, শ্যামলী, মিনার, মিলনী, এটসেটেরা, এটসেটেরা।"

আমাদের নতুন বন্ধু বললেন, "আপনার উচিত মুনীর আমেদের সঙ্গে দেখা করা—একটা পুরো রেস্তোরাঁ-চেনের প্রতিষ্ঠাতা।"

"আহা! প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালী!" মিছরিদা নিজের অনুভূতি চেপে রাখতে পারলেন না। খুব দুঃখ হলো, কী কুক্ষণে আমরা দামী ডলারগুলো চীনের দোকানে দিয়ে এলুম আমাদের জাতভাই থাকতে। পুঁইশাক দিয়ে দুটো ভাত মেখে খাওয়া যেতো।"

পথের বন্ধু বললেন, "দূর দেশ থেকে এসে নিউ ইয়র্ক শহরে রেস্তোরাঁ চালানো সোজা কাজ নয়। অনেক হাঙ্গামা। মাফিয়াদের হাত না করলে রেস্তোরাঁ দুদিনেই ডকে উঠবে। তবে জেনে রাখুন, এমন বাঙালী এখানে আছেন, মাফিয়ারা যাকে ভয় করে চলে।"

"বলেন কি মশাই? দু' একজনকে রি-এক্সপোর্ট করুন না আমাদের কলকাতায়!" মিছরিদা আন্তরিক আবেদন জানালেন।

বন্ধু বললেন, "থেকে যান সপ্তাহখানেক, একখানা নবেলের মেটিরিয়াল পেয়ে যাবেন। সেক্স, ভায়োলেন্স, এফ-বি-আই, ব্ল্যাকমেলিং সব কড়া ডোজে পেয়ে যাবেন এক একখানা দোকানকে কেন্দ্র করে।"

মিছরিদা বললেন, "আমার এই বন্ধু ক্যালকাটার রাইটার—ওঁরা প্যানপেনে

প্রেম ছাড়া লেখায় কিছুই সামলাতে পারেন না! আমাদের খোঁজ করতে হবে অ্যাডভেঞ্চার রাইটারদের। তা গপ্পোটার আউটলাইন কী রকম হতে পারে? আমার ভাইঝিগুলো বড় না হয়ে উঠলে আমি নিজেই ট্রাই নিতাম।"

বাংলাদেশী বন্ধু বললেন, "ধরুন, এমন একটা ক্যারাকটার করলেন যে বাংলাদেশ থেকে এদেশে ইস্কুলে পড়তে এসে সুবিধে করতে পারলো না।"

"প্রথমেই ফেলিওর দিয়ে শুরু করতে বলছেন? অবশ্য সব ব্যাপারে ফেলিওর হবার জন্যেই তো বাঙালীদের সৃষ্টি।"

বাংলাদেশীটি সুরসিক। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "সাফল্যের ছাদকে ধরে রাখবার জন্যে অনেক ব্যর্থতার থাম দরকার হয়, দাদা।"

"অকাট্য যুক্তি! বলে যান ভাই," মিছরিদা গ্রীন সিগন্যাল দিলেন।

খুশি হয়ে বাংলাদেশী বললেন, "ফরিদপুর কিংবা বরিশাল থেকে আপনি হাজির হলেন নিউ ইয়র্কে। শুরু করলেন রেস্তোরাঁ-বয়ের জীবন। একটু চান্স পেয়ে একখানা দোকানের অংশীদার হলেন—গা-গতর আমার, সম্পত্তি তোমার। এদেশে সম্পত্তির অভাব নেই, টানাটানি গা-গতরের। গতরের ময়দায় যদি একটু মগজের ময়ান মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই।"

"চমৎকার বলেছেন ভাই," উৎসাহ পাচ্ছেন মিছরিদা।

বাংলাদেশী বললেন, "মনে করুন আপনার খাবারের দোকান তেমন চলছে না। বড্ড ছটফটে জাত এই আমেরিকান। ওদের নজর টানা বড্ড কঠিন কাজ। চীনারা একসময় নজর টেনেছিল। এখন ইণ্ডিয়ানদের জয়জয়কার, কিন্তু এর পিছনে রয়েছে এই বাংলাদেশী প্রেম। দোকানে লোক টানবার জন্যে এই ইস্কুল-পালানো ছোকরা এক কাণ্ড করে বসলো—দেশ থেকে একখানা সাইকেল-রিকশ এনে হাজির করলো কিউরিও হিসেবে এবং এই রিকশটাই সাজিয়ে রাখলো প্রধান আকর্ষণ হিসেবে। হাতে হাতে ফল। এই রিকশ দেখবার জন্যে সমস্ত নিউ ইয়র্ক ভেঙে পড়তে লাগলো তার দোকানে।"

"এ জানলে খান দশেক সাইকেল-রিকশ ভাঙা অবস্থায় মনে এখানে জুড়ে নিতাম। এতে হাওড়ার ট্রাফিক জ্যামও একটু কমতো আর এখানেও টু-পাইস কামানো যেতো।" মিছরিদার আক্ষেপ।

"এখন আর কাজ হবে না। যা কিছু ভাল ফল হয় তা প্রথম বারে। যে ফার্স্ট করতে পারবে সে মালা পাবে। তারপর কেউ তাকিয়ে দেখবে না, এই হচ্ছে এদেশের চরিত্র। দ্বিতীয়র কোন সম্মান নেই এখানে, তাই সবাই প্রথম হবার নেশায় মেতে আছে।".

"তা রিকশ থেকে শেষ পর্যন্ত রোলস রয়েস হলো?" জানতে চাইলেন মিছরিদা।

সুরসিক বাংলাদেশী বললেন, "পয়সা হতে বাধ্য। এবং সেই পয়সায় বেঙ্গলী বুটিক চালু হলো, শুরু হলো ডিসকোথেক।"

"বোঝা যচ্ছে, বিদেশে বাঙ্গালী ব্যর্থ হয় না," মিছরিদার মন্তব্য।

বাংলাদেশী বললেন, "এর পরেই তো জমে উঠবে শংকরবাবুর গপ্পোটা। মাফিয়াদের সঙ্গে মিশছে এক বঙ্গসন্তান। এবং তারপর হঠাৎ একদিন..."

"বেচারা বঙ্গসন্তান খুন হয়ে গেলো, এই তো," আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। এইসব গল্পের শেষটা আন্দাজ করতে আমার একটুও কষ্ট হয় না।

"থাম থাম," বকুনি লাগালেন মিছরিদা। "তোদের কলকাতার গপ্পে ওরকম হতে বাধ্য কারণ তোরা হেরো-হেরো ডাক তুলেই সমস্ত জাতটাকে সত্যিই হারিয়ে দিলি। প্লিজ, ওই সোনারচাঁদ বাঙালীটা যদি এখানে খুন হয়েও থাকে তা এই ছোকরাকে বলবেন না। সমস্ত জাতটাকে আর একবার কাঁদিয়ে সাহিত্যিকের কেরামতি দেখাবে, কিন্তু জাতের কোনো কাজে লাগবে না।"

বাংলাদেশী বললেন, "এর পরেই তো নাটক। মাফিয়ার বোনের সঙ্গে আমাদের ভাইয়ের ভাব-ভালবাসা হলো। তারপর মাফিয়ার বোন একদিন সিভিল ম্যারেজ করে বসলো আমাদের ভাইয়াকে। বললে খুনোখুনি লুটোপাটিতে অরুচি হয়ে গিয়েছে, এখন আমি স্বামীর হাত ধরে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চাই।"

খুব খুশি হচ্ছেন মিছরিদা। নির্দেশ দিলেন, "মাফিয়ার মেয়েগুলোর শরীরস্বাস্থ্য কেমন হয়, জামাকাপড় কেমন পরে এসব ডিটেল তুই ভাল করে শুনে নে, দেশে গিয়ে তোকে এই বিষয়েই লিখতে হবে। প্রত্যেক মাফিয়াকে এখন থেকে প্রত্যেক বাঙ্গালী 'শালা' বলতে পারে, অথচ তাতে কোনো অন্যায় হবে না।"

বাংলাদেশীর মুখে জানা গেলো, বিয়ের পরেই অনেক হাঙ্গামা হয়েছে। এফ-বি-আই নাকি জামাইবাবুর সঙ্গে যোগসাজশ রেখেছিলেন। এই এক মজা এই দেশে। যেখানেই যাওয়া যায় সেখানেই পুলিশের ইনফর্মারের খবর পাওয়া যায়। দুষ্টজনেরা সন্দেহ করেন, প্রায় প্রত্যেক অসামাজিক ব্যক্তিই পুলিশের টাকা খাচ্ছে!

মাফিয়ারা নাকি বাংলা-মার্কিন বিবাহ সম্পর্কে খুশি হয়নি। তারা একদিন আচমকা হাজির হয়ে জামাইয়ের দোকান ভাঙচুর করলো।

"এর পরেই খুনের অধ্যায়টা তো?" আমি আন্দাজ করতে পারি সহজেই।

কিন্তু বাংলাদেশী ভদ্রলোক আমাকে আবার নিরাশ করলেন। করিৎকর্মা না হলে এরপরেই খুন হতেন ভদ্রলোক। কিন্তু কৌশল জানলে এদেশে কোনো চিন্তা নেই! বাংলাদেশী জামাইবাবু এবার সোজা খবরের কাগজের শরণাপন্ন

হলেন। বড় বড় হেডলাইনে বিখ্যাত সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হলো, মাফিয়ারা একজন বাংলাদেশীকে খুন করতে চায়। যাকে বলে কিনা একেবারে আমেরিকান টাইপের পাবলিক রিলেশনস। সেই সঙ্গে একটু-আধটু দিশী মশালা —দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশের মিলিটারি সিক্রেট চুরির প্রচেষ্টার সঙ্গে এর কি কোনও যোগ আছে? ইত্যাদি।

কাগজে কোনো রিপোর্ট বেরুলে এখানে কর্তাদের টনক নড়ে। ফলে জামাইবাবু প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পেলেন, তিনি এখন ভালই ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছেন। অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ সাফল্যকাহিনী।

বাংলাদেশী বন্ধু বললেন, "গল্পটা যদি আরও নাটকীয় করতে চান, আর একটা ক্যারাকটার পাশাপাশি নিয়ে আসুন। নিঃসঙ্গ মুসলিম বঙ্গসুন্দরী এখানকার অ্যাপর্টমেন্টে বসবাস করেন। স্বদেশের কোনো এক মহাশক্তিমান রাজপুরুষ তাঁকে গোপনে বিবাহ করে ঝামেলা কমাবার জন্যে মোটা খরচে নির্বাসিতার জীবনযাপনে বাধ্য করেছেন। এই মহিলা এখন গোপন বিবাহের সংবাদটি ফাঁস করে সতীনের দেমাক কমাতে চান। দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।"

মিছরিদা গুজগুজ করে এই নতুন বন্ধুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। তারপর ঘোষণা করলেন, "মিছে রবিঠাকুর আমাদের কলকাতায় জন্মেছিলেন! তোরা সাহিত্যিকরা দুটো রেস্তোরাঁর ভাল নামও দিতে পারিস না। কলকাতার সব রেস্তোরাঁর নাম বিদেশ থেকে চুরি করা। আর যত চমৎকার অরিজিন্যাল নাম এই নিউ ইয়র্কে। লিখে নে একটা রেস্তোরাঁর নাম, যত শুনছি তত প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে—'নির্বাণ অন্ রুফটপ'! আহা! নামটা কয়েকবার আবৃত্তি করলেই নির্বাণত্বের দিকে মন টানবে। শুনছি একই স্টাইলে রয়েছে—'নিরভানা অন্ টাইম স্কোয়ার', 'নিরভানা অন সেন্ট্রাল পার্ক'। এই স্টাইলের নাম হলে তোকে দোকানের ঠিকানা মনে রাখতে হবে না। আমাদের ওখানে হওয়া উচিত ছিল—গাঙ্গুরাম অন গোলপার্ক, গুপ্তাজী অন গড়িয়াহাট, বিনোদ অন বি-বি-ডি বাগ, ভীমনাগ অন মহাত্মা গান্ধী রোড, ভিয়েন অন সেক্সপীয়ার সরণী, এটসেটেরা এটসেটেরা!"

মিছরিদার খুব ইচ্ছে ছিল মাফিয়াদের জামাইবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলেন। কিন্তু ভদ্রলোককে পাওয়া গেলো না। মিছরিদা বললেন, "আবার যদি কখনও এ-দেশে আসবার সুযোগ পাস তা হলে ওঁকে ইন্টারভিউ করবি। দেশের লোকেরা এইসব মানুষের কথাই তোদের কাছ থেকে জানতে চায়।"

সেদিন জয় ও মলির ম্যানহাটান অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে

দুঃসাহসী বাঙালীদের কথা নিজের খাতায় লিখলাম। বাঙালীরা শুধু রেস্তোরাঁ চালায় না, তারা এখন ট্যাক্সিচালক, নিউজস্ট্যান্ডের মালিক। ওষুধের দোকানেও যথেষ্ট প্রতাপ বাংলাদেশীদের। ফার্মাসি বিদ্যাটা আমাদের সহজে এসে যায়।

এক ভদ্রলোক বললেন, "কখন যে কি হয়ে যায় ঠিক বোঝা যায় না। এক ফার্মাসিতে যেতাম, সেখানে সায়েব আছেন ও সেই সঙ্গে এক বাঙালী। আমার বাঙালী নাম দেখে ছোকরা যেচে এসে কথা বলতো। বিদেশে নিজের দেশের লোক দেখলে বাঙালীদের ব্রেক ফেল করে হুড়মুড় করে অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে যায়। আমি কয়েকবার গিয়েছি, সাহেবের কাছে প্রেসক্রিপসন দেওয়া সত্ত্বেও এই বাঙালী ছেলেটি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে।

গত সপ্তাহে আবার দোকানে গেলাম। দেখি সায়েব নেই, ওই বাঙালী ছোকরাই ঝাঁপ খুলেছে। ভাবলুম, জিজ্ঞেস করি, সায়েব মালিক কোথায়? এখনও আসেননি কেন?

কিন্তু উত্তর শুনে আমি তো তাজ্জব! বিনীতভাবে ছোকরা আমাকে জানিয়ে দিল, দোকানের মালিক সে নিজেই। সায়েবকে সে চাকরিতে রেখেছে মাইনে দিয়ে। সায়েব ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছিল তাই এবার বিদায় করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

মার্কিন মুলুকে বাঙালীর নিজস্ব অ্যাডভেণ্চার কবে শুরু হয়েছিল তা ঠিকমতন খোঁজ করে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে এ বিষয়ে ক্লিভল্যাণ্ড আমার আশ্রয়দাতা ডক্টর রণজিৎ দত্তর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল। চিরকুমার রণজিৎবাবু পেশায় বৈজ্ঞানিক, কিন্তু নেশায় ঐতিহাসিক। ওঁর সংগ্রহে মহেঞ্জোদরোর একটি মৃৎপ্রদীপ আছে।

রণজিৎবাবু এবারের নর্থ আমেরিকান বাঙালী সম্মেলন উপলক্ষে ক্লিভল্যাণ্ডের আদিবঙ্গীয় সমাজ সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর করেছেন। ১৮৮০ সালের আদমসুমারিতে দেখা যাচ্ছে ওই শহরের এক লক্ষ ষাট হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ন'জন ভারতীয়, এঁদের মধ্যে কয়েকজন যে বাঙালী ছিলেন তা অবশ্যই ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১৯২০ সাল নাগাদ অবশ্য ১০/১২ জন বাঙালীর খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের কয়েকজনের সঙ্গে বহু বছর পরে (১৯৬০ সাল নাগাদ) কথাবার্তা বলে অনেক দুঃখের কথা জানা যায়। এই সব বাঙালী মুসলমান জাহাজ থেকে পালিয়ে এই শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুঃখ, হতাশা ও নির্জনতা ছাড়া তাঁদের জীবনে বিশেষ কিছু ছিল না। কেমন করে এদেশে এসেছেন তা এঁরা কেউ বলতে চাইতেন না, এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতেন সকলকে!

বশিক-এর কথাই ধরা যাক। এঁদের জাহাজের ইঞ্জিনে কিছু গোলোযোগ দেখা যায়। জাহাজ সারাতে-সারাতে অনেক সময় লাগলো—বরফজমা শীতে গ্রেটলেকস ততক্ষণে জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তখন খালাসিদের টাকা দেওয়া হলো নিউ ইয়র্কে যাবার জন্যে এবং সেখান থেকে কলকাতার জাহাজ ধরা যাবে। সেই টাকা নিয়ে অ্যাডভেণ্চারপ্রিয় বশিক আমেরিকার জনসমুদ্রে মিশে গেলেন, দেশে ফেরা হলো না।

মজিদ আমেরিকায় এসেছিলেন পানামায় এক দূরসম্পর্কের ভাইয়ের ভরসায়। ক্লিভল্যাণ্ডে এসে শুনলেন, পানামা এখান থেকে অনেক দূর। খেয়ালের বশে ভদ্রলোক এখানেই থেকে গেলেন, পানামা গিয়ে ভাইকে আর খুঁজে বার করা হলো না।

এই সব দিকহারা ঘরছাড়া বাঙালী মুসলমান ইস্ট নাইনটি ফাইভ স্ট্রীটে ছোটখাট দোকান অথবা রেস্তোরাঁ চালাতেন এবং যথাসময়ে মেমসায়েব বিয়ে করতেন। কিন্তু মেম বিয়ে করলেও, এঁদের ধর্মীয় নিষ্ঠায় ভাঁটা পড়তো না। নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতন এঁরা মদ স্পর্শ করতেন না, শুয়োর খেতেন না এবং নিয়মিত নামাজ পড়তেন। রোজার সময় চলতো উপবাস।

রসিদ আলির কথাই ধরুন। খিদিরপুর থেকে কত বছর বয়সে বিদেশে পালিয়ে এসেছিলেন তা নিজের স্মরণে নেই। পাকেচক্রে একদিন লেক ইরির ধারে জাহাজ ভিড়লো এবং রসিদ আলির নতুন পলাতক জীবন শুরু হলো। মুসলিম জীবনযাত্রার সঙ্গে এই সমাজের কোনও পরিচয়সূত্র ছিল না।

রসিদ আলি এখানে বিবাহ করলেন, পুত্রকন্যার জনক হলেন, কিন্তু এই সমাজের সঙ্গে নিজের ধর্মীয় আচার নিয়ে মিশে যেতে পারলেন না। তাঁর নামাজ পড়া, তাঁর মদ ও শূকর মাংসে অনীহা বিদেশী প্রিয়জনদের ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে রইলো। তারপর এই ব্যঙ্গ ও অসম্মান এমন তীব্র হয়ে উঠলো যে বিয়ের পঁচিশ বছর পরে রসিদ আলি একদিন ঘরসংসার ত্যাগ করে আবার বিবাগী হলেন। বেশ কিছুদিন পরে ১৯৬০ সালে ক্লিভল্যাণ্ডের এক পোড়ো বাড়িতে তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেলো। পুলিশের মতে কয়েকদিন আগে কঠিন নিউমোনিয়ায় নিঃসঙ্গ রসিদ আলির মৃত্যু হয়েছে।

রণজিৎবাবু আরও তিনজন বাঙালী মুসলমানের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছেন। সেন্ট ক্লেয়ার-এ জব্বর-এর একটা পুরনো জিনিসের দোকান ছিল। খালেদ চালাতেন পূর্ব ক্লিভল্যাণ্ডে একটা মুদিখানার দোকান। ওয়েণ্ড পার্কে জামালের রেস্তোরাঁ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত রম রম করতো।

আরও দুই মুসলমান ভাইয়ের খবর পেয়েছিলাম রণজিৎ দত্তর কাছে। ১৯২৭ সালে হামিদ ও গণি আব্দুল আমাদের এই হুগলি থেকে বেরিয়ে ভায়া

খিদিরপুর এবং লণ্ডন হয়ে এই ক্লিভল্যাণ্ডে হাজির হয়েছিলেন, আর ফেরেননি। এঁরা স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হন। হামিদ সম্পর্কে হয়তো বিশেষ কিছু লেখবার থাকতো না যদি না তিনি এক বিখ্যাত আমেরিকানের পিতা হতেন। ১৯৩৩ সালে হামিদের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর ছেলে রউলের বয়স চার। রউল এখন নিউ ইয়র্ক শহরের বাসিন্দা, খ্যাতনামা কনসার্ট বাদক, গায়ক এবং সঙ্গীত সমালোচক।

দ্বিতীয় প্রজন্মের বামারিকান (বাঙলা-আমেরিকান—ডাঃ রণেশ চক্রবর্তীর ভাষায়) হিসেবে এক অসাধারণ উপন্যাসের নায়ক হতে পারেন এই রউল, যিনি নিজেকে ব্ল্যাক আমেরিকানদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের লেখক এই হুগলি-সন্তান রউল—ফেমাস ব্ল্যাক এনটারটেনার্স অফ টুডে (১৯৭৪), ব্ল্যাকস ইন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক (১৯৭৭), কালা কবিতার তিন হাজার বছর (১৯৭০) ইত্যাদি।

রউলের কাকা গণি দেহরক্ষা করেন ১৯৬২ সালে। তাঁর অন্ত্যেষ্টির সময় মুসলিম এবং খ্রীষ্টিয় রীতি দুই-ই পালন করা হয়েছিল।

খুব ইচ্ছা ছিল রউলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের। রণজিৎবাবু ক্লিভল্যাণ্ড থেকে নিউ ইয়র্কে ফোনও করেছিলেন। কিন্তু রউল তখন ইউরোপে যাচ্ছেন, ওঁর সঙ্গে এ-যাত্রায় দেখা করাটা আমার কপালে নেই।

কিন্তু রণজিৎ দত্ত উৎসাহ দিয়েছিলেন, "দুঃখ করবার কিছু নেই। রউল সায়েবকে না পেলেন তো কি হয়েছে ? আপনাকে খোন্দকার আলমগীরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবো ? খোন্দকার আলমগীরের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলে নিউ ইয়র্কের বঙ্গীয়সমাজ সম্পর্কে আপনার কী অজানা থাকতে পারে।"

মৃদু হেসে রণজিৎবাবু বললেন, "আমি রিপিট করছি—খোন্দকার আলমগীর ইজ খোন্দকার আলমগীর।"

খোন্দকার আলমগীরের খবর না পেলে আমার এবারের বিদেশ ভ্রমণ সত্যিই অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। বিপ্লবী বাঙালী এখন মৃত আগ্নেয়গিরির মতন, এ কথা যাঁরা বলে থাকেন তাঁদের উচিত ডাক্তার আলমগীরের মতন তেজস্বী পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

খোন্দকার আলমগীরের প্রসঙ্গ উঠলো ক্লিভল্যাণ্ডে। আমি প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করছি শুনে এক বন্ধু বললেন,

"প্রবাসে বাঙালীর সাফল্য যেমন আপনাকে আকৃষ্ট করছে তেমন বিদেশে বিফল বাঙালীদেরও একটু স্থান করে দেবেন আপনার লেখায়।"

বামারিকান মানেই রোজগেরে উচ্চশিক্ষিত বাঙালী আমেরিকান মিলিয়নেয়র নয়। বামারিকান বিধবা চোখের জল ফেলে অমানুষিক পরিশ্রমে নাবালক সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলছেন, বামারিকান বৈজ্ঞানিক যোগ্য চাকরি না পেয়ে ডিমার্টমেন্টাল স্টোরে মোট বইছে, বামারিকান ডাক্তার প্রয়োজনীয় স্বীকৃতির অভাবে দারোয়ানের কাজ করছে, বামারিকান অভাগা বড় বড় শহরে ট্যাক্সি চালাচ্ছে বিত্তবান মানুষের এই মহাতীর্থে।"

এই বন্ধুই বলেছিলেন, "গরিব দুভার্গা বাঙালীর প্রকৃত বন্ধু বলতে বোঝায় খোন্দকার আলমগীরের মতন মানুষদের। যেসব বাঙালীর ইনসিওর নেই, সরকারী স্বীকৃতি নেই, ইমিগ্রেশন ইনসপেক্টর যাকে ধরবার জন্যে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের অসুখ করলে দেখাশোনা করার যে দু'একজন লোক নিউ ইয়র্কে আছেন তাঁদের মধ্যে আলমগীর কবীর একজন। মাস তিনেক ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। বাঙালী কষ্ট সইতে পারে না, বাঙালীর ধৈর্য নেই ইত্যাদি যারা বলে তাদের যোগ্য উত্তর আপনি ডজনে-ডজনে খুঁজে পাবেন।"

"কে এই খোন্দকার আলমগীর ?"

"এক বাঙালী ডাক্তার। অনেকদিন আমেরিকায় এসেছেন। কয়েক মিলিয়ন ডলার কামিয়ে কেষ্টবিষ্টু হয়ে মনের আনন্দে ভোগসুখে ডুবে থাকতে পারতেন, কিন্তু বুকের মধ্যে সারাক্ষণ দেশের মানুষের জন্যে ভালবাসার আগুন জ্বলছে। কোনো কষ্টকেই তোয়াক্কা করেন না।"

এই ধরনের মানুষের একটাই সমস্যা হয়। এঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেন না। এঁরা কখন যে কোন্ ব্যাপারে বেঁকে বসবেন তা ঠিক আন্দাজ করা যায় না, তাই অনেকে এঁদের একটু দূরে-দূরে রাখতে চান। সারাক্ষণ সত্যি কথা শুনবার জন্যে এই দুনিয়া তৈরি হয়নি, যাঁরা সদা-সত্যের লাইনে যাবেন তাঁদের কপালে অবশ্যই অনেক কষ্ট !

শুনলাম আলমগীর ক্লিভল্যাণ্ডের বঙ্গ সম্মেলনে আসবেন, সুতরাং নিউ ইয়র্কের জন্যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যাবে। এ-দেশে ডাক্তারের সময় মহামূল্যবান, যখন-তখন ডাক্তারবাবুকে চাইলেই পাওয়া যায় না, তিনি আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্টের জালে বন্দী।

নর্থ আমেরিকান বঙ্গ সম্মেলনে নানা কৃতি বাঙালী সপরিবারে এসেছেন। এঁদের স্ত্রীরাও অনেকে বিদুষী এবং বলা বাহুল্য সুন্দরী। এইসব সুবেশিনী বাঙালী রঙিন প্রজাপতির মতন স্বামীর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রবাস তাঁদের ব্যক্তিত্ব দিয়েছে, স্বচ্ছলতা দিয়েছে, আত্মবিশ্বাস দিয়েছে আর দিয়েছে মুক্তির

স্বাদ যা জন্মভূমিতে এতো সহজে এইভাবে পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না।

সম্মেলনের সভার কাজ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সময় মঞ্চ থেকে একটি অপূর্ব দৃশ্য আমার চোখে পড়ে গেলো। একজন বেঁটে সাইজের শ্যামবর্ণ বাঙালী কোলে করে এক শাড়ি পরিহিতা গৌরী বঙ্গতনয়াকে হলের মধ্যে নিয়ে এসে একটি চেয়ারে অতি সাবধানে বসিয়ে দিলেন। তারপর পরম স্নেহে তাঁর দেখাশোনা করতে লাগলেন। তেমন শারীরিক অসুস্থতা থাকলে সাধারণত এই ধরনের সম্মেলনে কেউ আসেন না। কিন্তু এই মহিলাটি তাঁর সঙ্গের ভদ্রলোকের পক্ষচ্ছায়ায় সভার কাজকর্ম পরমানন্দে উপভোগ করতে লাগলেন। স্বদেশ ও সংস্কৃতির প্রতি এমন অনুরাগ নজরে পড়ে না বলেই হয়তো দূর থেকে আমি এই দৃশ্য মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

তারপর শুনলাম, ভদ্রমহিলাও ডাক্তার। গুরুতর অপারেশন ইত্যাদির পরে এখনও সুস্থ নন, কিন্তু বাঙালী সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। তাই সুদূর নিউ ইয়র্ক থেকে স্বামীর সঙ্গে মোটর গাড়িতে ওহায়ো রাজ্যের এই ক্লিভল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়েছেন।

আমি দূর থেকে দেখলাম, স্ত্রীকে চেয়ারে বসিয়ে অসীম ধৈর্য সহকারে ওই ভদ্রলোক আবার কাগজের কাপে ঠাণ্ডা পানীয় সংগ্রহ করে আনলেন। কাকে যেন বললেন, "আমাকে দুপুরে একটু নুন ছাড়া খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে হবে।"

আমার তখন সভার কাজকর্মের দিকে তত মন নেই, আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে এই দুটি মানুষের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার এবং পুরুষ মানুষটির সস্নেহ দায়িত্ববোধের নমুনা সংগ্রহ করছি। ভদ্রলোক এক মুহূর্তের জন্যেও বিরক্ত নন, অধৈর্য নন, এই ধরনের বোঝা থাকায় তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ বলে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন।

মানুষটি সম্বন্ধে আমার যখন গভীর শ্রদ্ধা জাগরিত হচ্ছে সেই সময়েই হলঘরের বাইরে রণজিৎ দত্ত আলাপ করিয়ে দিলেন, "এই নিন আমাদের খোন্দকার আলমগীরকে।"

"দুঃখিনী বঙ্গজননীর আদর্শ সন্তান।" এই বিশেষণ আমার মুখে শুনে লজ্জা পেলেন খোন্দকার আলমগীর। বললেন, "আসুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

শ্রীমতী আলমগীরও শারীরিক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আমি মনে-মনে ভাবলাম স্বদেশে সিগারেট কোম্পানির বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞরা মেড-ফর-ইচ-আদার দম্পতি হিসেবে যেসব আমোদিনী রমণী ও তাঁদের স্বামীদের বিজ্ঞাপিত করেন সেই তুলনায় সহস্রগুণ আকর্ষণীয় এই আলমগীর-দম্পতি—কোনো অবস্থাতেই এঁরা পরস্পকে অবহেলা করতে প্রস্তুত

নন। অথচ এই ভালবাসা এসেছে প্রসন্ন প্রীতির প্রসার থেকে, কর্তব্যবোধ অথবা চক্ষুলজ্জা থেকে নয়।

আলমগীর বললেন, "বাঙালীকে জাগান, বাঙালীকে বিজয়ী হতে বলুন—আমাদের সামনে তেমন কোনো বাধা তো দেখছি না। শুধু লক্ষ্য রাখবেন আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি যেন বিপন্ন না হয়।"

আমি বললাম, "ওই সব বাংলাদেশী অভাগা, যারা আইনসম্মত পথে এদেশে ঢোকেনি, যারা লুকিয়ে-লুকিয়ে নিউ ইয়র্কে ট্যাক্সি চালায়, তাদের কথা শুনতে চাই আলমগীর সায়েব।"

"কোনো অসুবিধে নেই। থাকুন আমার সঙ্গে কয়েক মাস। চোখের সামনে দেখুন। আসুন নিউ ইয়র্কে। এই নিন আমার ঠিকানা।"

একজন চুপি-চুপি বললেন, "আশ্চর্য মানুষ। চিকিৎসার মাধ্যমে যে কত মানুষের উপকার করেন। নিজের শরীরও তেমন ভাল নয়। বাড়িতে স্ত্রীর এই অবস্থা। কী অসাধারণ চেষ্টা করে মানুষটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমাদের দেশ হলে এতদিন বাঁচার কথাই উঠতো না। এইসব চাপে অন্য মানুষ হলে কোথায় ভেসে যেতো। কিন্তু আলমগীর এরই মধ্যে বাঙালীদের জন্যে ভেবে চলেছেন, কাজ করে চলেছেন অক্লান্তভাবে। দেশের সাহিত্যের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছেন। আলমগীরকে দমিয়ে রাখবার ক্ষমতা বোধ হয় ঈশ্বরেরও নেই।"

সভার শেষে দেখলাম খোন্দকার আলমগীর আবার তাঁর স্ত্রীকে বহন করে এক সভাগৃহ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অন্য এক সভাগৃহের দিকে চলেছেন। ওই অবস্থাতেও পরমানন্দে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বক বক করে চলেছেন। এই মহিলা শরীর সম্পর্কে যতই ভাগ্যহীনা হোন না কেন স্বামী সম্পর্কে পরম সৌভাগ্যবতী!

নিউ ইয়র্কে এসেই খবর পেলাম আলমগীর সায়েব আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন নিজের বাড়িতে। প্রথমে একটু দ্বিধা হচ্ছিল। এই দেশে যে কাজের লোকজন পাওয়া যায় না এবং সব কাজকর্ম যে নিজেকেই করতে হয় তা আমার অজানা নয়। এমতাবস্থায় একজন সদাশয় ভদ্রলোককে এইভাবে বিরক্ত করাটা কি সমীচীন হবে? যাঁরা আলমগীরকে জানেন তাঁরা বললেন, "ওইসব কিন্তু-ফিন্তু কাটিয়ে ওখানে হাজির হোন, উনি যখন ঠিক করেছেন আপনাকে নিজের বাড়িতে খাওয়াবেন তখন খাওয়াবেনই।"

আলমগীর সায়েবের ছবির মতন বাড়িটি একটি খালের ওপর। অঞ্চলটির নাম ফ্রি পোর্ট, খালে যখন জোয়ার আসে তখন পথঘাট জলে বোঝাই হয়ে যায়। বাড়ির পরিকল্পনা এমনই যেপিছন দরজা থেকেই আপনি নৌকাবিহারে

রওনা হতে পারেন। ভদ্রলোকের ইয়াটিং বাতিক আছে কিনা তা অবশ্য জানা হলো না। ধরুন জায়গাটা হলো নিউ ইয়র্কের ভেনিস!

আলমগীর সায়েবের বাড়িতে আর-একটি যুবককে দেখলাম। আতিথ্যকর্মে সাহায্য করার জন্যেই এই যুবকটিকে তিনি আজ নিমন্ত্রণ করেছেন। আমরা পৌঁছবার পরেই নিকটবর্তী এক চাইনীজ দোকানে আলমগীর ফোন করে দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই যুবকটিকে ওই খাদ্য সংগ্রহে পাঠালেন। নিজেও কয়েকটি পদ রান্না করে রেখেছেন। এমন ভাব দেখালেন যেন এতো সব যন্ত্রপাতি রয়েছে যে রান্নাটা এখানে কিছুই নয়।

শ্রীমতী আলমগীরও আমাদের আড্ডাসভায় অতীব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেন। মনে হলো, এঁদের যাকে বলে 'লাভম্যারেজ' তাই। ভদ্রলোক সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই ফায়ারব্র্যাণ্ড ছাত্র নেতা। এই আগুনের কাছেই অসামান্য সুন্দরী ডাক্তার-মহিলা নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন এবং এক সময় রাজনৈতিক কারণে প্রায় বাধ্য হয়েই বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন।

"কিন্তু দেশ থেকে তাড়িত হলেও মন থেকে দেশকে তাড়ানো যায় কি?" প্রশ্ন তুললেন খোন্দকার আলমগীর।

কঠিন প্রশ্ন। অনেকে দূরে সরে গিয়ে দেশকে ভুলতে পেরেছে—এমন মানুষ এই মার্কিন মুলুকে ভুরি ভুরি রয়েছে। যেমন ধরুন ইহুদিদের কথা। এদের অনেকেই অন্য স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে এক সময় নিজের অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এখন অবশ্য সে অবস্থার অবসান ঘটেছে। ইহুদিরা অনেকটা আত্মস্থ হয়েছে।

খোন্দকার আলমগীর সকৌতুকে বললেন, "আমাদের দাদু বলতেন, যত দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করবে তত কাছে চলে আসবে, এই ব্যাপারটা যারা গায়ের জোরে দেশ চালায় তারা বড্ড দেরিতে বোঝে।"

দাদুর পরিচয় জানতে আগ্রহ হয়। খোন্দকার আলমগীর বললেন, "দাদুই আমাদের দু'জনের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন। দাদুকে পাওয়াটাই আমার বিদেশ-জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয়।"

দাদুর নাম যে প্রফুল্লকুমার মুখার্জি তা শুনে আমার চক্ষু চড়কগাছ। আলমগীর জিজ্ঞেস করলেন, "এর আগের বার সাতষট্টি সালে যখন এদেশে এসেছিলেন তখন দাদুর সঙ্গে দেখা হয়নি?"

দেখা হয়নি, কিন্তু নাম শুনেছিলাম। প্রবাসী ভারতীয় সমাজের প্রবীণতম পুরুষ প্রফুল্ল মুখার্জি স্থানীয় টেগোর সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। এঁর স্ত্রী মার্কিন—শ্রীমতী রোজ মুখার্জি।

আলমগীর বললেন, "অগ্নিপুরুষ বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন দাদু।

কোনোরকম অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করেননি সমস্ত জীবন। জন্মসূত্রে দেশ ভারতবর্ষ এবং নাগরিকসূত্রে দেশ আমেরিকা—দুটিকেই প্রাণভরে ভালবাসতেন। প্রায়ই আপন মনে আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথ থেকে—'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তাহে যেন তৃণসম দহে'।"

আলমগীর বললেন, "দাদুই আমার প্রবাসজীবনের প্রাণপুরুষ। ষাটের দশকে এদেশে এসে পিছুটানে ভুগছি, সেই সময় এক রবীন্দ্রসংগীতের আসরে দাদুর সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি আমাকে স্নেহে কাছে টেনে নিলেন। শুনলাম দাদুও সেই বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সরকারী আদেশে ১৯০৬ সালে দেশছাড়া হয়েছিলেন। ভাগ্যচক্রে এই আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং নতুন জীবন শুরু হয়েছিল। দাদু পেশায় ছিলেন একজন ধাতুবিদ্যাবিশারদ, কিন্তু স্বভাবে ছিলেন বিপ্লবী। যেখানেই প্রতিবাদ প্রয়োজন সেখানেই দাদু রুখে দাঁড়াবেন দ্বিধাহীন চিত্তে—সে ভিয়েতনাম যুদ্ধ হোক, অথবা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম হোক। দাদুর জীবনটা একটা নাটকের মতন, আমেরিকা ছাড়াও তিনি রুশ দেশেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, ওদেশের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল।"

আলমগীর মনে করিয়ে দিলেন, "ষাটের দশকে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে অংশ গ্রহণ করা পাকিস্তানীদের পক্ষে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হতো। দীর্ঘদিন ধরে 'অভাববোধ' অর্থাৎ হোমসিকনেস যেটা ছিল তা যেন ওঁর সান্নিধ্যে এসেই কর্পূরের মতো উবে গেলো। একটা চাপা পাথর বুকের ওপর থেকে সরিয়ে নিলেন দাদু। অনুষ্ঠানের শেষে সস্ত্রীক দাদুর বাড়িতে এলাম। দাদু তাঁর গভীর ভালবাসায় আমাদের দু'জনকে নিকট আত্মীয় করে নিলেন।"

আলমগীর বললেন, "ছেড়ে আসা জন্মভূমির প্রতি কর্তব্য পালন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেমন তাঁর ছিল—তেমন ছিল, বেছে নেওয়া নতুন দেশকে নিজের করে নেওয়ার পর—আমেরিকার জন্য একই প্রীতি ও কর্তব্যবোধ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রতি শনিবার সেন্ট্রাল পার্কে হাতে এক ফেস্টুন নিয়ে পাঁচ-ছ ঘন্টা বিক্ষোভ দেখাতেন। বৃষ্টি-বাদল, ঝড়-ঝাপটা, তুষার-শীত কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি, সময়মত তিনি সেখানে হাজির হবেনই—একা হলেও কথা নেই। গুনগুন করে গাইতেন মাঝে-মাঝে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—তবে একলা চল, একলা চল রে'। অপরের মুখেও গানটা শুনতে খুব ভালবাসতেন।"

১৯০৬ সালে দাদু বিতাড়িত হয়েছিলেন স্বদেশ থেকে, কিন্তু মাতৃভূমিকে ভোলেননি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দাদু আবার দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যোলটি বিভিন্ন সংগঠনকে একটি মোর্চায় এনে

সৃষ্টি করেছিলেন অ্যাকশন কোয়ালিশন ফর বাংলাদেশ। রুডলফ আয়াস্কো হলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ন' মাস দাদু সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

আলমগীর স্মৃতিচারণ করলেন, "তখন নানা জায়গা থেকে ডাক আসতো কিছু বলার জন্যে, দাদু বৃদ্ধ বয়সেও সব জায়গায় যাবেন। নিউ ইয়র্কের দুটো বিরাট বিক্ষোভ শোভাযাত্রা, জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ কনসার্টে, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে স্বাক্ষর সংগ্রহে দাদুর পরিশ্রম যুবকদেরও হার মানিয়েছিল।"

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আলমগীর নিজেই ভারত-বাংলা সীমান্তে উপস্থিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। "আমার স্ত্রীর অসুস্থতার কথা ভেবে দাদু চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর আত্মীয়দের কাছে লিখে আমাদের থাকা এবং আমার স্ত্রীর দেখাশোনার ব্যবস্থা করে দেন।"

আলমগীর বললেন, "নভেম্বরে সাময়িক ভাবে ফিরে এসেছি। বাসা তুলে দিয়ে আবার ফিরে যাবো। সীমান্তে, আহতদের চিকিৎসা করবো। বাড়িতে নেমে দাদুকে ফোন করতেই বললেন, কবি গিনসবার্গ সমস্ত বিকেল দাগ হামারশোল্ড প্লাজাতে তাঁর রচিত 'যেশোর রোড' গেয়েছেন। কলকাতার সল্টলেকে বাংলাদেশ থেকে আগত বাস্তুহারাদের বসবাসের অনুকরণে কিছু মার্কিন ছেলেমেয়ে কয়েকদিন ওখানে থাকার ব্যবস্থা করেছে। দাদু নিজের চোখে সব কিছু দেখার জন্যে সেই রাত্রেই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বাইরে তখন প্রচণ্ড শীত। দাদুকে নিয়ে দাগ হামারশোল্ড প্লাজাতে গিয়ে দেখি ছেলেমেয়েরা কংক্রিট পাইপের অনুকরণে কার্ডবোর্ড পাইপ তৈরি করে তার মধ্যে আশ্রয় নিলেও কিছু খেতে পায়নি। রাত প্রায় এগারটা, বাঙালীরা কোনো ব্যবস্থা করেনি। দাদু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এদের না-খাইয়ে তিনি যাবেন না। রাত বারোটায় খাবার নিয়ে এলাম দুই রেস্তোরাঁ থেকে। 'বিট অব বেঙ্গল'-এর কাজী সামসুদ্দিন ও রুচিরার মালিক রিয়াজউদ্দিন সায়েব সাহায্য করেছিলেন।"

আলমগীর বললেন, "আমরা ছিলাম গুরুশিষ্য। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা ছিল দাদুর ধর্ম। দাদু কোনোদিন নাম চাননি, খ্যাতি চাননি। তিনি চাইতেন কাজ হোক, পৃথিবীতে শান্তি আসুক। ভালবাসা আসুক, মানুষ মানুষকে সম্মান করুক।"

বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্যে আমি এখানে আসিনি। কিন্তু খোন্দকার আলমগীর দাদু প্রসঙ্গ না তুলে থাকতে পারছেন না। বললেন, "আমার ব্যক্তিগত জীবনে দাদু গভীর রেখাপাত করে গেছেন। বিদেশে অসুখ-বিসুখের সময়, বিপদে ভেঙে পড়ার মুহূর্তে দাদু পাশে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন সাহস জুগিয়েছেন। হাসপাতালে আমার স্ত্রীর জন্যে তাঁর বিখ্যাত সুজির

মোহনভোগ প্রায়ই নিয়ে আসতেন। আজও তাঁর অভাবটা অত্যন্ত প্রখর হয়ে বুকে বাজে।"

এই সব কথা শুনে আলমগীর মানুষটিকে চিনে নিতে আমার সুবিধে হচ্ছে। ভদ্রলোক একবার টেলিফোন ধরবার জন্যে উঠে গেলেন, সেই সময় আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু বাঙালী ও ভারতীয় সমাজে ফিরে এলো।

কথা উঠলো এদেশে কত দেশীভাই আছেন? একজন বন্ধু জনসংখ্যাবিদ পৃথ্বীশ দাশগুপ্তের রচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ১৯৮০ সালের মার্কিন জন-গণনায় একটি প্রশ্ন ছিল 'এই লোকটি সাদা, কালো অথবা নিগ্রো, জাপানিজ, চাইনিজ, ফিলিপিনো কোরিয়ান, ইণ্ডিয়ান (আমেরিকান), এশিয়ান, হাওয়াইয়ান, গুয়ামানিয়ান, সানোয়ান, এসকিমো, অথবা কি তা নির্দেশ করো।'

এই প্রশ্নের উত্তর থেকে জানা যাচ্ছে ৩,৮৭,০০০ ইণ্ডিয়ান, ১৫,৭০০ পাকিস্তানী, ৩,০০০ শ্রীলংকান এবং ১৩০০ বাংলাদেশী—মোট ৪ লাখ ৭ হাজার ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ আছেন।

ইংরিজি ছাড়া কে কোন ভাষায় কথা বলেন এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা মাত্র আড়াই লক্ষ মানুষের সন্ধান পাচ্ছি। তার মধ্যে হিন্দীভাষী (১৩০,০০০), গুজরাটী (৩৭,০০০), পাঞ্জাবী (২০,০০০), বাংলা (১৩,০০০) এবং মালয়ালী (১১,০০০)।

জটিল অঙ্কের মাধ্যমে পৃথ্বীশবাবু হিসেব করছেন, ১৯৮০তে মার্কিন মুলুকে বাঙালীর সংখ্যা ছিল ২১,০০০। এর পরে ১৯৮০-৮৫তে যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের ধরলে বর্তমান সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩,০০০-এর মতন। এঁরা ছড়িয়ে আছেন এই ভাবে। নিউ ইয়র্ক (২১.৩%), নিউ জার্সি (১০.১%), ক্যালিফোর্নিয়া (৯.৪%), টেক্সাস (৬.১%), ইলিনয় (৬%), মিশিগান (৫.১%), পেনসিলভেনিয়া (৪.৮%), মেরিল্যাণ্ড (৪.৮%), ম্যাসাচুসেট (৩.৫%), ভার্জিনিয়া (৩.৫%)। পৃথ্বীশবাবু দেখিয়েছেন, এদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এশিয়ান ইণ্ডিয়ানরা নস্যি—প্রতি ছ'শ জনেও একজন নন।

বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থাগুলির ফেডারেশনের প্রধান টমাস আব্রাহামের এক সাক্ষাৎকার টাটকা পড়েছিলাম। তাঁর হিসেব মতো, ১৯৮৫তে এদেশে ৫২৫,০০০-এর মতন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ রয়েছেন। এঁদের বৃত্তিগত ব্রেকডাউন আব্রাহাম সায়েবের হিসেব অনুযায়ী এইরকম : ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ, এম-বি-এ ইত্যাদি—৪০,০০০, ডাক্তার ও ডেনটিস্ট—২৫,০০০, পি-এইচ-ডি বৈজ্ঞানিক—১৫,০০০, ব্যবসায়ী, ট্রাভেল এজেন্ট ইত্যাদি ৫,০০০ হিসেব বিশেষজ্ঞ, উকিল ইত্যাদি—৩,০০০,

দোকানদার—১,০০০, রেস্তোরাঁ মালিক—৫০০, হোটেল মালিক—১৫,০০০।

ভারতীয়দের মধ্যে, কোটিপতি বেশ কয়েক হাজার। আব্রাহাম সায়েবের মতে 'দশ কোটিপতি'র সংখ্যাও নেহাত কম হবে না।

টেলিফোনালাপ শেষ করে আমাদের জন্যে ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে ফিরে এলেন খোন্দকার আলমগীর সায়েব। বললেন, "বাঙালীর সংখ্যা তিরিশ হাজারের বেশি বলে আমার ধারণা।"

ওঁর মতে, বেশি বাঙালী এখানে আসবার সুযোগ পাননি। সরকারী, বেসরকারী ও অর্থনৈতিক কারণগুলো বাঙালীদের বিপক্ষে কাজ করছিল। ১৯৬৮-৭০ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই এখানে দেখা যেতো। পশ্চিমবাংলা থেকেও তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকজন আসেননি—হয়তো বা বৃত্তিগুলির ভাগ-বাঁটোয়ারাতে সর্বভারতীয় খাতে তাঁদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল না। ইমিগ্রেশন ভিসা পাওয়ার কড়াকড়িটা কমে ১৯৬৯-৭০-৭১ সালে।

আলমগীর বললেন, "পেশাগত হিসেবে দেখলে এদেশে চিকিৎসক, ফার্মেসিস্ট, ডেনটিস্ট, ইনজিনিয়র, কলেজ শিক্ষক, গবেষণারত বৈজ্ঞানিক, অ্যাকাউনটেন্ট, ডায়েটিশিয়ান, নার্স এঁরাই সাধারণত এসেছেন।"

প্রবাসজীবনের সামাজিক সমস্যা আলমগীরকে সর্বদাই চিন্তিত করে রেখেছে। বললেন, "সাফল্যের হিসেবটা আপনি নিজেই নেবেন। কিন্তু ব্যর্থতার খবর কিছু আমার কাছে আছে। পরিবার ভেঙে যাওয়ার সমস্যা ক্রমশই বাড়ছে। প্রেমঘটিত অপরাধী, খুন-খারাপি ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। ভবঘুরে, মদ্যপায়ী কাউকে-কাউকে ওয়েলফেয়ারের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। হাশিস, ভাঙ, গাঁজা প্রভৃতি বেচাকেনার দায়ে বাংলাদেশের কেউ-কেউ পুলিশের তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। কিছু ছেলেমেয়ে নেশাভাঙের খপ্পরে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

এইবার জাহাজী শ্রমিকদের কথা তুললাম। আলমগীর দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন, "এঁদের প্রায় সবাই বিনা অনুমতিতে জাহাজ থেকে নেমে পড়ায় আইন অনুযায়ী ফেরারি হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। ইমিগ্রেশনের জন্যে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের টাকা উকিলদের দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন এঁরা। লুকিয়ে-লুকিয়ে ভয়ে-ভয়ে কাজ করতে হয় এঁদের—ধরা পড়লেই দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয় ইমিগ্রেশন বিভাগ। এঁদের শ্রম বিক্রি হয় জলের দামে। বেশির ভাগ বাড়ি রং-করা, টুকিটাকি মেরামতের কাজ করেন। সারা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে উপার্জিত টাকার দুই তৃতীয়াংশ চলে যায় উকিলের পেটে। এমন কি নিজের দেশের দূতাবাসের কিছু আমলাও ফায়দা লুটছেন এঁদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে।"

আলমগীর সোজাসুজি বললেন, "দিনের শেষে কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পরে ছোটখাট বদ্ধ ঘরে ঠাসাঠাসি করে এঁরা রাত কাটান এবং প্রায়ই অসুখ-বিসুখে ভোগেন। দু'চারজন খুবই কম বয়সে নানা ব্যাধিতে ভুগে বিদেশেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আরও অনেকেই এই পথে জীবন শেষ করবে।"

আলমগীর জানালেন, "এঁদের অনেকে এখন বাধ্য হয়েই এদেশী মেয়ে বিয়ে-থা করে ইমিগ্রেশন ভিসা জোগাড় করছে। অবশ্য উকিলদের পরামর্শ মতোই। ফলে দেশের বউ, ছেলেমেয়েরা এদের দেখা পাচ্ছে না—আট দশ বছর পরেও। কেউ-কেউ ওদিককার পাট তুলতেই বসেছে, কেউ-কেউ দোটানায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

আরও জানা গেলো, এখানেও কেউ-কেউ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় জড়িয়ে পড়ছে, এদেশী মহিলাদের ব্যাপারে। আর্থিক খেসারতও দিতে হচ্ছে। মানসিক অশান্তি বেশ বাড়ছে।

আলমগীর সায়েব এ-বিষয়ে নিজেও কিছু লেখালেখি করেন। "কিন্তু তেমন ফল হয় কই?"

আলমগীর বললেন, "ক্লিভল্যাণ্ডের রণজিৎবাবু আপনাকে ব্যর্থ বাঙালীর হিসেব-নিকেশ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাহলে শুনুন, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং সংসার ভাঙা ছাড়াও অন্য সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছে। এখানকার সমাজ জীবনের চাপ, দ্রুত গতি, কর্মজীবনে দক্ষতার উঁচুমানের সার্বক্ষণিক তাড়া কেউ-কেউ সইতে পারছেন না। কেউ কেউ আত্মহত্যা করে জীবন থেকে ছুটি নিয়েছেন। কেউ-কেউ মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে এখানকার মানসিক হাসপাতালে আশ্রয় নিচ্ছেন। কেউ চিকিৎসাধীন অবস্থায় কর্মচ্যুত হচ্ছেন। কাউকে-কাউকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজকর্মের চাপে, অতি উচ্চাভিলাষীদের কঠিন প্রতিযোগিতায় মধ্য-বয়সের প্রারম্ভে বা যৌবনের প্রান্তে কারও-কারও হৃদযন্ত্র অসুস্থ হচ্ছে। অকাল মৃত্যু বাড়ছে, কেউ-কেউ মধ্য-জীবনেই অর্ধপঙ্গু হচ্ছেন।"

আলমগীর সায়েব যে তাঁর নিজস্ব সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই কথা বলছেন তা বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। আরও অনেক কিছু বলার ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু শ্রীমতী আলমগীর সস্নেহে বাধা দিলেন, "বেচারা দু'দিনের জন্যে এসেছেন। দেশে তো অনেক দুঃখই আছে, এখানে কেন ওঁর কষ্ট বাড়াচ্ছো?"

আলমগীর সায়েব ক্ষমা চাইলেন। বললেন, "আমাদের খাবার এসে গিয়েছে। এখনই সদ্ব্যবহার করা যাক। আপনি শুধু আমার কথার ওপর বিশ্বাস করবেন না। একটু সময় নিয়ে নিজের চোখে সব দেখে যান।"

ওঁর একটা লেখা বিদায়ের সময় আমার হাতে দিয়ে বললেন, "কাজকর্ম

খুঁজে বার করতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে অনেক বাঙালীর। কেউ-কেউ শিক্ষাগত যোগ্যতা সত্ত্বেও আজেবাজে কাজ করছেন। কেউ-কেউ হতাশ হয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। ভুলবেন না, নতুন আগন্তুকদের প্রতি বিরূপ ভাব এ দেশেও যথেষ্ট দেখানো হয়ে থাকে। কিছু-কিছু এলাকায় বর্ণ-বিদ্বেষের সমস্যাও রয়েছে।"

আলমগীর সে-রাত্রে আমার চোখ খুলে দিলেন। বললেন, "যারা দেশ ছেড়েছে ভাগ্য সন্ধানে কিছু-কিছু জটিলতা তাদের সঙ্গী হয়ে থাকবেই। এই জটিলতার মধ্য দিয়েই জীবন চলবে। এই সব কষ্টকে সাথী বলে মেনে নিয়েই এখানকার বাঙালী সমাজ ও তাঁদের বংশধরদের এগিয়ে যেতে হবে।"

আলমগীরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিউ ইয়র্কের রাজপথে নেমে এসে গভীর শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠলো। আজ আমি বিদেশের পরিবেশে একজন মানুষের মতন মানুষকে দেখেছি। যতদিন আমাদের এই বঙ্গভূমি এমন সব তপন সরকার, প্রবীর রায়, খোন্দকার আলমগীরের মতন পুরুষের জন্ম দেবে ততদিন কোনো জটিলতাই আমাদের পঙ্গু করতে পারবে না।

এক ডাক্তারের হাত থেকে আরেক ডাক্তারের খপ্পরে। খোন্দকার আলমগীরের ওখান থেকে বেরিয়ে আমি যাঁর ওপর ভর করেছিলাম তাঁর নাম ডাক্তার তপন সরকার। যে-অঞ্চলে তপনের বসবাস তার নাম 'গ্রেট নেক'। সুরসিক তপনকে যা বলা হয়নি, কলকাতায় এখনও 'গলাকাটা ডাক্তার' কথাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে আছে এবং ওই শহরের কোনো অঞ্চলে লম্বাগলা শব্দটি থাকলে সেখানে কোনো ডাক্তার চেম্বার খুলবেন না অথবা সম্পত্তি কিনবেন না।

আলমগীর সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা অকারণ কিনা তা যাচাই করতে গিয়ে দেখলাম আমার ভুল হয়নি। পূর্ব আমেরিকার বহু বাঙালীর হৃদয়েই তিনি শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। একজন তো বেশ আন্তরিকভাবেই বললেন, নিজের আদর্শ এবং নিজের স্ত্রীর জন্যে ভদ্রলোক নিজেকে তিলে-তিলে উৎসর্গ করছেন হাসিমুখে।

ছোটবেলায় দুষ্টু থাকলে বড় হয়ে শান্ত ও মিষ্টি হয়, কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য তার প্রমাণ এই তপন সরকার। ইস্কুলে সে আমাদের জুনিয়র ছিল এক বছর এবং সুযোগ পেলেই নানাভাবে বয়োজ্যেষ্ঠদের ভোগাতো। আমরা প্রার্থনা

করতাম কবে এই হাঙ্গামাবাজ জুনিয়রের হাত থেকে মুক্তি মিলবে। সেই তপনই কলেজে ঢুকে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেলো—এমন চমৎকার মিষ্টি স্বভাবের পরোপকারী পুরুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত ব্যাপার।

নিউ ইয়র্কে তপন একটি ছোটখাটো সামাজিক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল একটি যৌথ পরিবার স্থাপন করে। এই পরিবারের সভ্য তপন, তার ডাক্তার স্ত্রী, দুই নাবালক পুত্র, তপনের ইঞ্জিনিয়ার দাদা তড়িৎ, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা। এই জয়েন্ট ফ্যামিলি স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মার্কিন সমাজে বিস্ময় উৎপাদন করলেও বেশ চমৎকার চালু ছিল এবং এক সময়ে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং এই পরিবারকে কেন্দ্র করে তিনি মার্কিন দেশেও যৌথ পরিবার সম্পর্কে একটি সাড়াজাগানো প্রবন্ধ রচনা করেন। মার্কিন মহলে এই সমাজবিজ্ঞানী এখন খ্যাতনামা। ডঃ পরমাত্মা শরণ একদা বিহারে বসবাসকারী ছিলেন, এখন নিউ ইয়র্কে গবেষণা ও অধ্যাপনাকর্মে নিয়োজিত আছেন।

তপন ও তার ডাক্তার স্ত্রী মায়া রসিকতা করলো, এখানকার বাঙালী মেয়েদের সায়েব স্বামীগুলি নাকি মন্দ হচ্ছে না। ওদের জানাশোনা এক ডাক্তার তনয়া কলকাতায় গিয়ে একজন মার্কিনী 'ভেট' (পশু-চিকিৎসককে) বিয়ে করলো। বিদেশ থেকে তেইশ জন বরযাত্রী এসেছিল কলকাতায়। পাছে আমি ভুল করি তাই মায়া আমাকে সাবধান করে দিলো, মার্কিন সমাজে পশুচিকিৎসকদের রুজিরোজগার মনুষ্য চিকিৎসকদের থেকে বেশি। ডাক্তারি কলেজে ভর্তি হওয়ার থেকে ভেটারিনারি কলেজে প্রবেশপত্র পাওয়া বেশি শক্ত। ঘোড়ার ডাক্তার কথাটা কলকাতায় ব্যঙ্গ হলেও মার্কিন মুলুকে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

পাত্রী হিসেবে বঙ্গললনার চাহিদা হবু মার্কিনী জামাই-সমাজে বেড়েই চলেছে। কলকাতার বিদেশী বিবাহবাসরে একজন তরুণ মার্কিনী বরযাত্রীকে মায়া সরকার জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমিও কি এদেশী মেয়ে বিয়ে করতে আগ্রহী ?" ছোকরাটি গোপন খবর ফাঁস করেছিল, কয়েকটি ভারতললনা ইতিমধ্যেই তার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছে। স্বদেশের গ্রীনকার্ড, সন্ধানী ভাবী জামাইদের পক্ষে যা খারাপ খবর তা হলো বিদেশে প্রতিপালিত বাঙালিনীরা একটু কম বয়সেই বিবাহিতা হচ্ছে এবং অনেকেই সায়েব পাত্র পছন্দ করছে।

"জামাই হিসেবে এরা মন্দ নয়"। তপনের সুচিন্তিত মন্তব্য। এক সায়েব জামাই (ম্যাথু) গানবাজনা শিখে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করছে এবং টেলিফোন করলে ভাঙাভাঙা বাংলায় বলে, "কাকা, তুমি কেমন আছো ?"

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পরে তপন আমাকে ডঃ পরমাত্মা শরণের বাড়িতে

নিয়ে গেলো। প্রবাসী ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক লেখাগুলি ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শরণ একটু-আধটু বাংলা জানেন এবং নিজের স্ত্রী এবং জননীর একই ছাদের তলায় বসবাসের ব্যবস্থা করে স্থানীয় সায়েব পড়শীদের বিস্ময় ও বয়োবৃদ্ধদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

পরমাত্মার মায়ের সঙ্গে দেখা হলো না, তিনি তখন শুয়ে পড়েছেন। অধ্যাপক মশায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো।

আবার সেই পুরনো কথা, ভারতীয় গল্পলেখকদের জন্য স্বর্ণখনি সৃষ্টি হয়েছে এই মার্কিন মহাদেশে। নতুন এই সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষার লড়াই যে-কোনো সাহিত্যের সেরা উপাদান হয়ে উঠতে পারে।

ইমিগ্রান্ট ইণ্ডিয়ানদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে সেই ১৮২০ সাল থেকে—ঐ বছর একজন ইণ্ডিয়ান আমেরিকায় পা দিয়েছিলেন। এঁর নাম ও পরিচয় খুঁজে বার করতে পারলে মন্দ হতো না। ১৮৫১-৬০ এই দশকে ভারতীয় ইমিগ্রান্টদের সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে ৪৩। বিংশ শতকের গোড়ায় ৬৮ জন। তারপর ভারতীয়দের জন্যে আমেরিকার দরজা বন্ধ। ১৯৪১-৫০ সালে মাত্র ১৭৬১ জন। পরের দশকে ১৯৭৩ জন। ১৯৬১-৭০ পর্বে দরজা খুললো—পদার্পণ হলো ৩০,৪৬১ জনের। তার পরের দশকে প্রায় তিনগুণ।

এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৫ সাল থেকে পরের দশ বছরে প্রায় ৪৬,০০০ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক এদেশে ঢোকেন। তাঁদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সংখ্যা ছিল আরও ৪৭,০০০। ঐ একই দশকে যাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করে আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন তাঁদের সংখ্যা অন্তত ৮,০০০।

এই প্রসঙ্গে পরমাত্মা শরণ একটি মজার কথা বললেন, "আপনি খোঁজ করলে দেখতে পাবেন, যাঁরা এদেশে আগে এসেছেন তাঁরা অনেকে ইণ্ডিয়ান পাশপোর্ট রেখেছেন, কিন্তু নতুন যাঁরা এসেছেন তাঁরা চটপট আমেরিকান সিটিজেন হচ্ছেন। মানসিকতায় যাঁরা কম মার্কিনী রয়েছেন তাঁরাই সবচেয়ে আগে জন্মভূমির সঙ্গে আইনগত বন্ধন ছিন্ন করেছেন চিরতরে।"

আর-একটি চমৎকার খবর দিলেন পরমাত্মা শরণ—হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা অনেক তাড়াতাড়ি পিছুটান কাটিয়ে এই সভ্যতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন, যদিও ধর্মীয় আচারে তাঁদের অনেক কড়াকড়ি এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা তাঁরা পালন করে যান।

আরও যা জানবার, নতুন সভ্যতার সাগরে বিলীন হয়ে যাবার ব্যাপারে ভারতীয় মেয়েরা অনেক বেশি তৎপর, ভারতীয় পুরুষদের থেকে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে শরণ বললেন, "সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের চোখে আর কী কারণ ধরা পড়বে তা আমি জানি না, তবে মেয়েরা বোধহয় ঘর বদলাবার জন্যে

ছোট বয়স থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ির পরিবর্তন ঘটে যায় চমৎকারভাবে। এই মানসিকতা নিয়েই তারা আবার নিজেদের পাল্টে ফেলে বিদেশের এই পরিবেশে।"

শরণ বললেন, "তবে মজার ব্যাপারটা হলো, বিদেশে এসে প্রথম একটা বছর মেয়েদের অ্যাডজাস্টমেণ্ট ছেলেদের তুলনায় অনেক শক্ত থাকে। কিন্তু তারপরেই এখানকার ভাষা সড়গড় হয়ে যায়, দোকানপত্তর চেনা হয়ে যায়, আমেরিকা সম্বন্ধে মেয়েদের টান পুরুষদের থেকে বেশি হয়ে পড়ে। তাছাড়া দেশে শাশুড়িদের সামলাতে হয়, এখানে মুক্তি, ওসব হাঙ্গামা নেই।"

"প্রবাসী ভারতীয় পুরুষমানুষদের কথাও একটু বলুন, শরণসায়েব", আমার অনুরোধ।

পরমাত্মা বললেন, "স্বদেশ থেকে দূরে থাকবার বেদনা বাঙালীদের মধ্যে বড্ড বেশি। জীবনযাত্রার মান এখানে উঁচু, দৈনন্দিন সুখ সুবিধে অনেক। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিলে রয়েছে সর্ববিষয়ে সারাক্ষণের সংগ্রাম। কর্মক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা এবং ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি আমেরিকান হয়ে যাচ্ছে ভাবতে খুব কষ্ট। সেই সঙ্গে রয়েছে নবাগতের সেই বেদনা, যা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দেয় কোথাও যেন একটু বৈষম্যমূলক ব্যবহার গণতন্ত্রের এই পীঠস্থানেও রয়ে গিয়েছে।"

তবু স্বীকার করতে হবে, অন্য অনেকের তুলনায় আমেরিকান সমাজে ভারতীয়দের যথেষ্ট আদর। মার্কিনীরা এঁদের পছন্দ করেন। তবে কোথাও একটু 'হিপোক্রিসি'ও লুকিয়ে আছে। ইমিগ্রাণ্ট শ্রমিকদের রক্ত জল-করা সস্তা শ্রমের ওপর এই সমাজ এখনও অনেকটা নির্ভরশীল কিন্তু কেউ সে-কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করবে না।

ইমিগ্রাণ্ট ভারতীয় পুরুষদের সম্বন্ধে পরমাত্মা বললেন, "সম্প্রতি যাঁরা আসছেন তাঁদের অনেকেরই ধারণা ছিল এদেশে আকাশছোঁয়া সুযোগ। এখন হঠাৎ বুঝছেন, সুযোগের সেই আকাশই ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর। তাই তাঁদের উদ্বেগ বাড়ছে। তাঁরা জীনসংগ্রামের অনেক ব্যাপারেই মনঃস্থির করতে পারছেন না। কিন্তু পুরুষদের তুলনায় ভারতীয়, মেয়েরা অনেক বুদ্ধিমতী, লক্ষ্যস্থল সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা অনেক স্পষ্ট।"

"একদিন সমস্ত পিছুটান বন্ধ হয়ে যাবে। এই ভারতীয় সমাজ সম্পূর্ণ লীন হয়ে যাবে আমেরিকান সভ্যতার সঙ্গে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে হয়তো নইপল মনোবৃত্তিও দেখা দেবে," আমি বললাম।

পরমাত্মা শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "হিন্দুরা মাঝে-মাঝে ভাবেন তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন, বিচক্ষণ মুসলমানরা তা করেন না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত

প্রবাসীদের মধ্যে ভারতীয়ত্ববোধ সুদৃঢ় হচ্ছে, তাঁরা এদেশের মানুষ হয়েও নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলতে রাজি নন। একমাত্র সময়ই এ-বিষয়ে তার শেষ রায় দেবে।"

আমার মনে পড়লো, পিটার পোলের এক মন্তব্য। "একসঙ্গে সহ-অবস্থান সমাজ নয়—সমাজের মূল কথাটা হলো আদান-প্রদান।" যা বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজভাবে বলেছিলেন 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'। এই দেওয়া-নেওয়া শুধু জাগতিক অর্থে লেনদেন নয়, ভাব-ভালবাসার লেনদেনও বটে।

পরমাত্মা বললেন, "একটা জিনিস ভুলবেন না, গুণের সমাদর করতে এদেশের সমাজের তুলনা নেই। সেই সঙ্গে, যা অভিনব, যা অজানা তার প্রতি এদেশের মানুষদের প্রচণ্ড আগ্রহ। নতুন কিছু দেখলেই ওঁরা আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন গ্রহণ করার জন্যে।"

পরমাত্মা শরণের পরেই নিউ ইয়র্কে যাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো তাঁর নাম ডক্টর জ্যোতির্ময় মিত্র। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের প্রতিথযশা অধ্যাপক। বিশ বছর আগে এঁর সঙ্গে গল্প করতে এসে ওঁর নিউ ইয়র্ক অ্যাপার্টমেণ্টে সমস্ত রাত ধরে আড্ডা জমেছিল, হোটেলে ফেরা হয়নি। জ্যোতির্ময় তখন ছিলেন অকৃতদার। আমাকে ভোরবেলায় একটা নতুন টুথব্রাশ উপহার দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। বলেছিলেন, "হঠাৎ-আসা বন্ধুদের জন্যে বাড়তি টুথব্রাশ রেখে দিই, খুব কাজে লেগে যায়।"

এঁর কথা আমি এপার বাংলা ওপার বাংলাতে সবিস্তারে লিখেছিলাম।

জ্যোতির্ময় এরপর কলকাতায় এসেছিলেন বিয়ে করতে। কারুর কারুর বকুল ফুল একটু দেরিতে ফোটে! আমরা সুইনহো স্ট্রীটে খুব হৈ-চৈ করে খাওয়া-দাওয়া করেছিলাম। তারপর আবার দেখা এই নিউ ইয়র্কে।

জ্যোতির্ময় মিত্র প্রথমেই একটু মধুর সারপ্রাইজ দিলেন। বিশ বছর আগে নিউ ইয়র্কে ওঁর ঘরে তোলা আমার ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে হাজির করলেন। এই ছবির কপি আমার কাছে নেই, বিশ বছর আগে উপস্থিতির প্রমাণ হাতে-হাতে পেয়ে খুব ভাল লাগলো। জ্যোতির্ময়গৃহিণী বকুলকে অনেক বছর আগে নববধূর বেশে কলকাতায় দেখেছিলাম, এখন তিনি একজন অভিজ্ঞ নিউ ইয়র্কবাসিনী। এখানে তিনি শুধু ম্যানেজমেণ্টের উচ্চ ডিগ্রি সংগ্রহ করেননি,

একটা ভাল চাকরিও করেন। কর্মস্থল আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত হোটেল ওয়ালডর্ফ এসটোরিয়ায়।

জ্যোতির্ময় মিত্র টানা পঁয়ত্রিশ বছর আমেরিকায় আছেন। ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে এদেশে হাজির হয়েছিলেন ১৯৫২ সালে, আর দেশে ফেরা হয়নি।

জ্যোতির্ময়ের এক মামা বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসু। কিন্তু আমেরিকাসূত্রে জ্যোতির্ময় এবারে বড়মামা পবিত্রকুমার বসুর কথা বেশি বললেন। জ্যোতির্ময়-এর বড়মামা আমেরিকায় আসেন ১৯০৫ সালে হংকং ও জাপান ঘুরে। তখন তাঁর বয়স ২১ বছর। তখন পকেটে ১০০ ডলার না-থাকলে কাউকে আমেরিকায় নামতে দেওয়া হতো না—পাসপোর্ট, ভিসা, ইত্যাদির হাঙ্গামা অবশ্য ছিল না। বড়মামা জাপানে কাজ করে টাকা রোজগার করলেন।

শোনা যায় তারকনাথ দাস সে-সময়ে জাপানে ছিলেন এবং পবিত্রকুমার বসুর দেওয়া বাড়তি টাকা নিয়েই তিনি আমেরিকায় হাজির হতে পেরেছিলেন। শোনা যায়, তারকনাথ আজীবন এই সাহায্যের কথা মনে রেখেছিলেন।

নতুন প্রজন্মের যাঁরা তারকনাথ দাসের নাম শোনেননি তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, তারকনাথের জন্ম ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাঝিপাড়ায় চব্বিশ পরগণায়। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। ছাত্রাবস্থায় উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক রাজনীতি প্রচারকালে পুলিশের নজরে আসেন। কিন্তু গ্রেপ্তার হবার আগেই ১৯০৫ খ্রীঃ জাপানে এবং ১৯০৬ খ্রীঃ আমেরিকায় যান এবং ভারমণ্ট সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আমেরিকায় তিনি 'ফ্রি হিন্দুস্তান' পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন এবং সেখান থেকে গদর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ১৯১১ খ্রীঃ এম-এ পাশ করে তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স্ বিভাগের ফেলো হন এবং ১৯১৪ খ্রীঃ মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ বার্লিন কমিটির প্রতিনিধিরূপে চীন যাত্রা করে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শৈলেন ঘোষ আমেরিকায় আসার পর তাঁর সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ গঠন করে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন করেন। মার্কিন সরকার এই অপরাধের অভিযোগে তাঁকে বাইশ মাস কারাদণ্ড দেন। ১৯২৪ খ্রীঃ ওয়াশিংটন জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক আইন' বিষয়ের ওপর পি-এইচ-ডি. ডিগ্রি পান এবং ঐ বছরেই তিনি এক মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯২৫-৩৪ খ্রীঃ ইউরোপে বাসকালে ভারতীয় ছাত্রদের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার জন্যে প্রায় একক চেষ্টায় মিউনিকে ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দেশ্যেই তারকনাথ দাস

ফাউণ্ডেশনের উদ্ভব। ১৯৩৫ খ্রীঃ ঐ ফাউণ্ডেশন আমেরিকায় রেজিস্ট্রিকৃত হয়। তারকনাথ নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৫২ খ্রীঃ দেশত্যাগের সাতচল্লিশ বছর পরে ভারতবর্ষ ভ্রমণে এসেছিলেন। ১৯৫৮ খ্রীঃ নিউ ইয়র্কে তাঁর মৃত্যু হয়।

জাপানে তারকনাথের সাহায্যকারী পবিত্রকুমার ছিলেন অদ্ভুত এক চরিত্র। আমেরিকাতেও নিরামিষ খেতেন। কাজ করতেন এক স্টক ইয়ার্ডে এবং বাড়তি রোজগারের টাকায় ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করতেন। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের আর্থিক দুর্গতি চিরদিনের।

পবিত্রকুমার ইলিনয় ইউনিভারসিটিতে কেমিস্ট্রি পড়তেন। তখনকার দিনে শাদা ও কালোদের আলাদা হোস্টেলে থাকতে হতো, এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে পবিত্রকুমার ডিগ্রি গ্রহণ করলেন না।

জ্যোতির্ময় মিত্রর বড়মামা দেশে ফিরে গেলেন ১৯১২ খ্রীঃ। মনেপ্রাণে সাহেব হয়েও মামা পরতেন ধুতি ও ফতুয়া। কলকাতার প্রগতিবাদী ব্রাহ্মসমাজে তখন তাঁর দারুণ চাহিদা। ভাল ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এলো। কিন্তু পরাধীন দেশের পরিস্থিতির কথা ভেবে মামা বললেন, তাঁর পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। "কারাগারে থেকে আমি কাউকে পৃথিবীতে আনতে পারবো না।"

আমেরিকায় স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন বড়মামা। বাড়িতে হাওয়াগাড়ি থাকা সত্ত্বেও ধুতি ও ফতুয়া পরে সেকেণ্ড ক্লাশের ট্রামে ঘুরে বেড়াতেন। পর্দার আড়াল থেকে ওঁর ইংরিজি উচ্চারণ শুনলে বোঝা যেতো না একজন ভারতীয় কথা বলছেন। বিলিতি সিগারেট বর্জন করে বড়মামা বিড়ি খেতেন।

আমেরিকা থেকে মেয়েদের সম্পর্কে অপার শ্রদ্ধা নিয়ে গিয়েছিলেন বড়মামা, যেমন ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। মিসেস হজসন নাম্নী এক বিদেশিনী মহিলার কাছে জ্যোতির্ময় ইংরিজি শিখতেন। এঁকে মাইনে দেওয়া হতো নতুন নোটে। বড়মামার নির্দেশ, "কোনো মহিলাকে পুরনো জিনিস দেবে না।" প্যাণ্টপরা ভাগ্নেকে বলতেন, "চোঙাটা যদি পরিস তা হলে পা নাড়াবি না।"

আমেরিকা-প্রবাসী বাঙালীদের সন্তানদের সম্পর্কে কথা উঠলো। জ্যোতির্ময় জানালেন, "কুড়ি বছর আগে যখন এসেছিলেন, তখন প্রত্যেক বাঙালী ছিল ঘরমুখো, দেশে ফিরবার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি। এখন আর সে-অবস্থা নেই। ছেলেমেয়েরা কেমন হচ্ছে, তা এখনও অনেকটা বাবা-মায়ের ওপরেই নির্ভর করে। কেউ-কেউ সাহেব হবার অতৃপ্ত কামনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিটিয়ে নিচ্ছেন। এঁদের ইচ্ছে, পিছুটান নষ্ট হয়ে যাক, ছেলেমেয়েরা এখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যাক। আরেক দল চাইছেন, দুই সভ্যতার ভাল

দিকটাই ছেলেমেয়েরা নিক।"

কোনো-কোনো বাড়িতে দু'ছেলে দু'রকম। বড় ছেলে হয়তো ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতিতে ডুবে রয়েছে। ছোট ছেলে সম্পূর্ণভাবে এদেশী। বাবা যখন বলেন, শরীরটা ভাল লাগছে না, সে তখন সম্পূর্ণ উদাসীন। সে ধরে নিয়েছে, দরকার হলে বাবা নিজেই ডাক্তারের কাছে যাবে। বাবার জন্যে আহা-উহু, এখন কেমন লাগছে বাবা, এসব ভাবপ্রকাশ করা অনর্থক।

যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা কষ্ট হলেও বাংলাভাষাটা ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে নেন। জ্যোতির্ময়বাবুর মতে এটা বিশেষ প্রয়োজনীয়, "কারণ মাতৃভাষার এতোই জোর যে সংস্কৃতিটা ওর মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়।"

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে জ্যোতির্ময়-এর। বললেন, "ওদের সম্বন্ধে ভাববেন না, ওরা অনেক বুঝে-সুঝে চলে। নিজেদের ঐতিহ্য ওরা হারিয়ে ফেলবে না, যদি না ওদের ঘাড়ে জুলুম করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়।"

জ্যোতির্ময়ের ছাত্রদের অনেকেই দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রজন্মের গ্রীক, ইতালিয়ান ইত্যাদি।

জ্যোতির্ময় বললেন, "এখন ওদের মধ্যে পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে—নতুন করে ভাষা শিক্ষা হচ্ছে। আবার ভাল লাগছে পিতৃপুরুষদের।"

জ্যোতির্ময় বললেন, "ভারতবর্ষীয়দের সম্পর্কে এদেশের মানুষদের একসময় খুব ভাল ধারণা ছিল। সবাই ধরে নিতেন, এঁরা উচ্চশিক্ষিত। এখন এই ধারণা ক্রমশ পাল্টাচ্ছে। সমস্ত মোটেল ব্যবসা প্যাটেলদের হাতে চলে যাচ্ছে। এর আগে ভারতীয়দের কখনও এতোটা চোখের সামনে দেখা যায়নি। নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্র স্টলগুলির বেশিরভাগ এখন ভারতীয়দের হাতে। জানি না, এখানকার স্থানীয় গরিবদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত না একটা ঠোকাঠুকি লেগে যায়!"

জ্যোতির্ময় তবুও বললেন, "আগে এখানে অনেক ভারতীয় ডাক্তার ছিল—এখন কেরালার নার্স পাবেন প্রচুর। ডাক্তারিতে বাঙালীদের প্রচুর সুনাম। অধ্যাপনা অথবা গবেষণার কথা নাই বা বললাম—এই নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়েই অন্তত এক ডজন অধ্যাপক পেয়ে যাবেন। বাঙালীদের যদি দেশ ছেড়ে কোথাও থাকতে হয়, তা হলে নিউ ইয়র্কই হলো এক নম্বর জায়গা।"

আবার দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালীদের বিয়ের কথা উঠলো। জ্যোতির্ময় বললেন, "বাঙালী-বাঙালী বিয়ের কিছু ঘটকালি করেছি। মুশকিল হলো, এদেশে প্রতিপালিত মেয়েরা বলে, ইণ্ডিয়ান ছেলেদের বোকা-বোকা লাগে। এদেশের পরিবেশে মানুষ হলে মেয়েরা অনেক স্বাধীনচেতা হয়। বাবা-মায়েরা

অবশ্য চান দেশের কারুর সঙ্গেই বিয়ে হোক। এর মধ্যে আশ্চর্য কিছু নেই। এদেশে থাকা গ্রীক বাবা-মা চান ছেলেমেয়ে গ্রীক বিয়ে করুক, ইটালিয়ানদের ইচ্ছে ছেলে ইটালিয়ান বিয়ে করুক। জাতের বাইরে বিয়ে করেছে বলে বাবা রেগে গিয়ে সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন, এমন খবরও আমার জানা আছে।"

গত বিশ বছরে পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কেও কিছু আলোচনা হলো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রগতির কথা কে না জানে ? জ্যোতির্ময় বললেন, "এই ক' বছরে মার্কিন দেশের বিত্তবৃদ্ধি হয়েছে দ্রুত, কিন্তু কোথাও যেন আদর্শচ্যুতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শৃঙ্খলা, নীতিবোধ ইত্যাদির মূল্য থাকছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশেও। সেই সঙ্গে বাড়ছে বেপরোয়া বাধা-বন্ধনহীন জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহ। আমেরিকানদের একটা অংশ এখন একটা ইংরিজি সেনটেন্স শুদ্ধভাবে লিখতে পারে না। বানানে এরা খুবই খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আগে একটা নিজস্ব ফিলজফি ছিল, এখন সবাই চাহিদা-ও-জোগানের জালে জড়িয়ে পড়ছে। দূরদৃষ্টি হারিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররা এখন স্বল্পমেয়াদী কাজকর্মের দিকে ঝুঁকছেন। শিক্ষার মধ্যে 'বানিয়া' মনোবৃত্তি বেড়েই চলেছে।"

সেক্সের ব্যাপারটা ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল—প্রকাশ্যে নির্লজ্জ দেহমিলন এখানে ডালভাত হয়ে উঠছিল। এখন রোগবিরোগের ভয়ে আবার কিছুটা যৌন-রক্ষণশীলতা ফিরে আসছে।

জ্যোতির্ময় মনে করিয়ে দিলেন, "বেপরোয়া সেক্সের উদ্দাম যাত্রা তুঙ্গে উঠেছিল মেয়েদের গর্ভনিরোধক পিল আবিষ্কারের পর, এখন এইডস রোগ এসে মোড় ফেরাতে বাধ্য করছে।"

জ্যোতির্ময় বললেন, "আমরা যেমন প্রতিনিয়ত এদের কাছ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা নিচ্ছি, এরাও কয়েকটা ভব্যতা আমাদের কাছ থেকে নিলে লাভবান হতে পারতো। যেমন ধরুন, এই করমর্দন—অতি বাজে জিনিস—রোগ ছড়ানোর পক্ষে খুব সুবিধে। আমাদের করজোড়ে নমস্কার খুব ভাল সিস্টেম।

"এদের কথা আর কী বলবো ! এতো সভ্য দেশ, কিন্তু হুদো-হুদো লোক রুটি ও খাবার কার্পেটের ওপর রাখছে। কুকুরকে চুমু খাচ্ছে—কোনো ঘেন্না নেই। রেস্তোরাঁয় থুতু দিয়ে প্লেট মোছা হচ্ছে। এরা বাইরে থেকে বাড়িতে ঢুকে জুতো পরেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। শোবার ঘরের মেঝেটা আমেরিকানদের কাছে রাস্তার কনটিনুয়েশন, আর জাপানী মতে ঘরের মেঝেটা হলো বিছানার বাড়তি অংশ। দুটো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক পার্থক্য।"

জ্যোতির্ময়ের পরবর্তী মন্তব্য, "এরা বড্ড বেশি কেমিক্যালস-এর ওপর

নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, ফলে ক্যানসার বাড়ছে। এরা কথায় কথায় এক্স-রে করে। অযথা ছুরি চালিয়ে অপারেশন করতে এরা খুব আনন্দ পায়—এমন নাইফ-হ্যাপি জাত আপনি দুনিয়ায় আর পাবেন না। বড়-বড় রোগের চিকিৎসায় যেমন এদের তুলনা নেই তেমন ছোটখাটো রোগের চিকিৎসায় এরা যা-তা। ঠিকমতো রোগ ধরতে পারে না, বলে বসে, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাও। আপনি লিখে রাখুন, এখানকার একশ্রেণীর ধড়িবাজ ডাক্তারদের ফিলজফি—'তোমার রোগ আমি সারাই চাই না সারাই তোমার টাকাটা আমার নিতেই হবে—হোয়েদার আই ট্রিট ইউ আর নট, আই নিড ইওর মানি। এখানকার বেশিরভাগ ডাক্তার 'শিক্ষিত' নয়, তারা টেকনিসিয়ানের মনোবৃত্তি নিয়ে প্র্যাকটিশ করে চলেছে।"

জ্যোতির্ময় বললেন, "জাত হিসেবে এরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। দরিদ্র এবং ক্রিমিন্যালকে এরা একই চোখে দেখে। এরা জানে না, পৃথিবীর সব দেশে বড়লোকরাই বেশি অপরাধের সঙ্গে জড়িত, আমাদের দেশে দরিদ্ররা ভিক্ষে করে, কিন্তু খুন করে না। আমাদের দেশে কষ্ট আছে কিন্তু হা-হুতাশ নেই। এরা ওই অবস্থায় পড়লে পাগল হয়ে যাবে। এরা কোনো কিছুর অভাব সহ্য করতে পারে না। মন খারাপ হলেই ছোটে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে।"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র পরীক্ষায় খারাপ করলো। খবর নিয়ে জানা গেলো, তার মন খারাপ—সম্প্রতি বালিকা বান্ধবীটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। মাস্টারমশাই তাকে বোঝাতে শুরু করলেন, একটি মেয়ে গিয়েছে তো কী হয়েছে? জীবনে আরও কত মেয়ে আসবে এখন বাছাধন একটু পড়াশোনায় মন দাও। আস্কারা জিনিসটা এই 'পারমিসিভ' সমাজে বড্ড বেশি দেওয়া হয়—বিশেষ করে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে।"

"আগে কলেজের অধ্যাপকদের একটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ছিল। পাছে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে তাঁরা নাইট ক্লাবে যেতেন না। এখন মাস্টারমশায়রা ছাত্রীদের সঙ্গে 'অ্যাফেয়ার' চালাচ্ছেন! দু' পক্ষই সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠছে—সান্নিধ্যের বদলে ছাত্রীরা মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে পরীক্ষায় ভাল গ্রেড চায়। ইংরিজিতে একেই বলে, মিউচুয়ালিটি অফ কনভেনিয়েনস্।"

ছাত্রীরা জ্যোতির্ময়ের স্ত্রী বকুলের কাছে এসে গুজ-গুজ ফিস-ফিস করে—কোন্ প্রফেসর কোন্ ছাত্রীকে বগলদাবা করেছে। কোনো মেয়ে বিশেষ অধ্যাপক সম্বন্ধে বলে, "ওঁর কাছে পি-এইচ-ডি করবো না, ওঁর ভাবগতিক ভাল নয়!"

"পারমিসিভনেস এই জাতটার গোড়াতে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে—অথচ কেউ এর থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না।" এই বলে গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন

জ্যোতির্ময় মিত্র।

জ্যোতির্ময়কে বললাম, "বন্ধু ধীরেন ঘোষ ছাড়া কুড়ি বছরের ব্যবধানে আমেরিকায় এবার একমাত্র আপনার সঙ্গেই দেখা হলো। কুড়ি বছর আগে তোলা নিজের ছবিটা দেখে নিজেকেও খানিকটা খুঁজে পেলাম।"

সুরসিক জ্যোতির্ময় বললেন, "যখন এসেছেন তখন মুখ বন্ধ রেখে চোখ, কান ও মগজ তিনটেরই সদ্ব্যবহার করুন। এই দেশে কোনো কিছুই স্থির নয়, শুধু আপনাকে অতি সাবধানে দেখতে হবে কোন্‌টা সামনে এগোচ্ছে আর কোন্‌টা পিছনের দিকে ছুটছে।"

পুরো একদিন মিছরিদা ডাউন! নিউ ইয়র্কে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বিছানাবন্দী। তবু আজ আমার সঙ্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন—নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা হবে।

আমি টেলিফোনে বলেছিলাম, "দু'দিনের জন্যে বিদেশে এসেছেন, বিদেশীদের সঙ্গে সময় কাটান। আমরা তো হাতের পাঁচ রয়েছি, দেশে ফিরে গিয়ে কাশুন্দেতে, বাজে শিবপুরে, ট্রাম ডিপোয় হরবকত দেখা হবে।"

মিছরিদা মজলেন না। বললেন, "ওরে, ওইভাবে তোর দর বাড়াস না। বিদেশ বিভুঁয়ে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ দেখা না হলে পেট ফুলে দম বন্ধ হয়ে যাবে—কত কথা জমে উঠছে বুঝতেই পারছিস।"

আমি টেলিফোনে নিচুগলায় বললাম, "কেন? আপনার ভাই, ভাই-ঝি, ভাই-বৌ হাতের গোড়ায় রয়েছে, ওদের একটু সঙ্গ দিন। ভাবের আদান-প্রদান হোক।"

টেলিফোনেই মিছরিদা দুঃখ করলেন, "ওরে এখানে শুধু ভাবের আদান-প্রদানের তেমন চান্স নেই—এমন কুম্ভীপাক এখানে যে ভাটপাড়ার ভট্‌চায্যিও কয়েকদিনে আমেরিকান হয়ে যাবে। মোহিনীমায়ায় অপরকে পটিয়ে নিজের করে নিতে এদেশের তুলনা নেই। প্রতি মুহূর্তে সাবধানে থাকতে হবে।"

মিছরিদাকে বলেছিলাম, ম্যানহাটানের কোনো কফিশপে দেখা হোক। কিন্তু মিছরিদার ওই যে সেন্ট্রাল পার্কের ওপর টান জন্মেছে তার থেকে মুক্তি নেই। বললেন, "বড্ড পুণ্যস্থান, স্বয়ং ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ কেত্তন গেয়ে প্রেমের বন্যা বইয়ে জায়গাটাকে পাপমুক্ত করেছেন।"

আমি পার্কের মধ্যে একটা বেঞ্চিতে বসে মিছরিদার জন্যে অপেক্ষা করছি।

সামনের বেঞ্চিতে এক কমবয়সী সুতনুকা শ্বেতাঙ্গিনী হাতে একখানা বই নিয়ে মাঝে-মাঝে পাতা উল্টোচ্ছে।

মহিলার টিশার্টের দিকে তাকাবার উপায় নেই! বুকের ওপর মুচমুচে ইংরিজিতে যা লেখা রয়েছে তার অর্থ হলো: "কি ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছো! এসো, আমাকে পটাও।"

মনে পড়লো, ক্লিভল্যাণ্ডের শ্যামল রায় বলেছিল, "আমেরিকানদের মতন এমন রসিক জাত দুনিয়ায় খুজে পাবেন না। গাঁটের কড়ি খরচ করে এরা নিজের সম্বন্ধেই ভাঁড়ামি করে। কিন্তু ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে তা যদি কেউ সরলমনে বিশ্বাস করে এবং সেইমতো এগোয় তাহলে খুব বিপদে পড়ে যাবে।"

আসলে সারাক্ষণ এখানে ইন্দ্রিয়কে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে—সেই সুড়সুড়িতে যদি মজেছো তো মরেছো। সরল আফ্রিকান ছেলেরা অনেক সময় বিপদে পড়ে যায়। ইণ্ডিয়ানরা অনেক ঘাগী—দু-তিন হাজার বছরের সামাজিক অভিজ্ঞতা ওদের অনেক বেশি মানিয়ে চলবার শক্তি জোগায়।

আমি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি মাঝে-মাঝে। আর ভাবছি এইটুকু-টুকু মেয়ের কি গার্জেন নেই? তাঁরা কি দেখেন না মেয়ে কি জামাকাপড় পরছে? শ্বেতাঙ্গিনী বালিকাও একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর বই বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো, "ওয়েটিং ফর সামবডি?"

"হ্যাঁগো, মা লক্ষ্মী। আমার খোদ দেশের লোক এখনই হাজির হবে।"

"পা-কি-স্তা-ন?" সুন্দরীর সকৌতূহল প্রশ্ন।

"কোন্ দুঃখে ভট্চায্যি বাউনের সন্তান পাকিস্তানি হতে যাবে? বেঁচে থাক আমাদের ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত।"

"ইন্ডিয়া!" মার্কিনী বালিকার কণ্ঠে বিস্ময়। "আমি তো ইন্ডিয়াতেই যেতে চাই।"

খুব ভাল। এসো মা লক্ষ্মী, পকেটমার পাঁচতারা হোটেলে থাকো, আমাদের দেশ দ্যাখো, নকল গয়নাগাঁটি কেনো, ডবলদামে কার্পেট সংগ্রহ করো—এসব তো খুব ভাল কথা।

মার্কিনী বালিকা বললো, "তোমরা মেয়েদের অপছন্দ করো কেন?"

"বালাই ষাট! কোন দুঃখে আমরা মেয়েদের অপছন্দ করবো? আমাদের দেশটাই তো মাতৃপূজার দেশ—মেয়েদের মাথায় করে রাখবার পরামর্শ মুনি-ঋষি থেকে আরম্ভ করে একালের সাধু-সন্ন্যাসী পর্যন্ত সবাই সারাক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন"।

বালিকা সরলমনে আমার দিকে তাকালো। "তাহলে বলতে চাইছো, নব-

বিবাহিতা বধূদের পুড়িয়ে ফেলতে তোমরা আনন্দ পাও না ?"

"ওসব খবরের কাগজের প্রোপাগাণ্ডা। কোথায় সামান্য কি একটা হয়ে গেলো, আর সেই নিয়ে হৈ চৈ বাধালো কাগজের সাংবাদিকরা। যেমন আমরা শুনি, এদেশে ঘরসংসার বলতে কিছুই থাকছে না ; বিয়ে ভেঙে ঝাড়া হাত-পা হবার জন্যে সবাই নাকি হনিমুনের পরের দিন থেকেই উঁচিয়ে আছে।"

মেয়েটি হেসে উঠলো। "জানো আমার দাদু-দিদিমার গোল্ডেন ম্যারেজ অ্যানিভারসারি হচ্ছে আগামী নভেম্বরে ?"

"তুমি কি নিউ ইয়র্কের লোক ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মোটেই না। আমি মিড-ওয়েস্ট থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি।"

"সে কি ! বাবা-মাকে সঙ্গে আনোনি ?"

"আমি কোথায় যাবো, কি করবো, কেমন ভাবে থাকবো, তার সঙ্গে আমার বাবা-মায়ের সম্পর্ক কি ? জীবনটা আমার, না আমার বাপ-মায়ের ?" স্বর্ণকেশীর ঝাঁকড়া মাথা ঝলমল করে উঠলো।

"তুমি একলা-একলা এইভাবে ঘুরে বেড়াও ? ভয় লাগে না ?"

তামারা হা-হা করে হেসে উঠলো। ইতিমধ্যে সে আমার পরিচয়ও কিছুটা নিয়েছে। হিসেব করে দেখেছি, আমার বড় মেয়ে ও তামারা একবয়সী।

তামারা জিজ্ঞেস করলো, 'ইংরিজিতে অনার্স পড়া তোমার মেয়ে কি কোনো স্বাধীনতা এনজয় করে না ?"

"ফ্রিডম বলতে কি বোঝায়, তার ওপর সব নির্ভর করছে, তামারা।" আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

তামারা বললো, "আমার এই একুশ বছর বয়সটা আবার ফিরে আসবে না—সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নেবো কিভাবে এই সময়টা আমি উপভোগ করবো। তোমার মেয়ের কি তার একুশ বছরের ওপর কোনো অধিকার নেই ?"

আমার মেয়ে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে না এলে আমরা চিন্তিত হই শুনে তামারা খিল-খিল করে হেসে উঠলো। "কাম্ অন্" আমার সঙ্গে রসিকতা কোরো না ! তুমি নিশ্চয় বলতে চাইছো না, তোমার মেয়ে কখন বাড়ি ফিরবে তা তার সুইট উইলের ওপর নির্ভর করে না !"

আমি নির্বাক। তামারা বললো, "গত ৮'সপ্তাহে আমি একবার মাত্র ফোনে মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আগামীকাল কোথায় থাকবো তা আমি নিজেই জানি না। নিউ ইয়র্কে এক বান্ধবী আছে। তাকে একটু আগে অফিসে ফোন করেছিলাম। সে বললো বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বিকেল পাঁচটায় ডেটিং অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। যদি সেটা শেষ মুহূর্তে ভেস্তে না যায় তা হলে আমার সঙ্গে দেখা হবে। একটু পরে আবার ফোন করবো।"

"গতকাল কোথায় ছিলে ?"

"বোস্টনে। সারাদিন মিউজিয়মে ছবি দেখেছি।"

"আজ যদি বান্ধবী সময় না দিতে পারে ?"

"কিছু এসে যায় না, কারণ দোষটা আমার। পুরুষবন্ধুর সঙ্গে ডেটিং ছেড়ে কোনো মেয়ে আমার পিছনে সময় নষ্ট করুক তা আমি নিজেই চাইবো না। আমি কোনো একটা দূর পাল্লার বাস-এ চড়ে বসবো। নিউ ইয়র্ক ছেড়ে শ'তিনেক মাইল দূরে কোথাও নেমে পড়বো, সেখানেই একটা মোটেলে রাত্রি কাটিয়ে দেবো।"

"তারপর ?"

তামারা বললো, "মিস্টার ইণ্ডিয়ান, 'তারপর' এখনও অনেক দূর—মোটেলে রাত্রিবাস করি, ভোর হোক, কফি খাই, তারপর ভাবা যাবে। এই নিউ ইয়র্কের সমস্যা কি জানো ? অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী লোকরা এমনভাবে আগাম পরিকল্পনা শুরু করে যে মৃত্যুকেও আসতে হবে আগাম অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে ! এদের জন্যে আমার দুঃখ হয়।"

"তোমার বাপ-মা কিছু বলেন না ?"

"কী বলবেন ? জীবনটা আমার, তাঁদের নয়। তাঁদের জীবন তাঁরা কীভাবে চালাতে চান তা তাঁরা ঠিক করুন।"

আরও কিছু কথাবার্তা হলো। তামারা কিন্তু মাঝে-মাঝেই আমাকে আক্রমণ করতে লাগলো, নিজের মেয়ের ব্যাপারে আমরা কেন এতো বেশি নাক গলাই ? "মেয়েকে তোমরা ছেড়ে দেবে না কেন ? সন্ধ্যা ছ'টায় মধ্যে তাকে বাড়ি ফিরতে হবে কেন ?"

দূর থেকে মিছরিদাকে দেখা গেলো। এ কি সাজ মিছরিদার আজ !

"মিছরিদা, আপনিও !" আমি না বলে পারলাম না।

একগাল হেসে মিছরিদা বললেন, "তুই আমার নিউ ড্রেশ দেখে অবাক হচ্ছিস ! এ-সবই আমার ভাইঝির ষড়যন্ত্র। ভাবী জামাইবাবাজী আমার নামাবলী, পাঞ্জাবী, ধুতি এইসব নিয়ে আমাকে এই টি-শার্ট এবং জিন্‌স উপহার দিয়েছে।"

"টি-শার্ট পরুন ! কিন্তু তাই বলে তার ওপর ওইসব কথা লেখা থাকবে ?"

"ওরে আমার অবস্থাটা একটু বিচার-বিবেচনা কর ! আমাদের দেশে যত নোংরা কথা লোকে টয়লেটের দেওয়ালে লেখে, আর এখানে ওইসব কথা দিয়েই টি-শার্ট তৈরি হয়। আমাকে দু'খানা শার্ট দেখালো জামাইবাবাজী। একটাতে লেখা—'আমাকে চাবুক মারো, ধোলাই দাও', আর একটাতে লেখা

'লাভ'। ভাবলুম চাবুক খাওয়া থেকে প্রেম চাওয়া ঢের ভাল।"

"মিছরিদা আপনার বয়স অনেক হলো—এখন বুকের ওপর এই 'লাভ'-এর ছাপ নিয়ে আপনি হাওড়া কাশুন্দেতে বাজার-হাট করতে পারতেন?"

ঠোঁট উলটোলেন মিছরিদা। "বুঝছি তো সব। কিন্তু যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার। এখানে এখন স্পেশাল দোকান হয়েছে—তুই যা অর্ডার করবি তাই ফটাফট টি-শার্টের ওপর লিখে দেবে। এই যে 'লাভ'-মার্কা টি-শার্ট নিলাম তার একটা কারণ—এর দাম সবচেয়ে বেশি।"

"কারণ কী, কাপড়টা বেশী দামী?"

"ধীরে বৎস ধীরে। একদিন ঠাণ্ডা লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে থেকে আমি অনেক নতুন জ্ঞান অর্জন করেছি। ভাবী জামাতাবাবাজীর এক বান্ধবী 'মার্কিন সমাজে প্রেমের প্রকাশ' সম্পর্কে গবেষণা করছে, তারই একটা পরিচ্ছেদ আমাকে গতকাল পড়তে দিয়েছিল। তার মুখেই শুনলাম, আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন চিন্তিত হয়ে উঠেছেন যে পুরুষমানুষরা জন্মদিনে খুবই কম 'লাভ' পাচ্ছেন, ছোট ছেলেদের কপালে 'লাভ' জুটছে আরও কম।"

"সাধে কি আর নদের নিমাইয়ের প্রতিপত্তি বাড়ছে এই দেশে! প্রেমের দেশে প্রেমখরা হলে একদিন প্রেমবৃষ্টি নামবেই প্রেমকীর্তনের মাধ্যমে।"

"ব্যাপারটা কী, মিছরিদা?" আমি একটু ব্যাখ্যা চাইছি।

মিছরিদার উত্তর: "খুব সোজা ব্যাপার। গ্রীটিং কার্ডের বাণী এবং টি-শার্টের ওপর কী লেখা হচ্ছে তা নিয়ে জোর গবেষণা চালাচ্ছেন সমাজতাত্ত্বিকরা। মার্কিনীদের মন কোন্ দিকে যাচ্ছে তা ওইসব লেখা থেকেই নাকি বোঝা যায়।"

"মিছরিদা, বড়দিনে, জন্মদিনে, বিবাহবার্ষিকীতে, অসুখ করলে এবং যে কোনো স্মরণীয় দিনে আমেরিকানরা গ্রীটিং কার্ড কিনে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের পাঠায়, ব্যাপারটা সামান্য জিনিস।"

চোখ বড়-বড় করলেন মিছরিদা। "মোটেই সামান্য জিনিস নয়। ভবিষ্যৎ জামাতাবাবাজীর পাঠানো প্রতিবেদন পড়ে জেনেছি—আমেরিকানরা মুখোমুখি অথবা চিঠির মাধ্যমে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে ক্রমশই অপারগ হচ্ছে; অথচ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্করক্ষায় ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাকি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই দেশজুড়ে এই গ্রীটিং কার্ডের ব্যবসা রমরমা হচ্ছে। কার্ড কোম্পানিরা লাখ-লাখ ডলার ফি দিয়ে দুঁদে মনোবিজ্ঞানীদের নিয়োগ করছেন খুঁজে বের করবার জন্যে কোন্ সময়ে কোন্ কথা বললে মানুষের ভাল লাগে। সেই সব কথা দিয়ে কার্ড তৈরি হচ্ছে—চলছে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা। কার্ডের দোকানে গিয়ে মুখচোরা আমেরিকান খুঁজছে কোন্ কথাটা প্রাপকের ভাল লাগবে।"

"ধর, এই 'ভাল-হয়ে ওঠো' (গেট ওয়েল) কার্ড। তোর যদি ম্যালেরিয়ায় দেড় সপ্তাহ আপিস যাওয়া বন্ধ থাকে তাহলে যে-কার্ড ভাল লাগবে, হাঁটুর হাড় ভাঙলে সে-কার্ড না-ও ভাল লাগতে পারে। যদি ব্রেনে টিউমার সন্দেহে হাসপাতালে বন্দী থাকিস, তাহলে 'চটপট সেরে উঠে বাড়ি এসো' বউয়ের কাছ থেকে এই কার্ড তোর নিষ্ঠুর রসিকতা মনে হতে পারে। প্রত্যেক অবস্থার সাইকোলজি বুঝে কার্ড লিখছেন দেশের সেরা বুদ্ধিজীবীরা, তবেই না কার্ড কোম্পানির বিক্রি তরতর করে বেড়ে যাচ্ছে। হাওড়া কাশুন্দেতেও লোকের অসুখ করে কিন্তু সেখানে ব্যাপারটা অনেক সোজা। একখানা পঁয়ত্রিশ পয়সার ইনল্যাণ্ড ফর্মে লিখলেই হলো, 'ঠাকুরের আশীর্বাদে আপনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন'। এখানে মঙ্গলময় ঠাকুর, শ্রীভগবান এসব কথা জীবিত অবস্থায় কেউ তেমন শুনতে চায় না। তাদের প্রত্যাশা রসিকতার মারপ্যাঁচ, যার মধ্যে থাকবে সাইকোলজির মশলা।"

মিছরিদা বললেন, "কার্ড কেম্পানি টু-পাইস কামাবার জন্যে কোন্ বছরে কোন্ কার্ডে কী লিখছে তার ওপর নজর রাখছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের বাঘা-বাঘা গবেষক ও গবেষিকারা। যেমন ধর ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ওয়েস্টার্ন লুইসিয়ানা। এঁরা প্রায় হাজারখানেক কার্ডের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে ভালবাসার প্রকাশের ওপর আমেরিকান সমাজ যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও কার্ডে 'লাভ' কথাটা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। 'ভালবাসা নাও' অথবা 'তোমার ভালবাসা আমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে' এরকম কোনো ইঙ্গিতই এ-বছরে পাওয়া যাচ্ছে না কার্ডের বাজারে।"

"ভালবাসার হিসেব-নিকেশ কি ওইভাবে করা যায়, মিছরিদা?" আমাকে বলতেই হলো।

"এ-জাত তো সব কিছুই হিসেব করে গ্রহণ করে, ব্রাদার। সমাজে কোথায় সামান্য কি পরিবর্তন হচ্ছে তা গবেষকরা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারছেন। শোন্, এই কার্ডের ব্যাপারে পণ্ডিতরা কী দেখতে পাচ্ছেন? মেয়েরা এখনও কার্ডে কিছু 'লাভ' পাচ্ছেন, কিন্তু পুরুষ মানুষরা যে-সব কার্ড পাচ্ছেন তাতে 'লাভ' নেই বললেই হয়। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ আত্মীয়—যেমন বাবা, ভাই, ছেলে—এঁদের 'লাভ' জানাবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, কারণ দোকানে ওই ধরনের কার্ড রাখাই হচ্ছে না। দোকানিদের বক্তব্য, পুরুষদের মন অনেক শক্ত, তাঁদের সাধারণত 'লাভ' জানানোর রেওয়াজ নেই এ-বছরে।"

"মিছরিদা, এ-দেশের পুরুষমানুষরা তাহলে কি জীবনের স্মরণীয় দিনগুলোতে 'লাভ' থেকে বঞ্চিত থাকবে?"

মিছরিদা বললেন, "আমিও ওইরকম দুশ্চিন্তা করছিলাম। ভাবী জামাতাবাবাজী তখন ওঁর বান্ধবী গবেষককে ফোন করলো, রহস্যটা কী? তারপর একগাল হেসে জানালো, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন। প্রায় সব কার্ডের দাম নব্বই সেণ্ট, কিন্তু 'লাভ'-এর উল্লেখ থাকলেই কার্ডের দাম হয়ে যাচ্ছে এক ডলার দশ সেণ্ট। আমেরিকানরা ভীষণ হিসেবী জাত—স্রেফ বাপকে ভালবাসা জানাবার জন্যে তারা কুড়ি সেণ্ট বাড়তি খরচ করতে রাজি নয়। যতক্ষণ না ভালবাসার কার্ডের দাম কমছে ততক্ষণ ভালবাসা না-জানিয়েই ছেলেমেয়েরা চালিয়ে দেবে।"

"মিছরিদা, আপনার টি-শার্টে আজে-বাজে যাই লেখা থাকুক, আপনার বয়স এখন কুড়ি বছর কমে গিয়েছে।"

মিছরিদা খুশি হলেন। বললেন, "আরও দশ বছর কমতো, যদি না এখানকার কয়েকটা হাঙ্গামায় মাথা ঘুরে যেতো।"

"বিদেশে কীসের হাঙ্গামা, মিছরিদা?"

"এই বিয়ের ব্যাপার ধর। লক্ষ কথা না হলে ইণ্ডিয়াতে বিয়ে হয় না তা দুনিয়ার সবাই জানে। আমি শুনেছিলুম, বিয়ে-শাদির ব্যাপারে এদেশের লোকদের ওপর তত লৌকিকতার চাপ নেই। ছেলে অথবা মেয়ের বিয়ে বলে বাপ-মায়ের ছ'মাসের ঘুম চলে গেলো ওসব কারবার এদেশে নেই। আমাদের অবশ্য অন্য ব্যাপার। আমি কাশুন্দে থেকেই চিঠি লিখে আমার ভাই বাতাসাকে বলেছিলুম, বিদেশে নিজের কন্যাদায় সারছো বলে লোক-লৌকিকতার যেন খামতি না হয়। সেই মতন এই নিউ ইয়র্ক থেকে পৌনে-তিনশ আত্মীয়কে এয়ারমেলে নেমন্তন্নর চিঠি ছেড়েছে আমার ভাই এবং ভাই-বউ। চিঠি হয়েছে বড়দার নামে—যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর ইত্যাদি—সায়েব পাত্রপক্ষের বংশপরিচয় ইত্যাদিও দেওয়া হয়েছে। ইণ্ডিয়ার আত্মীয়রা কেউ আসবে না, তবু চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভাবী জামাইবাবাজী নিজেই অনেক চিঠির খাম লিখেছে। যদিও আমি বলেছি ভাবী জামাইকে দিয়ে কেউ এসব কাজ করায় না।"

মিছরিদা বললেন, "তারপর ভাই-বউয়ের কাছে যা গল্প শুনলাম, তাতে বেশ ভয়-ভয় করতে লাগলো। বিয়ে যারই হোক, কাদের নেমন্তন্ন করা হবে তা চিরকাল আমিই ঠিক করে এসেছি। দাদার তিন মেয়ে, দুই ছেলে ও আমার দুই ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত আত্মীয়দের তালিকা আমিই তৈরি করেছি। পৌনে তিনশ পরিবারের মধ্যে আড়াইশ নাম-ঠিকানা স্মৃতি থেকেই লিখে দিতে পারি। এ-বারেও তাই করেছিলাম।"

কিন্তু ভাই-বউ বললো, "এই ওয়েডিং গেস্ট-এর তালিকা তৈরি নিয়ে আমেরিকান সমাজে বেশ উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। ভাই-বউয়ের ছোটবোনের

বিয়েতে ব্যাপারটা অনেকখানি গড়িয়েছিল।"

"তালিকা নিয়ে খিটিমিটি আজকাল দেশেও হচ্ছে মিছরিদা। সবাইকে আর নেমন্তন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না।"

মিছরিদা বললেন, "হাওড়ায় মতবিরোধ হলে তুই হয়তো বউমার সঙ্গে একদিন কথা বললি না, কিংবা বাড়িতে গম্ভীর হয়ে বসে রইলি। এখানে কী হচ্ছে জানিস?"

আমি মিছরিদার মুখের দিকে তাকালাম। এখানে যা হয় তা একটু স্টাইলেই হয় তা আন্দাজ করতে পারছি।

মিছরিদা বললেন, "বিবাহোৎসবে অতিথি নির্বাচনের চাপ সহ্য না করতে পেরে আমেরিকানরা ছুটেছে সাইকোলজিস্ট অথবা সাইকোথেরাপিস্টের কাছে!"

বিয়ের কার্ডের ব্যাপারে সাইকোলজিস্টরা কী করবেন?"

"এদেশের সাইকোলজিস্টরা ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সব ব্যাপারে আছেন! আমাদের দেশে গুরুদেবের ভূমিকাটি নিয়েছেন এই সাইকোলজিস্টরা। তোর জন্যে একটা কাগজের কাটিং এনেছি, রেখে দে কোনো সময়ে তোর কাজে লেগে যাবে। বুঝবি, বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতদের লিস্টি তৈরি করা কত কঠিন ব্যাপার।"

সংবাদপত্রের কাটিং পড়ে ফেললাম। ক্যাথি মেয়ার (৩২) এবং ডঃ ডোনাল্ড জেমস (৩৬) খুবই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন তাঁদের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে ভোজসভার অতিথি তালিকা পাকা করতে গিয়ে। প্রথম তালিকায় ২৮০ জনের নাম উঠেছে—কেটেকুটে ১০০ করতে হবে। ভাবী বধূ বলেছে, ১০০ জনের বেশি লোককে তার বাবা-মা আপ্যায়ন করতে পারবেন না। বরের দুশ্চিন্তা, যাঁদের নেমন্তন্ন করা হবে না তাঁরা হয় রেগে যাবেন, না হয় মনোকষ্ট পাবেন। নবজীবনের শুরুতেই এঁদের সঙ্গে সম্পর্কের অধঃপতন হবে এবং বন্ধুত্ব নষ্ট হবে।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট মেরিলিন রুমানের মতে, চিন্তারই ব্যাপার। বিয়েতে নেমন্তন্ন না পাওয়ায় অনেক সম্পর্কের শোচনীয় অবনতি হচ্ছে, অনেক বন্ধুত্ব চিরদিনের মতন নষ্ট হচ্ছে।

ডঃ ম্যাগডফ আমেরিকার আর একজন খ্যাতনামা সাইকোথেরাপিস্ট। তিনি সাবধান করে দিচ্ছেন—লিস্টি বানাবার সময় নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে সম্পর্কটা খতিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু এই মূল্যায়ন সোজা কাজ নয়, মনের ওপর বেশ চাপ পড়ে। প্রথমে দেখতে হচ্ছে, লোকটি আমার কতখানি আপনজন। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে তাঁর উপস্থিতি কতখানি কাম্য তাও হিসেব করে দেখতে হবে এবার।

আরেকজন সাইকোলজিস্ট বলছেন, আগেকার দিনে বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হতো আত্মীয়স্বজন এবং ছেলেবেলার বন্ধুদের। কিন্তু এখন কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীদের এবং অন্য বন্ধুদেরও বলবার প্রয়োজন হচ্ছে। আগে ভোজসভার খরচটা দিতেন কনের বাবা-মা, ফলে তাঁরাই ঠিক করতেন, কাকে নেমন্তন্ন করা হবে, কাকে করা হবে না। এখন যাদের বিয়ে তারাই ভোজের খরচ বহন করছে, ফলে তারাও চাইছে অতিথি তালিকা প্রস্তুতিতে তাদের মতামত থাকবে।

ডঃ জোন ম্যাগডফ বলছেন, এখন অতিথি নির্বাচন পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বাবা-মায়ের প্রায়ই খটাখটি লাগছে। "বর কনে অভিযোগ করছে, চান্স পেয়ে কনের মা তাঁর তাসের আড্ডার বান্ধবীদের ডাকছেন, বরের বাবা নেমন্তন্ন পাঠাতে চাইছেন তাঁর ব্যবসায়িক সহযোগীদের। বর এবং কনে ডাক্তারের কাছে অভিযোগ করছেন, বাবা-মা তাঁদের সামাজিক দায়গুলো ফোকটে ছেলেমেয়েদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন!"

সাইকোলজিস্টরা মোটা ফিয়ের বদলে ভুক্তভোগীদের প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, "ধৈর্য হারালে চলবে না। বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া না করে, ওঁদের একটা ছোট্ট কোটা দিয়ে দাও—ওই সংখ্যার মধ্যে ওঁরা যাঁকে খুশি তাঁকে নেমন্তন্ন করুন। তালিকার সিংহভাগ রেখে দাও পাত্র-পাত্রীর পছন্দসই অতিথিদের জন্যে।"

একজন বিশেষজ্ঞ মাথা খাটিয়ে আর-এক পথ বের করেছেন। "যাদের নেমন্তন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের আলাদা-আলাদা চিঠি দিয়ে জানাও, খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্থানাভাববশত বিবাহবাসরে নেমন্তন্ন করা সম্ভব হলো না—ত্রুটি মার্জনীয়।"

ডঃ ম্যাকলোউইটস নামে ধুরন্ধর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তাঁর চেম্বারে রোগীদের পরামর্শ দিচ্ছেন—খানাপিনা একদিনে শেষ না করে এক-এক দলকে এক-এক দিনে আসতে বলো। নিকট আত্মীয়রা ও প্রিয় বন্ধুরা আসুক বিয়ের দিন, পাত্রীর অফিসের সহকর্মীরা বিয়ের আগেই একটা লাঞ্চে যোগ দিক, পাত্রের ছোটবেলার ইয়ার বন্ধুরা বিবাহলগ্নের এক সপ্তাহ আগে আইবুড়ো পার্টিতে আসতে পারে, আর কিছু সুনির্বাচিত দম্পতি আসুক নতুন দম্পতির নতুন ফ্ল্যাটে, ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের মাঝামাঝি সময়ে, আমেরিকান ইংরিজিতে যাকে বলে 'ব্রাঞ্চ'।

এইভাবে দল ভাগ করে দেওয়া নাকি অন্য কারণেও যুক্তিযুক্ত। একজন সাইকোলজিস্ট সাবধান করে দিচ্ছেন—"বিয়ের দিনে আপনার অফিসের বড়কর্তা আপনার মায়ের কাছ থেকে ছোটবেলায় আপনি কীরকম দুষ্টু ছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে খুব উৎসাহী না হতে পারেন। তার বদলে বড়কর্তা হয়তো আপনার নতুন অ্যাপার্টমেন্টে ডিনারে এসে আপনার স্বামীর অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে টেনিস সম্পর্কে ভাবের আদানপ্রদান করে আনন্দ পেতে

পারেন।"

মিছরিদা বললেন, "আমেরিকানরা বড্ড মেথডিক্যাল জাত। যা কিছু করে, তা কেন করছে তা খতিয়ে দেখে নেয়। বল দিকি, বিয়েতে আমরা লোকজনকে নেমন্তন্ন করি কেন?"

আমি মাথা চুলকে উত্তর দিলাম, "না করে উপায় নেই তাই লোকে নেমন্তন্ন পাঠায়—যাকে বলে কি না দায়মুক্ত হওয়া।"

"হলো না"।

মিছরিদা শুনিয়ে দিলেন, "তুই যদি ফি দিয়ে এই বিষয়ে আমেরিকান সাইকোলজিস্টের পরামর্শ নিতে যাস, তা হলে তিনি তোকে চুপি-চুপি পরামর্শ দেবেন—শুভদিনে কে কে এলো নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এটাই বড় কথা নয়, আসল কথা হলো যাদের তুমি ভালবাসো, যারা তোমায় ভালবাসে তোমার জীবনের স্মরণীয় দিনে তোমার আনন্দ ভাগ করে নেবার সুযোগ তাদের দিলে কি না।"

আমি বললাম, "সবই বুঝলাম মিছরিদা, কিন্তু এইসব পরামর্শ দেবার জন্যে আমাদের দেশে কেউ ফি চার্জ করে না।"

"করে না বোকা বলে! একটু ধৈর্য ধর, এমন দিন আসছে যখন আমাদের হাওড়া-কাশুন্দেতেও বিনা টাকায় কেউ কোনো পরামর্শ দেবে না। আমার ভাই বলছিল, সব ভালবাসা ফ্রি পেয়ে-পেয়েই বাঙালী জাতটার টুয়েলভ-ও-ক্লক বেজে গিয়েছে।"

নিউ ইয়র্কের পরে আমেরিকার এই শহরে যিনি আমাকে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর বাড়িটি নয়নাভিরাম। বেঁচে থাক এদেশের স্থপতিরা। প্রবলা-প্রকৃতির বিভিন্ন দৌরাত্ম্যের কথা স্মরণে রেখেও এঁরা শহরতলিতে যে-সব বাড়ি তৈরি করে চলেছেন তা শুধু দৃষ্টিনন্দন নয়, প্রতিটি যেন অতুলনীয় শিল্পকর্ম।

ক্লিভল্যাণ্ডের সুনন্দা দত্ত একবার বলেছিল, প্রকৃতি যেমন এদেশের মানুষকে উজাড় করে দিয়েছে, মানুষও তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে প্রণয় জমিয়েছে সর্বত্র।

সুনন্দার বিপণন-বিশেষজ্ঞ গবেষক স্বামী অসীম দত্ত টীকা যোগ করেছিলেন, "অথচ এদেশে প্রকৃতিকে ভালবাসতে গেলে অনেক গতর খাটাতে হয়। তার ওপর আছে শীতের দোর্দণ্ড দাপট।"

আমি যেখানে আশ্রয় নিয়েছি তাঁদের বাড়ির পিছনে অনেকখানি খোলা

জায়গা—সেখানে ঘন সবুজের সমারোহ। দিশি মাপে প্রায় একখানা ফুটবল খেলার মাঠ। এই মাঠে ঘাসের কার্পেট বসবাসযোগ্য রাখবার জন্যে পরিবারের সভ্যদের যথেষ্ট মেহনত করতে হয়। কিন্তু পরিশ্রমটা বৃথা যায় না। মনে হয় যেন রূপকথার রাজ্যে বসবাস করছি—যার নমুনা আমাদের দেশের হতভাগ্য মানুষরা একমাত্র রূপালী পর্দায় হিন্দী সিনেমার নায়ক-গৃহ ছাড়া যা কোথাও দেখতে পান না। বেঁচে থাক বোম্বাই সিনেমা—এঁদের দয়ায় অল্প খরচে মানুষ কয়েকঘণ্টা অন্তত স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়।

আমার গৃহস্বামী বাড়ির বাগানে দোলনার ব্যবস্থা রেখেছেন। দুর্বল মুহূর্তে বলেছিলেন, "চাঁদনী রাতে এই দোলনায় দুলতে দুলতে আমরা দেশের ঝুলন পূর্ণিমার স্বপ্ন দেখি।"

লজ্জায় যা গৃহস্বামীকে বলতে পারলাম না, গুপ্তপ্রেস পাঁজির পাতা ছাড়া আর কোথাও বহু বছর ধরে শহরবাসী বাঙালীরা ঝুলন পূর্ণিমার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পায় না। গ্রামে মানুষের দোলায় দুলবার জায়গা আছে, সুযোগ আছে, কিন্তু মানসিকতা নেই। অভাবে-অনটনে পৃথিবী সত্যি গদ্যময়—পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি না-হলেও, কবি ও চিত্রতারকাদের বিলাসের সামগ্রী।

গৃহকর্ত্রী অনুরাধা এক নম্বর বঙ্গললনা বলতে যা বোঝায়, তাই। বাঙালী বধূর বুকের মধুর সঙ্গে যখন মার্কিনী নৈপুণ্য মিশে যায় তখন সে এক অপরূপ সৃষ্টি—পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি। যে-বাঙালিনী একুশ বছর পর্যন্ত কলকাতার রান্নাঘরে কয়লার উনুনের বেশি কিছুর সঙ্গে পরিচিতা হয়নি, সে কেমনভাবে পরবর্তী আট-ন' বছরে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনিক ও মেকানিক্যাল সাজসরঞ্জামের ব্যবহারে এমন নিপুণা হয়ে উঠলো তা ভাবলে একটা জিনিসই বলা যায়, তা হলো এই দুনিয়ায় বাঙালী মেয়েদের তুলনা নেই। দেবী দশভূজাকে যে মহাঋষি প্রথম মানসনেত্রে কল্পনা করেছিলেন তিনি নিশ্চয় বাঙালী রমণীদের সম্বন্ধে যথেষ্ট খবরাখবর রাখতেন!

অনুরাধার মতো শান্ত বাঙালিনীর গর্ভে কী করে এমন একটি দুরন্ত বেপরোয়া মার্কিন নাগরিকের জন্ম হলো তা স্বয়ং ভগবানই জানেন। সাত বছরের এই মিনি মার্কিনীটির নাম জন, যদিও ওর মা দুঃখ করলেন, "নাম রেখেছিলাম, জয়ন্ত, কিন্তু ইস্কুলে গিয়ে কী করে যে জন হয়ে গেল জানি না।" এমনি করেই জহর হয়েছে 'জো', অনাদি হয়েছে 'অ্যানডি' রণজিৎ হয়েছে 'র‍্যান', হরিন্দর সিং হয়েছে 'হ্যারি'—অমোঘ প্রকৃতির নিয়মে বৃহৎ সমাজ ছোট সমাজকে গ্রাস করে ফেলবেই একদিন।

স্নেহময়ী অনুরাধা সমস্তদিন ধরে শুধু আমার আদর-আপ্যায়নেই ব্যস্ত থাকেনি, আমার জামা-কাপড় কেচে ইস্ত্রি করেছে, শোফারের দায়িত্ব নিয়ে স্থানীয়

বাজার, পোস্ট অফিস ও ট্রাভেল এজেন্টের অফিস ঘুরিয়ে এনেছে। এই নিপুণা ড্রাইভারকে দেখে কে বলবে অনুরাধার বাপের বাড়ি এমন সরু গলিতে যেখানে রিকশ ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনের প্রবেশ অসম্ভব ?

বেঁচে থাকুক এই এক্সপোর্ট কোয়ালিটির বাঙালী ! এরা যদ্দিন আছে তদ্দিন বাঙালী একেবারে ভূগোল থেকে মুছে যাবে না। যদি মূল ভূখণ্ডে কোনো অঘটন ঘটেও যায়, তাহলে সমুদ্রের ওপার থেকে এই স্পেশাল বীজ আনিয়ে নতুন করে বাঙালী চাষ করা যাবে।

বিকেলের দিকে অনুরাধার একটি ব্যবহারের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। প্রায় অচেনা একজন দেশের লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে-রমণী এমন সহৃদয়া, যে বার-বার আমাকে অন্তর থেকে বলছে এলেনই যখন বউদিকে নিয়ে এলেন না কেন, সেই অনুরাধা সাত বছরের ছেলের বন্ধুদের ব্যাপারে ইংরিজিতে যাকে বলে 'বরফ ঠাণ্ডা'।

জয়ন্ত ওরফে জন বললো, "মা, পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে আমাদের মাঠে খেলাধুলো করবো।"

এক মুহূর্তেই প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেলো। জন রেগে উঠলো। "আমি আমার বন্ধুদের আনতে চাই, মা।"

মায়ের কাটা উত্তর, "ইচ্ছে হলে তুমি একলা গিয়ে আমাদের মাঠে খেলো।"

"তোমার জানা উচিত, একলা খেলা যায় না"। জনের প্রতিবাদ।

"তাহলে পিয়ানো নিয়ে প্লে করো।"

"আমি খেলবো, মা।"

"এরকম করলে তোমার বাবাকে ফোন করতে হবে।" মায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।

আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। জনের স্থানীর বন্ধুরা কি অত্যন্ত দুষ্টু ? তারা কি ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে দেয় ? অনুরাধা কি চায় না, জন এই সব ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করে ? এই বয়সের বালককে সমবয়সী বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তা ভাল ফল হতে পারে না।

মা শেষ পর্যন্ত আড়ালে জনকে নিয়ে গিয়ে আরও কঠোর মনোভাবের ইঙ্গিত দিলেন এবং আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। এমন সুন্দর মাঠে ছোটরা যদি না খেললো তা হলে এতো যত্নে বাগান করে লাভ কী হলো ?

আমার সম্মানে আজ সকাল-সকাল বাড়ি ফিরলো গৃহকর্তা সুশান্ত সেন। সুশান্তর বাবা কলকাতায় ওকালতি করতেন। ওকালতির ওপর বিশ্বাস না থাকায় সুশান্ত প্রথমে অপারেশন রিসার্চে বিশেষজ্ঞ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এম-

বি-এ। এদেশের ভাষায় এই ধরনের সফল উঠতি যুবকদের বলা হয় 'য়ুপি'। এরাই এখন আমেরিকান যুবতীদের নয়নের মণি এবং জনক-জননীর গর্ব।

সুশান্তর কাছে অনুরাধা যথাসময়ে জনের আব্দারের প্রসঙ্গ তুললো। আমি ভেবেছিলাম, পিতৃদেব অন্তত জনকে সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে নিজের মাঠে খেলতে অনুমতি দেবে।

কিন্তু সে-ও চিন্তিত হয়ে উঠলো। গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলো, "খেলতে দাওনি তো ? খবরদার দিয়ো না। ঘটিবাটি বেচে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে হতে পারে। জয়ন্তর খুব ইচ্ছে হলে অন্য কোনো বন্ধুর বাড়িতে খেলুক। বন্ধুর মায়েরা কীরকম চালাক হয়ে যাচ্ছে দেখেছো ? সবাই চাইছে অন্যের মাঠে খেলা হোক। তুমি সোজা জনকে বলে দেবে, তোমার বাবা এতো বড়লোক না যে নিজের মাঠে তোমার বন্ধুদের খেলতে নেমন্তন্ন করবে।"

ব্যাপারটা যখন আমার বুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন সুশান্ত বললো, "আপনি এখানকার হাসপাতাল দেখে বলেছিলেন, এদেশে যম ভয় করে ডাক্তারকে। কিন্তু ডাক্তাররা কাকে ভয় করে বলুন তো ?"

"মাফিয়াদের ?"

"হলো না। আর একটা সুযোগ দিচ্ছি !"

"খুব বেশি রোজগার হলে ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে ?"

"হলো না। ডাক্তাররা একমাত্র যাকে ভয় করে তার নাম উকিল—আপনার বাবা, আমার বাবা যে-লাইনে ছিলেন। আমার বাবা তো একবার এদেশে এসেছিলেন। কাণ্ডকারখানা দেখে বললেন, তুই কষ্ট করে ল' ডিগ্রিটা নিয়ে নে। ভগবান তো এদেশটা উকিলদের জন্যেই তৈরি করেছেন !"

সুশান্ত বললো, "কলকাতায় যদি কেউ শোনে নিজের মাঠে আমি নিজের ছেলের বন্ধুদের খেলতে দিচ্ছি না, তা হলে ভাববে আমি আর একটি 'সেলফিশ জায়েণ্ট', কিংবা আমার কোনো মাথার ব্যামো হয়েছে। কিন্তু এখানে সবাই আমার অবস্থাটা বুঝবে, বিশেষ করে যাদের বিষয়সম্পত্তি আছে।"

অনুরাধা বললো, "মামলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়। কিছু হয়ে গেলে, মোটা ক্ষতিপূরণের দায় যা আমাদের মতন মানুষের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব।"

"ভাই সুশান্ত, আমি সায়েব উকিলের বাবু হিসেবে হাইকোর্টে জীবন শুরু করেছিলাম, আর একটু আলো ফেলো।"

এবার সুশান্ত যা বললো তা এই রকম ঃ মরিস ও রোজালিণ্ড ফ্রিডম্যান পাড়ার ছেলেমেয়েদের তাঁদের বাগানে এসে যখন খুশি খেলাধূলা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁদের মত ছিল, আমাদের পাঁচটি ছেলেমেয়ে রয়েছে, সবাই মিলে যত খুশি খেলুক বাড়ির পিছনের বাগানে। সিলভিয়া বলে ন'বছরের

একটি মেয়েও একদিন দোলনায় উঠেছিল এবং দোলনা ঠেলছিল পড়শী দুটি বোন—ডেবোরা ও লিজা রোজেনবার্গ। দোলনায় খেলতে গেলে যা হতেই পারে, সিলভিয়ার হঠাৎ পা ভেঙে গেলো। শ্রীমতী রোজালিন ফ্রিডম্যান সঙ্গে-সঙ্গে সিলভিয়াকে নিজের গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালেন এবং তাকে প্রতিবেশীর বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে ভাবলেন হাঙ্গামা শেষ হলো।

কিন্তু তিন বছর পরে হঠাৎ ফ্রিডম্যান দম্পতি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, একটা মামলায় তাঁদের দু'জনের নাম অন্য অনেকের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যাঁদের বিবাদী করা হয়েছে তাঁরা হলেন বিখ্যাত সিয়ার্স রোবাক—যে দোকান থেকে দোলনাটা কেনা হয়েছিল এবং টারকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, যাঁরা দোলনাটি তৈরি করেছিলেন।

সিলভিয়ার বাবা-মায়ের অভিযোগ, মেয়ের হাড় জোড়া লাগাবার পরে পায়ের তেমন বাড় হচ্ছে না এবং অন্য পায়েও অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু তাতেও সিলভিয়ার ব্যথা থেকে যাচ্ছে। সিলভিয়া বলছে, "আমার শরীরে সারাক্ষণ যন্ত্রণা ও অস্বস্তি রয়েছে। আমার পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, আমাকে খোঁড়াতে হচ্ছে।"

সিলভিয়ার উকিল ফ্রেড কেলার আদালতে অভিযোগ করলেন, ফ্রিডম্যান দম্পতি যে দোলনা কিনে বাড়িতে বসিয়েছিলেন তার নকশায় ত্রুটি ছিল। ঠিক মতন ডিজাইন হয়নি, তাই সিলভিয়ার পা দোলনার আসন ও নিচেকার প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আটকে গিয়েছিল।

সিয়ার্স রোবাক ও টারকো কোম্পানির উকিল আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন, "দুর্ঘটনা ঘটেছে সিলভিয়ার ভুলের জন্যে—যখন তার বসে থাকবার কথা তখন সে দোলনার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং ফলে সে পড়ে যায়।" ফ্রিডম্যান দম্পতির ছেলেমেয়েরা এবং রোজেনবার্গের মেয়েরা তাঁদের উকিলের মাধ্যমে বললো, তারা এই দুর্ঘটনার জন্যে মোটেই দায়ী নয়।

অঘটন ঘটেছিল ১৯৭২ সালে, মামলার নোটিশ এলো ১৯৭৫ সালে এবং এক দশক পরে ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে জুরিরা তিন সপ্তাহ ধরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা চালালেন এবং হুকুম দিলেন সিলভিয়াকে চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তিন কোটি টাকার ওপর। এর আশি ভাগ দেবে টারকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, কুড়ি ভাগ সিয়ার্স রোবাক—ফ্রিডম্যান ও পড়শী রোজেনবার্গ কোনক্রমে এ-যাত্রায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। কোম্পানি আপিল করবার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু খরচ ও সময় বাঁচাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হলো এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকায়। এর পুরোটা অবশ্য সিলভিয়ার পরিবারে যাবে না, তিন ভাগের এক ভাগ নেবেন তাঁদের

উকিল ফ্রেড কেলার।

ফ্রিডম্যান দম্পতি বললেন, "নিজের মাঠে পাড়ার ছেলেমেয়েদের খেলতে দিয়ে বারো বছর ধরে আমাদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হলো। আমার মাত্র এক লাখ ডলারের ইনসিওরেন্স ছিল, যদি রায় আমাদের বিরুদ্ধে যেতো তাহলে আমাদের ভদ্রাসন বিক্রি হয়ে যেতো।"

অনুরাধা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "বুঝছেন, কেন নিজের মাঠে পরের ছেলেমেয়েদের খেলার নামে আমি ভয় পেয়ে যাই? আপনার বাড়িতে কাউকে আতিথ্য দিলে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার, আমেরিকান উকিলরা বলছে!"

আমার কপালে ভোগান্তি ছিল! ভগবানের হাত! এসব কথা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত আমেরিকানরা মোটেই শুনতে রাজি নয়। তারা সবসময় উকিলের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লোভে। কার দোষে ব্যাপারটা ঘটেছে তা খুঁজে বের করা হচ্ছে। ভাল কেস থাকলে বিনাপয়সায় উকিল মামলা করবে। তারপর রায় বেরুলে ক্ষতিপূরণের টাকার ভাগ নেবে।

অনুরাধা বললো, "আমাদের দেশে হাসপাতালের অনেক ডাক্তার বেপরোয়া—যা খুশি চিকিৎসা করছেন, কারণ তাঁর কোনো দায় নেই। ওখানে কেউ ডাক্তারবাবুকে কোর্টে টানে না। এখানে ঠিক উল্টো।"

সুশান্তের সংযোজন, "দাদা, শুধু ডাক্তারবাবু কেন? এদেশের প্রত্যেকটি কোম্পানি, প্রত্যেকটি দোকানী, প্রত্যেকটি গেরস্ত ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে পাছে কোথাও কোনো দোষ বেরিয়ে যায়—তখন কত টাকা যে গুণাগার দিতে হবে তা কেউ জানে না। একটা মামলার ধাক্কায় একটা কোম্পানি লাটে উঠতে পারে। আজকাল বন্ধু-বান্ধবদের যখন বাড়িতে নেমন্তন্ন করি তখন নো হার্ড ড্রিংকস—আপনার বাড়ি থেকে খানাপিনা করে বেহাল অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে নিজের বাড়ি ফেরার পথে আপনার অতিথি যদি কাউকে ধাক্কা দেয়, তাহলে আপনি শুধু সমবেদনা জানিয়ে ছাড় পাবেন তা ভাববেন না।"

নিউ জার্সিতে এক দম্পতি নেমন্তন্ন করেছিলেন তাঁদের বন্ধুকে। কয়েক পেগ চড়িয়ে বন্ধু বাড়ি ফেরার পথে ধাক্কা মারলেন এক মহিলার মোটরগাড়িতে। নিউ জার্সিতে দম্পতির ওপর আদালতের হুকুম, ন'লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ দাও দরাজ আতিথেয়তার মূল্য হিসেবে। আইওয়া রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টও ওইরকম রায় দিয়েছেন।

সুশান্ত বললো, "এইসব মামলার ব্যাপারে সমস্ত আমেরিকান পরিবার এখন অনেক খবরাখবর রাখে। মদের দোকানের অবস্থাও তথৈবচ। উকিলবাবুরা কড়া নজর রেখেছেন ওদের ওপর। মিশিগানের এক 'কাফে'তে মদ্যপান করে

জনৈক খরিদ্দার রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে অ্যাক্সিডেণ্ট করলো। কাফে মালিক নিহতদের পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সুড়সুড় করে মামলা মিটিয়ে নিলেন।"

"অনেক দোকানের মালিক এই খবরটা বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে, কেউ বাড়তি কয়েকটা পেগের জন্যে চাপ দিলে তাকে খবরটা দেখানো হয়।"

আমরা আবার উকিল-ডাক্তার সম্পর্কে ফিরে এলাম। সুশান্তর মতে "পিছনে উকিল না লাগলে ডাক্তারদের পক্ষে এমন সুখের দেশ পৃথিবীতে নেই।" সুশান্তর বেশ কিছু ডাক্তার বন্ধু আছে। তাঁদের কাছে খবর ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রোগীদের মামলার সংখ্যা দশ বছরে ডবল হয়েছে।

চিকিৎসার বদলে অচিকিৎসা হয়েছে বলে এইসব মামলায় উকিলবাবুরা যে-সব টাকা দাবি করে বসেন তা শুনলে আপনার-আমার ভিরমি খাবার অবস্থা হবে। ডাক্তারবাবুরা এই বলে শান্তি পাচ্ছেন, এই সব মামলার অর্ধেক শেষ পর্যন্ত আদালতে নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু ভিতরের খবর হলো, গত কয়েক বছরে তিনশ সাতষট্টি জন আমেরিকান রোগী ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করে কোটিপতি হয়েছেন। জজসায়েবের দয়ায় তাঁরা নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছেন। উকিলবাবুদের সাহায্যে মামলাবাজ রুগীরা অসংখ্য মামলায় জিতছে, অথবা ডাক্তারবাবুরা আদালতের বাইরেই মামলা মিটমাট করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। মামলা প্রতি গড় খরচ পড়ছে প্রায় বিয়াল্লিশ লাখ টাকা। এই টাকা অবশ্য ডাক্তারবাবুরা নিজের তহবিল থেকে দিচ্ছেন না। দিচ্ছে তাঁদের ইন্‌সিওর কোম্পানি। বীমার প্রিমিয়াম হুড়মুড় করে বাড়ছে—উকিলের শনির দৃষ্টি এড়াবার জন্যে আমেরিকান ডাক্তারবাবুরা বছরে ইনসিওর প্রিমিয়াম দিচ্ছেন দু হাজার ছ'শো কোটি টাকার বেশি!

"ডাক্তারবাবুরা বলছেন, হ্যাঁ বাবা নিজের গতর ও বিদ্যে খাটিয়ে টুপাইস কামাই করি এদেশে, কিন্তু বীমা কোম্পানিই রোজগারের ছ'ভাগের একভাগ হজম করছে। তারপর রয়েছে বেইজ্জতি। খবরের কাগজে ফলাও করে মামলার রিপোর্ট বেরুলে অন্য রোগী কমে যায়।"

"ভাই সুশান্ত, ডাক্তার উকিলের এই অহি-নকুল সম্পর্ক তাহলে বেশ জমে উঠেছে! লোভ হচ্ছে, ব্যারিস্টারের প্রাক্তন বাবু হিসেবে আর একখানা 'কত অজানারে'র ভিত্তি স্থাপন করি এদেশে। তুমি যা যা শুনেছো নির্ভয়ে বলে যাও।"

সুশান্ত হাসলো। "উকিলবাবুর ভয়ে অনেক বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডেলিভারি কেস নেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন। কলোরাডোর দশজন ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ তো সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে জানিয়ে দিয়েছেন, ইনসিওর প্রিমিয়ামের বোঝা

তাঁরা বইতে পারছেন না, প্র্যাকটিশ বন্ধ হয়ে যাক। ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের আর একটি বিপদ—শিশু ভূমিষ্ঠ হলো, হাঙ্গামা চুকে গেলো, তা নয়। জন্মাবার ষোলো বছর পরে সেই 'বেবি' হয়তো মামলা করে বসলো, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ডাক্তারবাবু তেমন সাবধান হননি। তাই আমার বুদ্ধি কমে গিয়েছে। অতএব ছাড়ো কয়েক লাখ ডলার।"

নিউ ইয়র্কের ডঃ ডানিয়েল কীফ ধাত্রীবিদ্যার প্র্যাকটিশ ছাড়বার আগে দুঃখ করে বললেন, "প্রসব রুমে নিজের কাজ করবার সময় মনে হয় ডাক্তারি করছি বটে, কিন্তু কে যেন আমার কপালের সামনে বন্দুক উঁচিয়ে রেখেছে।" প্রাক্তন রুগীদের সাহায্যে উকিলবাবুরা ডঃ কীফের বিরুদ্ধে ছ'খানা মামলা রুজু করেছেন। ভগবানের দয়ায় একটাতেও ডাক্তারবাবুর হার হয়নি, তবু ডঃ কীফ প্র্যাকটিশ ছাড়লেন। তাঁর বক্তব্য, "চৌষট্টি বছর বয়সে যেকোনো একটা ছুতোয় সারাজীবনের জমানো সম্পত্তি হারাবার ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না। এর থেকে বাড়িতে বসে অবসর জীবনযাপন করা অনেক ভাল।"

সুশান্তর কাছে জানলাম, খবরের কাগজে লিখেছে, ডাক্তারদের এই মামলায় জড়াবার সম্ভাবনার কথা এদেশের ছোট ছেলেমেয়েরাও জেনে ফেলেছে। একজন নিউরোসার্জেন গত পনেরো বছরে ছ'খানা মামলা রুজু করেছেন। ভগবানের দয়ায় একটাতেও ডাক্তারবাবুর হার হয়নি, তবু ডঃ কীফ প্র্যাকটিশ ছাড়লেন। তাঁর বক্তব্য, "চৌষট্টি বছর বয়সে যেকোনো একটা ছুতোয় সারাজীবনের জমানো সম্পত্তি হারাবার ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না। এর থেকে বাড়িতে বসে অবসর জীবনযাপন করা অনেক ভাল।"

সুশান্তর কাছে জানলাম, খবরের কাগজে লিখেছে, ডাক্তারদের এই মামলার জড়াবার সম্ভাবনার কথা এদেশের ছোট ছেলেমেয়েরাও জেনে ফেলেছে। একজন নিউরোসার্জেন গত পনেরো বছরে ছ'খানা মামলায় পড়েছেন। তিনি দুঃখ করছেন, একটি ষোলো বছরের বালক তাঁর চেম্বারে পরীক্ষিত হবার সময়েই তার বাবাকে বলছে, "বাপি একবার ভেবে দেখো ডাক্তার যদি কোনো গোলমাল করে বসে তা হলে তুমি কত টাকা পেয়ে যাবে!"

মনে পড়লো একজন জাপানী অর্থনীতির অধ্যাপক আমাকে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "আমেরিকানদের জাতীয় 'শখ' হলো মামলা করা। উকিলবাবুরা যে মাথা খাটিয়ে কত মামলার পথ বের করছেন তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।"

অনুরাধা বললো, "শোনা যায় এক বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। বাড়ির কর্তার মই বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে সে পড়ে গেলো। তারপরেই নাকি উকিলের চিঠি, মই বিপজ্জনক ভাবে রাখার জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।"

সুশান্ত বললো, "ব্যাপারটা বোধহয় রসিকতা। কিন্তু যারা মই তৈরি করে তারা কাগজে বিবৃতি দিয়েছে, মই তৈরি করতে যত খরচ প্রায় তত টাকা ইনসিওর প্রিমিয়াম গুণতে হচ্ছে যদি মই থেকে কোনো দুর্ঘটনা হয় তার সামাল দিতে।"

সুরসিকা অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, "উকিলদের সম্বন্ধে আপনার মতামত কী?"

আমি বললাম, 'উকিলের ছেলে, উকিলের ভূতপূর্ব বাবু আমি অবশ্যই উকিলদের পক্ষে। একবার আমার উপন্যাসের এক চরিত্র (শ্রমিকনেতা) উকিলদের সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করেছিল, তাই পড়ে এক বিখ্যাত আইনজ্ঞ (পরে বিশিষ্ট বন্ধু) আমাকে ফৌজদারী কোর্টের আসামী করলেন—সেই থেকে আমি বন্ধুবর বিষ্ণুচরণ ঘোষকে অলিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, উকিলদের নিন্দে আমি মরে গেলেও করবো না। অমন যে অমন সেক্সপীয়র, যিনি হেনরি সিক্সথ নাটকে একটি চরিত্রের মাধ্যমে প্রস্তাব করেছিলেন কিছু উকিলকে মেরে ফেলা যাক, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করবো।"

টপাটপ অনেকগুলো খবর সংগ্রহ করে নিলাম দেশের আইনজ্ঞ বন্ধুদের যদি কাজে লেগে যায়। গরিব উকিল কাকে বলে তা আমেরিকায় জানা নেই। আমেরিকায় বটগাছই নেই, তো বটতলার উকিল! যারা বলে আমাদের দেশের কোনো-কোনো উকিল সুযোগ পেলেই মক্কেলের গলা কাটে তারা একবার কষ্ট করে আমেরিকা ঘুরে যাক—হাউ মেনি প্যাডি মেক হাউ মেনি রাইস তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সিভিল ক্ষতিপূরণের মামলায় বাদী হিসেবে আমেরিকান আদালতে যাওয়াই লাভের—কারণ উকিলবাবুকে নগদ না দিলেও চলবে। মামলায় যা পাওয়া যাবে তার চল্লিশ শতাংশ উকিলবাবু নেবেন। কিন্তু বিবাদী হলেই উকিলের টাকা নগদ নারায়ণ। পরামর্শ সভায় ঘণ্টা অনুযায়ী মিটার বাড়বে—প্রতি ঘণ্টায় সাড়ে ছ'শ থেকে দু'হাজার টাকা। আদালতে মামলা উঠলে লাখ দেড়েক টাকা উকিল-ফি নস্যি!

বড়-বড় মামলায় ওকালতি খরচ কত তা নিবেদন করলে আমাদের অশোক সেন, দেবীপাল, ননী পালকিওয়ালা, শক্তি মুখার্জির বাবুরাও অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন। ১৯৮৩ সালে ফাইন পেপার অ্যানটি-ট্রাস্ট ক্লাশ অ্যাকশন মামলায় ওকালতি খরচের বিল মাত্র ছাব্বিশ কোটি টাকা! আমেরিকান উকিলের খরচ ধরলে আমাদের প্রত্যেকটি উকিলবাবু তো রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী! কিন্তু বিদ্যেয় বুদ্ধিতে আমাদের কালোগাউনের সায়েবরা দুনিয়ার কারও থেকে যে কম যান না তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

সুশান্ত বললো, "লিখে রাখুন, আপনার কাজে লেগে যাবে। আমেরিকায়

সাত লাখ উকিলবাবু বছরে ফি হিসেবে রোজগার করেন সত্তর হাজার কোটি টাকা।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার মাথা ঘুরছে। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমাদের ভারত সরকারের বার্ষিক বাজেট থেকে শ্যামচাচার উকিলের ফি-ও মেটানো যাবে না।"

পলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়ার্টারলির সাম্প্রতিক সংখ্যায় হেনরি আব্রাহামের লেখা একটি প্রবন্ধের নকল সুশান্ত আমাকে দিয়ে দিলো। "পড়ে দেখবেন, ১৯৮৩-৮৪ সালে আমেরিকানরা বিভিন্ন আদালতে আড়াই কোটি মামলা রুজু করেছে, এর মধ্যে চুরানব্বইটা ফেডারেল ডিসট্রিক্ট কোর্টে, মামলার সংখ্যা সাড়ে ছ'লাখ।"

আব্রাহাম সায়েব আমার নজর খুলে দিলেন। মামলার কয়েকটা নমুনা শুনুন। ছেলে মামলা করেছে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে ঠিক মতন প্রতিপালন না-করার জন্যে (ভুবনের মাসীর গল্প মনে পড়ে?)—দাবী একলাখ ডলার। সিনসিনাটির এক নাগরিক তাঁর সাংবিধানিক অধিকার বলে রাস্তা দিয়ে তাঁর প্রিয় 'ট্যাংক' চালাবার অধিকার চান। উইসকনসিনের এক পুরুষকর্মী তাঁর মহিলা-বসের বিরুদ্ধে চাকরিতে অবনতি করিয়ে দেবার জন্য দু'লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। অভিযোগ, মহিলা-বস তাঁকে 'লটঘট'-এর যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা এই পুরুষকর্মীটি গ্রহণ করতে পারেননি বলেই এই শাস্তি এসেছে।

ফ্লোরিডার এক অফিস-বাড়ির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে মস্ত মামলা ঝুলছে, টয়লেটের সীট নড়বড়ে হওয়ায় এক মহিলা কোমরে ব্যথা পেয়েছেন। ফ্লোরিডার এক এপিসকোপাল বিশপ সরকারের কাছে দাবী করেছেন দু'লাখ ডলার। নেভির টেনিস মাঠে খেলতে গিয়ে তাঁর হাঁটুতে চোট লাগে, ফলে চার্চের বেদিতে হাঁটু মুড়তে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় এক পাদ্রির বিরুদ্ধে সাত কোটি টাকার মামলা রুজু করেছেন এক মহিলা। তিনি একবার চার্চের বেদিতে কনফেশন করেছিলেন। এখন অভিযোগ, বিশ্বাসের সম্মান না রেখে পাদ্রি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন এই মহিলা চার্চের টাকা তছরূপ করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার এক ব্যায়াম-শিক্ষক আহত হয়ে মামলা করলেন যে-কোম্পানি জিমনাস্টিক ম্যাট তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে। মামলা জিতে পেলেন ষোল কোটি টাকা। বাড়িওয়ালা শুধু বাড়ি ভাড়াই দেবেন না, ভাড়াটিয়াদের নিরাপত্তায় তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে। হোটেলে ও মোটেলে সেই একই কথা। মহিলা গায়িকা কনি ফ্রানসিস এক মোটেলে রেপড্ হন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিদ্র না-করার অভিযোগে মোটেল মালিকের কাছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি

আদায় করেছেন পনেরো লাখ ডলার।

কোম্পানির বিপদের তো শেষ নেই। অ্যাসবেস্টসের ধুলোয় ফুসফুসের রোগ হয় ও ক্যানসার সম্ভাবনা বাড়ে এমন তিরিশ হাজার ক্ষতিপূরণের মামলা আদালতে ঝুলে আছে। কোটি কোটি ডলার গুণাগার ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে—ম্যানভিল কর্পোরেশনের মতন প্রতিষ্ঠান এই মামলার দাপটে লাটে উঠলো। ভার্জিনিয়ার এ এইচ রবিন্‌স কোম্পানি মেয়েদের জন্যে জন্ম-নিরোধক আই-ইউ-ডি তৈরি করতো। দেড়হাজার ক্ষতিপূরণের মামলায় কোম্পানির গণেশ উল্টোল—তেরোশ কোটি টাকার মতন ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও।

"ভাই সুশান্ত, সবই দেখছি লাখ-লাখ টাকার ব্যাপার। কম ক্ষতিপূরণ চাওয়াটা কি উকিলবাবুদের অপছন্দ!"

সুশান্ত বললো, "কাগজে লিখেছে, দশ হাজার ডলারের কম ক্ষতিপূরণ চাইলে কারও পড়তায় পোষায় না।"

আমরা ছোটবেলায় গুজব শুনতাম, বরিশালবাসী ও দখনেরা মামলাবাজ—মামলা বাধাতে পারলে ওঁদের মন নাকি আনন্দে ভরে ওঠে। ইতিহাসের উষাকালে বরিশালের সঙ্গে মূল মার্কিন ভূখণ্ডের কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা তা গবেষকরা যাচাই করে দেখতে পারেন।

কিন্তু মামলার নেশায় আমেরিকায় উকিলবাবুরা কতদূর এগিয়ে যাচ্ছেন তা শুনুন। পিটসবার্গের এক কারখানাকর্মী লিউকিমিয়ায় মারা গেলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী মামলা করলেন, বেনজিনের সংস্পর্শে এসেই তাঁর স্বামীর রোগের উৎপত্তি। আগে কেবল যে-কোম্পানিতে কাজ করতেন তার বিরুদ্ধেই কর্মীদের মামলা দায়ের হতো। এখন যাঁরা কোম্পানিকে মাল সরবরাহ করেন তাঁদেরও জড়ানো হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বেনজিন কোন্ কোম্পানি সরবরাহ করেছে তা নিশ্চিত হতে না পেরে আমেরিকায় যে একশো একটি কোম্পানি বেনজিন তৈরি করেন তাঁদের সবাইকে পার্টি করা হলো।

এই প্যাঁচে কিন্তু ফল ভাল হলো না। উননব্বইটি কোম্পানি আদালতে দেখালো তারা কোনোদিন পিটসবার্গের ওই কোম্পানির সঙ্গে জড়িত ছিল না। যে বেনজিন নিয়ে অভিযোগ তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তাঁদের। ফেডারেল জজ ব্লক সায়েব বললেন, উকিলবাবুরা বাড়াবাড়ি করেছেন, সুতরাং গাঁটের কড়ি থেকে কুড়ি লাখ টাকার আইন খরচ দাও ওই উননব্বইটা কোম্পানিকে।

মামলার নেশায় মত্ত আমেরিকানরা উকিলবাবুদের নিস্কৃতি দিচ্ছেন না। তাঁদের বিরুদ্ধেও ক্ষতিপূরণের মামলা হচ্ছে ডজন-ডজন। বিশেষ করে তাঁরা যখন রুজু-করা মামলা ঠিক মতন তদ্বির করেন না অথবা নির্ধারিত সময়ে

কাগজপত্র আদালতে পেশ করতে গাফিলতি করেন। উকিলের বিরুদ্ধে ইদানীংকালে সবচেয়ে বিখ্যাত মামলা দায়ের করেছিলেন মহিলা গায়িকা ডরিস ডে। বিবাদী তাঁর প্রাক্তন উকিল জেরোম রোজেনথল। ১৯৮৫ অক্টোবরে ডরিস ডে পেয়েছেন আদালতের ডিক্রি—পরিমাণ তেত্রিশ কোটি টাকা।

আমি বললাম, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে মার্কিনীরা ক্রমশই মামলার নেশায় মেতে উঠছে। এমন ক্ষতিপূরণের ভয় থাকলে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক একদিন বিষময় হয়ে উঠতে পারে। ইন্টারেস্টিং খবর, দেশে ফিরে গিয়ে লেখা যেতে পারে।"

অনুরাধা বললো, "খুব সাবধান শংকরবাবু। এ-দেশে সব সময় বিরোধীপক্ষের একটা বক্তব্য থাকে। সেটা একটু জেনে নেবেন।"

সুশান্ত মৃদু হেসে বললো, "সবারই ধারণা গত দশ বছরে বাৎসরিক মামলার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আপীলও বেড়ে চলেছে বেপরোয়াভাবে। আপীলেরও আপীল আছে। একটা খুনের মামলায় আসামী আইনের নানা মারপ্যাঁচ বুঝে বিয়াল্লিশ বার আপীল করেছিল। কিন্তু আইনজ্ঞরা চিন্তিত নন। মামলাবাজি বাড়ছে এ-কথা তাঁরা মোটেই স্বীকার করছেন না। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মার্ক গ্যালাস্টার বলছেন, উনিশ শতকের রেকর্ড খতিয়ে দেখুন—মাথাপিছু মামলার সংখ্যা তখনও কম ছিল না।

"অর্থাৎ মামলাবাজিটা এ-দেশে নতুন নয়, যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন থেকেই এই ব্যাপারে একটু বরিশালী প্রভাব রয়ে গিয়েছে।" আমার এই মন্তব্য শুনে সুশান্ত হাসলো না। সে চুপি-চুপি অধ্যাপক হেনরি আব্রাহামের প্রবন্ধের কয়েকটা লাইনের ওপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

আব্রাহামের নিবেদন ঃ আমেরিকার সাত লাখ উকিলের তুলনায় জাপানে উকিলের সংখ্যা মাত্র ১২,০০০। ইংলণ্ডে ৫৩,০০০ ফ্রান্সে ৩০,০০০, সুইডেনে ১৬,০০০। ১৯৭০ সালে প্রতি ৭০০ জন আমেরিকানের জন্যে একজন উকিল ছিলেন, ১৯৮০-তে ৪১০ জনের জন্য একজন, ১৯৮২-তে ৩৩০ জনে একজন এবং ১৯৮৬-তে ৩২০ জনে একজন। আরও তলিয়ে দেখতে পারেন। ওয়াশিংটন ডি-সির কথা ধরুন—১৯৮১ সালেই আঠারো জন নাগরিক পিছু একজন উকিল। এইভাবে এগোলে, আব্রাহামের মতে, ২০৪৫ সালে আমরা সেই স্বর্ণযুগে পৌঁছবো যখন ওয়াশিংটন ডি-সিতে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একজন করিৎকর্মা উকিলবাবু থাকবেন।

সুশান্তকে আমার শেষ নিবেদন, "দু'একখানা ছাপানো কাগজপত্তরের কপি দিয়ে দাও ভাই ডকুমেণ্ট হিসেবে, দেশে ফিরে গিয়ে এই বিষয়ে লিখলে সবাই ভাববে আমি গাঁজা-আফিম খেয়ে মার্কিন দেশ সম্বন্ধে লিখতে বসেছি।"

স্বদেশের সুখের আশ্রয় ছেড়ে বিদেশে ভূতের কিল খাবার ঝুঁকি যখন নিয়েছিলাম তখন মনের মধ্যে যে-কয়েকটি চাপা প্রত্যাশা ছিল তার মধ্যে একটি হলো আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

আমার এক স্বাধীনচেতা সাংবাদিক বন্ধু আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, বিদেশে কখনও বিখ্যাত ব্যক্তির পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করবেন না। নামকরা লোকরা আটলান্টিকের অপর পারে সাধারণত একটু পায়াভারি হন। ওঁদের সময় আসলে কতখানি মূল্যবান তা ভগবানই জানেন, কিন্তু সফলস্বপ্ন ব্যক্তিরা এমন ভাব দেখান যে মহামূল্যবান গিনি সোনার মতন এঁরা সময়কে নিক্তিতে ভাগ করে ব্যয় করেন। অর্থাৎ সময় আমাদের এই ইন্ডিয়ায় যত সস্তা তা পৃথিবীর আর কোথাও নয়।

এই বন্ধু আমাকে আরও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, বিখ্যাত লোকদের সান্নিধ্যে আসার প্রচেষ্টার মধ্যে দাস-জাতির মানসিকতা লুকিয়ে আছে। যেমন ১৯৪৭ সালের আগে পরাধীন বাঙালীরা সায়েবসান্নিধ্যে এলেই কারণে অকারণে একখানা প্রশংসাপত্র বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক তো সারাক্ষণ তাঁর গলাবন্ধ কোটের পকেটে একখানা খাতা লুকিয়ে রাখতেন। কখন কোথায় সায়েব দর্শন হবে এবং তাঁর কাছ থেকে একখানা সার্টিফিকেট ভিক্ষা পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই!

সার্টিফিকেট আমি চাই না, কিন্তু বিদেশে নিজের দেশের লোকের সাফল্য ও সম্মান দেখে আনন্দ পাবো এতে দোষ কোথায়?

আমার বন্ধুটি নানা সুযোগে গত এক দশকে বহুবার বিদেশ গিয়েছেন এবং কখনও কখনও দীর্ঘ সময় যাপন করেছেন বিখ্যাত সব শিক্ষাতীর্থে। তিনি সাবধান করে দিলেন, "নামকরা লোক দেখার এই হ্যাংলামো ছাড়ুন। যদি আপনার কোনো কাজকর্ম থাকে তাঁর সঙ্গে তা হলে আলাদা কথা, কিন্তু হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তিনি বিখ্যাত বলেই আপনি তাঁর দর্শনার্থী হবেন এই মানসিকতা তিনি পছন্দ না করতে পারেন।"

সাংবাদিক বন্ধু আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমি সিগন্যাল দিলাম, "বলে যান! থামবেন না।"

বন্ধু বললেন, "বিখ্যাত ব্যক্তিটি হয়তো আপনার মতন এক দেশোয়ালীকে দেখে তাঁর গায়ের মত ঝাল ঝেড়ে দেবার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। উঃ,

মশাই বলবার উপায় নেই, ইন্ডিয়া থেকে এসেছি এবং ছোটখাট একখানা কাগজে কাজ করি। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হবে প্রবাসী ভারতীয়র স্বদেশী লেকচার! ইন্ডিয়া তাঁর মতন প্রতিভাকে বুঝতে পারেনি। দেশের লোক, সরকারের লোক, অফিসের লোক সব একসঙ্গে পিছনে লেগেছিল তাঁর প্রতিভার টুয়েল্‌ভ-ও-ক্লক বাজাবার জন্যে। নেহাৎ স্বপ্ন ছিল, পুরুষকার ছিল, সাধনা ছিল তাই কোনোক্রমে এই সোনার দেশ আমেরিকায় স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে। এখন আমার পৈতৃক নামটা ছাড়া আর কিছুর পিছনেই ভারতবর্ষের কোনো অবদান নেই।"

"তারপর শুরু হবে সুদীর্ঘ বর্ণনা, ইন্ডিয়াতে তাঁর ওপর কি কি অন্যায় করা হয়েছে দিনের পর দিন ধরে। এই সব শুনতে-শুনতেই আপনি আবিষ্কার করবেন আপনার নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের তিরিশ মিনিট সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। এক ভদ্রলোকের এতোখানি ঔদ্ধত্য আমাকে বলেন যে, আট ডলার পকেটে করে দেশত্যাগী হয়েছিলাম, তাছাড়া ও দেশের কাছে আমার কোনো ঋণ নেই। এক-এক সময় ভাবি, দিল্লিতে ইন্ডিয়ান রাষ্ট্রপতির নামে ওই টাকাটা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়ে হিসেব চুকিয়ে ফেলবো।"

আমি সাংবাদিক বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বললেন, "সেধে কেন অপমান কুড়োবেন? যা এই ভদ্রলোকদের বুঝাতে পারিনি, আপনি নিজের দেশে যা ভুগেছেন তার জন্য আপনার জন্মভূমির দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতাই দায়ী—আপনি যা অবহেলা পেয়েছেন তা শুধু আপনি পাননি, ভারতবর্ষের কোটি-কোটি মানুষ প্রত্যহ একই আগুনে এখনও ভুট্টার মতন পুড়ছে।"

আমি বাহবা দিই বন্ধুকে, "চমৎকার বলেছেন। যোগ্য উত্তর তো মুখের ওপরেই শুনিয়ে দিয়ে এসেছেন!"

কিন্তু বন্ধু বললেন, "আট ডলারের ভর্ৎসনা শুনিয়েই যদি লেকচার বন্ধ হতো তাহলে তো বাঁচা যেতো। অনাবাসী বাঙালীদের মতন 'অ্যারোগ্যান্ট' গ্রুপ আপনি এদেশের কোথাও খুঁজে পাবেন না। তাঁরা আপনার ওপর দাদাগিরি ফলাবেন। জিজ্ঞেস করবেন, ভারত দেশটা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ কেন উচ্ছন্নে যাচ্ছে? কেন আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের মতন সাধারণ ব্যাপারও জনসাধারণকে বোঝাতে পারছি না। মন্ত্রীরা আর কত চুরি করবে? সরকারী অফিস ও বে-সরকারী উদ্যোগের মানুষরা কেমন করে এমন অপদার্থ হলো?"

সাংবাদিক বন্ধু বললেন, "বুঝুন ব্যাপারটা। তুমি কাল-কা যোগী, টু-পাইসের লোভে দেশ ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে অন্য রঙের পাশপোর্ট নিয়েছো, বেশ করেছো। ইচ্ছে হলে নিজের গর্ভধারিণী মাকে দু-তিন মাস অন্তর দু'দশ ডলার

ভিক্ষে পাঠিয়ে তাঁর মাথা কিনে নিও। কিন্তু যে-দেশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক চুকেছে সে-দেশের সব মানুষের ওপর হেডমাস্টারি করার অধিকার তুমি কোথা থেকে পেলে?"

বন্ধুবর বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। "মনের ইচ্ছাটা, অনাবাসী আমাকে পুরুষোত্তম বিং বলে স্বীকার করে নাও। দেখে যাও আমার গাড়ি, বাহারে বাড়ি। শুনে যাও আমার মাইনের পরিমাণ। ডলারে মাইনে শুনলে তোমার চোখ ছানাবড়া হবে না, তড়াং করে তেরো দিয়ে গুণ করে টাকায় রূপান্তরিত করো। মনের ইচ্ছে, ডলার ও টাকার ফারাকটা ক্রমশই বেড়ে যাক। যখন ইস্কুলে পড়েছিলুম তখন ছিল ডলারে সাত সিকে। দাম কমতে কমতে এক ডলার তেরো টাকা হয়েছে—যত ইন্ডিয়ান রুপির কদর কমবে তত কলকাতার পচা গলিতে-গলিতে অনাবাসী ভারতীয়দের ইজ্জত বাড়বে।"

আমি কোনো বাধা দিচ্ছি না বন্ধুকে। তিনি বলে চলেছেন, "বেশ বাবা, যে-রেটে আমাদের দেশ পিছোচ্ছে তাতে ডলারে পঁচিশ টাকা হয়তো দেখে যাবো, তাতে যদি তোমাদের সুখ হয় তো হোক। কিন্তু ভারতমাতার জন্যে কপটাশ্রু বিসর্জন ত্যাগ করো। অমন ভাবটা দেখিও না—যদি দেশের অবুঝ, কুঁড়ে এবং অপদার্থ লোকগুলো তোমার মতন উদ্যমী হতো এবং তোমার পরামর্শ শুনতো তা হলে ওই দেশেও সোনা ফলতো। এমন ভাবখানা, যেন এখনই যদি ফিরে যাই দেখিয়ে দেবো কেমন করে সোনা ফলে। এই সব মিষ্টি কথা শুনে দেশের অনেক নেতা বিদেশে এসে বোকা বনেছেন। তাঁরা ভেবেছেন, দেশের ছেলে দেশে ফিরুক, ভারতমাতার চোখের জল শুকোক। মোটেই না। তাঁরা সুপার সিটিজান হয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্যে দেশে যেতে চান সরকারী অতিথি হিসেবে। সরকার তাঁদের সেই হারে পেমেন্ট করুক যে-হারে তাঁরা বিদেশী স্পেশালিস্টদের নিয়ে যান। এই ধরুন—প্রথম শ্রেণীর প্লেন ভাড়া, পাঁচতারা হোটেল খরচ-খরচা বাদে দিনে দৈনিক হাজার তিনেক টাকা।"

"দিনে দু'শো-আড়াইশো ডলার ওদেশে সত্যিই কিছু নয়।" আমি মনে করিয়ে দিয়েছি।

"ওদেশে কিছু না হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে অনেক টাকা। আচ্ছা, আপনি না হয় কোনক্রমে আক্কেল সেলামিটা দিলেন, কিন্তু তারপর? প্রতি মিনিটে তিনি আপনাকে মনে করিয়ে দেবেন তিনি ভেতো বাঙালী নন, তিনি অনাবাসী ইন্ডিয়ান। দেশের রাস্তা কেন খারাপ? বাড়ি কেন রঙ করা হয় না? হাসপাতাল কেন পাঁচতারা হোটেলের মতন নয়? আইসক্রিমের স্বাদ কেন নিরেস, সাইজ কেন ছোট? কেন্দ্রীয় সরকারী উচ্চপদস্থ এক অফিসার সেদিন দুঃখের সঙ্গে দিল্লীতে বললেন,'অনাবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের মোহ ঘুচে যাচ্ছে।

যারা গেছে তাদের যেতে দিন। ভারতমাতার ঘরে সত্তর-পঁচাত্তর কোটি সন্তান—যে আড়াই কোটি দেশের বাইরে রয়েছে তাদের খরচের খাতায় লিখে দিলেও ভারতবর্ষ কোনোদিন অচল হবে না'।"

বন্ধুবরের বিরক্তি প্রকাশ এখনও শেষ হয়নি। বলে চললেন, "মিলিয়ন এবং বিলিয়ন ডলারের কমে কোনো কথা নেই এই ফরেন-রৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের। বছরের পর বছর ধরে শুনছি, টাকা ঢেলে কিছু একটা শিল্পটিল্প প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারপরে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। অথচ দাবি হচ্ছে, বিনা পয়সায় জমি দিন, আমদানি শুল্ক রেহাই দিন এবং আরও কি কি সুবিধে দিতে পারেন তার তালিকা পাঠান। বাঙালীদের ট্র্যাক রেকর্ড এ বিষয়ে সব থেকে খারাপ। কেরলীয়রা, অন্ধ্রের লোকেরা, গুজরাতীরা, তামিলরা বিদেশে থেকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নিজেদের অঞ্চল সম্বন্ধে যা করেছে তার কানাকড়িও করেনি বাঙালীরা।"

"ইচ্ছে থাকলেও কি সব সময় করা যায় ভাই?" আমি জিজ্ঞেস করি, "আমাদের ভুললে চলবে কেন, প্রবাসের জীবনসংগ্রামে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। মার্কিন জীবনটা দূর থেকে যত সুখের মনে হয় আসলে ততটা নয়।"

"এই সামান্য কথাটা স্বীকার করে নিলেই তো সব মিটে যায়। শুধু পিট-পিট করে সমালোচনায় লাভ কী?"

"অন্তত এইটুকু প্রমাণ হয়, দেশের সঙ্গে নাড়ির যোগ একটা থেকে গিয়েছে। দেশছাড়া হলেও দেশ সম্বন্ধে আগ্রহ যথেষ্ট রয়েছে।"

"ওটাও বোধ হয় ঠিক নয়," ফোঁস করে উঠলেন বন্ধুবর। "বাঙালী আমেরিকানরা অন্য ভারতীয়দের তুলনায় ক'খানা বাংলা পত্র-পত্রিকা কেনেন? ক'খানা বাংলা বই তাঁদের ঘরে দেখবেন? বাংলা দৈনিক পত্রিকা ক'খানা বাঙালী কম্যুনিটিতে রাখা হয়? ও-কথা তুললেই দামের কথা ওঠে। কিন্তু তেরো টাকা দিয়ে ডলার ভাগ করলে এদেশের খবরের কাগজ খুব দামী এই বদনাম দেওয়া যায় না। আবার কেউ-কেউ বলবে, সময় কোথায় পড়বার? ভাবটা এমন, বিদেশে অনেক বেশি পরিশ্রম ঘরে এবং কর্মক্ষেত্রে করতে হয়। কিন্তু তাঁরাই ভুলে যান, তাঁদের বোন-বউদি বাড়ির হাঁড়ি ঠেলে ট্রেনে বর্ধমান থেকে হাওড়ায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন। হাওড়া থেকে বাসে তাঁদের সল্টলেক পর্যন্ত পাল্লা দিতে হয়—চলমান নরক-যন্ত্রণা বললে কলকাতার বাসযাত্রা বোঝায়। দিনের শেষে এঁরা আবার হাওড়ায় ফিরে আসেন, তারপর আবার বর্ধমান। এইসব মহিলা তবু বাংলার সংবাদ, বাংলার সাহিত্য, বাংলার সঙ্গীতের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন।"

তাহলে বিদেশে গিয়ে আমার কী করবার থাকতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে

বন্ধুবরের পরামর্শ ছিল ঃ "কয়েকদিনের জন্যে যাচ্ছেন যান। বিশ্রাম করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, যদি দু'এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায় ঘুরে আসুন, ওই পর্যন্ত। ওখান থেকে লেখার কোনো উপাদান যোগাড়ের চেষ্টা করে নিজের এবং পাঠকের কষ্ট অযথা বাড়বেন না। আদৌ যদি প্রাণ ছটফট করে তাহলে বলবেন, অনাবাসী বাঙালীরা যে উন্নত জাত এই ব্যাপারটা দেশের লোক বিশ্বাস করতে আগ্রহী নয়। যতটা পারেন নিতান্ত অর্ডিনারি বাঙালীদের সঙ্গে মিশবেন, যারা খুব সফল হয়েছে তাদের কাছে গিয়ে পুরনো লেকচারটা আবার শুনবেন না।"

সাংবাদিক বন্ধুর এই মন্তব্য মনের মধ্যে রেখে মার্কিন দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে কিন্তু ওঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। যে-কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিলাম, তাই আবার প্রমাণ হলো, বিদেশে না গেলে বাঙালীর যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তা বিকশিত হয় না। সেই পুরনো কথা—বাঙালীরা হচ্ছে ধানগাছের মতন, উৎপাটিত হয়ে পুনঃরোপিত হলে তবেই তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে।

প্রবাসে বাঙালীর মধ্যে পরকে আপন করে নেওয়ার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখেছি তা মনকে অভিভূত করে। ধরুন ক্লিভল্যান্ডের ছোট্ট বাঙালী সমাজের কথা। পরস্পরের সুখে দুঃখে যেভাবে অংশগ্রহণ করেন তা নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাস হয় না। এঁদের মধ্যে দেশের জন্যে যথেষ্ট ভালবাসা দেখেছি, কোথাও ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করিনি।

আমার বন্ধুর মন্তব্য শুনে স্থানীয় এক যুবক বললেন, "আপনার বন্ধু নিশ্চয় কোনো বাজে লোকের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলেন। পেটের দায়ে এবং কিছুটা বড় হবার লোভে দেশত্যাগী হয়েছিলাম, হয়তো পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনে পাশপোর্টখানাও পাল্টাবো। কিন্তু কেমন করে ভুলবো, আমার জন্ম কোথায় হয়েছিল ? সেখানকার মানুষের কত দুঃখ ! সেই দুঃখে তেমন কিছু করবার মতন ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে, জন্মভূমিকে আমি ভালবাসি না তবে ভীষণ কষ্ট হবে।"

ক্লীভল্যান্ডের আর একটি সদাহাস্যময় তরুণ বাঙালী ডক্টর শ্যামল রায় এক সময় আমার পুরনো কর্মস্থল ফিলিপস্ ইন্ডিয়ায় কাজ করতো। তার আর একটি পরিচয় নরেন্দ্রপুর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ভাবধারায় মানুষ হয়েও এদেশে পড়াশোনা করতে এসে কোনো মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েনি। চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে নতুন দেশের নতুন ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে।

এই শ্যামল অনেক মজার মজার কথা বলে। একবার কে ওকে বলেছিল, "ইন্ডিয়ান ছেলেরা স্মার্ট নয়, ওদের প্রত্যেককে ড্রেস করতে শেখাতে হয়।" শ্যামলের তাৎক্ষণিক উত্তর, "এক-একটা জাতের এক-একটা সহজাত ব্যুৎপত্তি

থাকে—যেমন, কোনো আমেরিকান ছেলে অথবা মেয়েকে শেখাতে হয় না কেমন করে 'আনড্রেস' করতে হয়!"

শ্যামল বলেছিল, "দাদা, আপনি পত্রের কথায় কান দেবেন না, আপনি নিজের চোখে যতটা পারেন দেখে নিন। আপনি আমাদের মতন অর্ডিনারী বাঙালীও দেখুন, আবার কৃতী বাঙালীও দেখুন।"

কৃতী বাঙালীর প্রসঙ্গ উঠতেই আনন্দমোহন চক্রবর্তীর কথা আমার মনে পড়ে গেলো। কলকাতায় থাকতেই একবার ওঁর সম্বন্ধে কাগজে রিপোর্ট পড়েছিলাম। গবেষণা করে ও সেই সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকদের জন্য নতুন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে এই ভদ্রলোক মার্কিন সারস্বত সমাজে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন।

বিদেশে বিখ্যাত ভারতীয় আমার মতন একজন মফস্বলবাসী দেশোয়ালীর সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতে পারেন তা আশঙ্কা করেও আমি আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।

ক্লিভল্যাণ্ডে নেমেই আমার আশ্রয়দাতা ও আসন্ন নর্থ আমেরিকান বাঙালী সম্মেলনের কো-চেয়ারপার্সন ডঃ রণজিৎ দত্তর ওপর নানা চাপ দিচ্ছিলাম—এই দেখতে চাই, ওই দেখতে চাই। ব্যাচেলররা যে এমন ধৈর্যশীল হতে পারেন তা রণজিৎবাবুকে না দেখলে আমার বিশ্বাসই হতো না। সুপ্রিয় ব্যানার্জির অবশ্য অন্য মত—ব্যাচেলররা কখনই ধৈর্যশীল হয় না, কিন্তু ১৯৪৮ সালে যারা ম্যাট্রিক পাশ করেছে তাদের ব্যাপারটা আলাদা। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ হলে কখনও নাইনটিন ফর্টি-এইট গ্রুপ সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। ফর্টি-এইট লয়ালটি ওঁর এতোই বেশি যে জীবনসঙ্গিনী হিসেবেও তিনি এই ফর্টি-এইট গ্রুপ মহিলা নির্বাচন করেছেন।

আর একটি মতামত আছে খ্যাতনামা রোডস স্কলার ও ইতিহাসে বিদগ্ধ অধ্যাপক অসীম দত্তর। তাঁর ধারণা প্রত্যেকটি শিলেটি দত্তকেই সৃষ্টিকর্তা একটু স্পেশাল যত্ন নিয়ে তৈরি করে এই বিশ্বভুবনে পাঠিয়েছেন—তাই দুনিয়ার সর্বত্র রণজিৎ দত্তরা অদ্বিতীয়। আমার সঙ্গে বিদেশে যখন দেখা হলো ডঃ অসীম দত্ত তখন শিলেটি দত্তদের কীর্তিকাহিনী সংগ্রহের জন্য সমস্ত আমেরিকা মহাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট, মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম অব মর্ডান আর্টস ইত্যাদি মাথায় উঠেছে, অসীমবাবু একমনে শ্রীহট্টীয় দত্তদের বিজয়গাথা সংকলন করে চলেছেন।

অসীমবাবু বললেন, "রণজিৎ দত্তর ধৈর্য থাকবে না তো আপনাদের

কলকাতায় এলেবেলে লোকদের ওই গুণ থাকবে? ওর শিকড়টা কোথায় রয়েছে তা একবার দেখুন।"

ধৈর্যময় রণজিৎবাবু আমার সবরকম বালকসুলভ প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন, "আপনার কোনো খেদ আমরা রাখবো না।"

আনন্দমোহন চক্রবর্তীর কথা তুলতেই বললেন, "জগদ্বিখ্যাত লোক—পৃথিবীর কোথায় কখন যে ঘুরে বেড়ান। থাকেন শিকাগোয়। তবু চেষ্টা করা যাবে।"

অসীম দত্ত সঙ্গে-সঙ্গে তার শিলেটি বাংলায় (তা যদি অবশ্য বাংলা হয়!) আকারে-ইঙ্গিতে যা সন্দেহ প্রকাশ করলেন তা হলো, "আনন্দ চক্রবর্তী তো শিলেটি নয়, কিন্তু আনন্দময়ীটি কি শিলেটবাসিনী?" ওঁর দৃঢ় ধারণা, অনেক নিচু লোক শেষ পর্যন্ত জাতে উঠেছে শিলেটি রমণী বিবাহ করে।

রণজিৎবাবু নিরাশ করলেন অসীম দত্তকে। আনন্দ চক্রবর্তী একেবারেই ঘটি। দুনিয়ার পাতে দেবার মতন বীরভূমের দুটি মাত্র প্রোডাক্ট—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর) ও আনন্দমোহন চক্রবর্তী (সাঁইথিয়া)। আনন্দময়ীটিও (নাম কৃষ্ণা) শিলেটি নন শুনে অসীম বাবু একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তারপর বললেন, "দেখবেন খোঁজটোজ করে, হয়তো কলেজেই জানাশোনা করে বিয়ে করেছে—বাপ-মা বাইরের ওর্য়ালডে টেন্ডার ফ্লোট করবার সুযোগই পাননি! শিলেটির লোকেরা এমন ছেলে খোঁজ পেলে নিশ্চয় হাতছাড়া করতো না!"

অসীমবাবু অবশ্য আশ্বাস দিলেন, "চিন্তা করছেন কেন? ইচ্ছাপূরণের আশ্চর্য দেশে এসেছেন। ইচ্ছে যখন হয়েছে তখন নিশ্চয়ই আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে।"

রণজিৎবাবুর কাছেই জানা গেলো, তিনি এবং আনন্দমোহন চক্রবর্তী দুজনেই এক সময় জগদ্বিখ্যাত জেনারেল ইলেকট্রিকে কাজ করতেন। এই কোম্পানি ইলেকট্রিক ল্যাম্প থেকে আরম্ভ করে এরোপ্লেনের ইঞ্জিন এবং আণবিক চুল্লি পর্যন্ত কি না তৈরি করেন। 'ফ্রিজিডেয়ার' কথাটি বিশ্বময় চালু এখন, যে কোনো ঠাণ্ডা আলমারি বলতে ওই কথাটাই বোঝায়—কিন্তু আদিতে ঐ শব্দটি ছিল জেনারেল ইলেকট্রিকের ট্রেডনাম।

নামেই ইলেকট্রিক, কিন্তু এরা নানা বিষয়ে আছেন, এমন কি এদের গবেষণাগারে 'বাগ' বা ক্ষুদে পোকা সম্বন্ধেও গবেষণা চলতো। আনন্দবাবুর ব্যাপারটাও এই প্রসঙ্গেই এসে যায়।

অসীম দত্ত চৌকশ ইতিহাস গবেষক। সেদিন লাইব্রেরি থেকে ফিরে এসেই বললেন, "নিন আপনার আনন্দবাবুর ঠিকুজিকুষ্টি। পুরো নাম আনন্দমোহন চক্রবর্তী। আপনার থেকে পাঁচ বছরের ছোট, জন্ম ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৮। জনক-জননী হলেন সত্যদাস ও ষষ্ঠীবালা। আপনার কলকাতা অফিসের কাছে সেন্ট

জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৫৮-তে বি-এসসি এবং দু'বছর বাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এসসি। পি-এইচ-ডি করতে একটু সময় লেগেছে—১৯৬৫। ওই বছরে আরও একটি বড় কাজ করেছেন, বিবাহিত হয়েছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তীর সঙ্গে জৈষ্ঠ্য মাসে, ইংরিজি মতে ২৬শে মে। ঐ বছরেই দেখা যাচ্ছে দেশত্যাগ—প্রাণরসায়ন, অর্থাৎ বায়োকেমিসট্রিতে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐ পদেই ১৯৭১ পর্যন্ত। তারপর প্রায় একদশক জেনারেল ইলেকট্রিকের গবেষণাকেন্দ্রে। বিরাট নামধাম—এমনই সাফল্য যে ১৯৭৫ সালে আমেরিকার মস্ত সম্মান সায়েনটিস্ট অফ দ্য ইয়ার। আপনার আমার দেশে তো অন্য ব্যাপার! ফিল্মস্টার অফ দ্য ইয়ার, পলিটিসিয়ান অফ দ্য ইয়ার, ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার এই সব নিয়েই গোটা বাঙালী জাতটা সারাক্ষণ ব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, এসবদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও নেই, উৎসাহও নেই। সায়ানটিস্ট-ফায়ানটিস্ট হয়েছো? বেশ কথা, মাইনেপত্তর পাচ্ছো, কাজে ঠেকা দিয়ে যাও। যদি দেশ থেকে কেটে পড়ে বাইরে গিয়ে হরগোবিন্দ খুরানা এটসেটেরা হয়ে নামটাম করো তখন আমরা দাবি করবো, ইনি আমাদের লোক। সন অফ মাদার ইণ্ডিয়া। এ-ছাড়া আমাদের কোনো আগ্রহ নেই সায়েন্সে, প্রযুক্তিতে—ওসব জার্মানদের, জাপানীদের, আমেরিকানদের কাজ। আমাদের কাজ দেশে যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যেতে চায় তাদের কোমর ভেঙে দেওয়া, তাদের বিষদাঁত তুলে নেওয়া—যাতে সারা দেশটাই অপদার্থ মানুষে ভরে যায়, কাজের কাজ কিছু না হয়!"

খুব হাসলাম আমরা। রণজিৎবাবু বললেন, "বৈজ্ঞানিক মহলে আনন্দমোহন চক্রবর্তীর নাম জানে না এমন লোক নেই।"

"ওঁর কাজটা কী?"

"সায়েন্স তো ও বেচারার গোমাংস! নিরক্ষরদের কাছে সেক্সপীয়র সম্পর্কে কিছু বলা আর মাইক্রোবায়োলজি সম্পর্কে শংকরবাবুকে বোঝানো একই ব্যাপার!" অসীমবাবুর নিষ্করুণ মন্তব্য, যেহেতু সমগ্র শ্রীহট্ট চৈতন্যদেব ছাড়া আমার পরিচিতজন কেউ নেই!

তারপর ব্যাপারটা আমার বিদ্যেতে যা দাঁড়ায় বোঝাতে গেলে তা এই রকম—অণুজীবতত্ত্ব নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে এখন বিরাট গবেষণা চলেছে। অণুজীবীরা মানবশরীরে প্রবেশ করে যেমন নানা রোগের কারণ ঘটায়, তেমন এই অণুজীবীরা মানুষের পরম বন্ধুও বটে। নানারকম পচায়ের ব্যাপারে, নানা রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপে এরা অসম্ভবকে সম্ভব করে, যদিও এদের চোখে দেখা যায় না। মাইক্রোবায়োলজির এই অনুসন্ধান চলেছে গত কয়েক দশক থেকে এবং লুই পাস্তুর, রবার্ট কক ইত্যাদি কয়েকজনের নাম গল্প-উপন্যাসেও এসে

যায়। কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী ইউরোপ ও আমেরিকায় পরীক্ষাগারে অভিনব উপায়ে নতুন-নতুন অণুজীব বা পোকাসৃষ্টির সীমাহীন প্রচেষ্টা চলেছে। এই সব পোকা ভাল অথবা মন্দ দুই কাজেই লাগানো যেতে পারে। যেমন যুদ্ধের সময় শত্রুদেশে জীবাণু ছড়িয়ে নানা মহামারী সৃষ্টি করা সম্ভব। আবার বিশেষ পোকা দিয়ে এমন ওষুধ ফারমেনটেশন সম্ভব যা অন্য পন্থায় হয় অসম্ভব না-হয় অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ।

মার্কিনী ও সুইস ওষুধ কোম্পানিরা বেশ কিছুদিন ধরে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পোকার চাষ করেন গবেষণাগারে এবং তা নিজেদের কাজে লাগান। এগুলি এতো গোপনে করা হয় যে দু'একজন অতিবিশ্বস্ত কর্মী ছাড়া কাউকে কিছু জানতেই দেওয়া হয় না, পাছে অন্য কোম্পানি তা জেনে বাজিমাত করে। মার্কিন দেশে আর এক মুশকিল, একদল গোঁড়া মানুষ আছেন যাঁরা নতুন জীবন সৃষ্টির এই প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখেন—খোদার ওপর খোদকারি তাঁদের পছন্দ নয়। যেমন তাঁদের অপছন্দ গবেষণার নামে বাঁদর ইত্যাদির ওপর নিষ্ঠুরতা দেখানো।

যাঁরা নতুন-নতুন উপায়ে এক ধরনের পোকার সঙ্গে আর এক ধরনের পোকার মিলন ঘটিয়ে ভিন্ন ধরনের পোকা তৈরি করছেন তাঁদের প্রধান অন্তরায়, এই পোকাগুলিকে সরকারী ভাবে পেটেন্ট করা যায় না। অন্য সব আবিষ্কারে পেটেন্টের সুবিধা আছে।

আপনি মাথা খাটিয়ে বহু সময় ও অর্থব্যয় করে একটি নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কার করেছেন, পেটেন্টে নিলে কয়েক বছর এই আবিষ্কারের সুবিধা আপনি ছাড়া কেউ নিতে পারবে না। যদি কেউ ওটি ব্যবহার করতে চায় তাহলে আপনার অনুমতির প্রয়োজন হবে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় এর নাম কপিরাইট—শিল্পী যা সৃষ্টি করেছেন তার পার্থিব অধিকার তাঁরই, নির্দিষ্ট কয়েকটি বছরের জন্যে।

পেটেন্টের মহাতীর্থ এই আমেরিকা। স্রেফ এক একটি আবিষ্কার ও তার পেটেন্ট নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠান। যেমন টেলিফোনের আবিষ্কারক ও পেটেন্টমালিক জন গ্রাহাম বেল প্রতিষ্ঠিত বেল কোম্পানি—মার্কিনী টেলিফোনের হর্তাকর্তাবিধাতা। গল্প আছে, গ্রাহাম বেলের সমসাময়িক আর-একজন ভদ্রলোক একই সময়ে টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোক পেটেন্ট অফিসে পৌঁছতে কয়েক ঘন্টা দেরি করে ফেলেছিলেন, ইতিমধ্যে জন গ্রাহাম বেল তাঁর আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। সামান্য কয়েকঘন্টার জন্যে বিপুল বৈভব থেকে প্রথম লোকটি বঞ্চিত হলেন।

পোকাদের মার্কিন মহলে প্রিয় নাম 'বাগ'—যদিও আমাদের ইস্কুলপাঠ্য

অভিধান খুললে বাগ বলতে ছারপোকা ছাড়া কিছুই পাবেন না। অথচ বৈজ্ঞানিক মহলে এখন সহস্র-সহস্র অথবা লক্ষ-লক্ষ বাগের সম্ভাবনা। এতোদিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেন্ট পাওয়া যেতো সেই সব বিষয়ে, যার প্রাণ নেই। প্রাণ সে তো ঈশ্বরের এক্তিয়ার। সেখানে কী করে পেটেন্ট দেওয়া হবে, সে-প্রাণ যতই অভিনব হোক এবং গবেষণাগারে তার পিছনে যতই সাধনা থাকুক।

জেনারেল ইলেকট্রিক গবেষণাগারে আনন্দমোহন যা সৃষ্টি করলেন তা এক অভিনব পোকা। কথা উঠলো, আদালতে মামলা হওয়া উচিত, কেন এই পোকা তৈরির পেটেন্টস্বত্ব যিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর থাকবে না?

দীর্ঘদিন ধরে এই মামলা চললো। তারপর একদিন আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট আনন্দমোহন চক্রবর্তী ও জেনারেল ইলেকট্রিকের পক্ষে রায় দিয়ে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে প্রবল উত্তেজনা ও বিস্ময় সৃষ্টি করলেন। সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারকরা স্বীকার করলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন শুধু নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে সীমায়িত নয়। নতুন-নতুন প্রাণের সৃষ্টিতে অজানা এক বিশ্ব উন্মোচিত হতে চলেছে। যে-প্রাণ পৃথিবীতে ছিল না, অভিনব পদ্ধতিতে ও প্রচেষ্টায় সে-প্রাণ যদি গবেষণাগারে সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে পেটেন্টের সুরক্ষা না-দিলে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কেউ অর্থলগ্নী করবে না, অথবা গবেষণা চালাবে না। সুতরাং আনন্দমোহন চক্রবর্তী গবেষণাগারে যে 'বাগ' সৃষ্টি করেছেন তার পেটেন্ট তাঁর প্রাপ্য।

এই রায়ের ফলে বিশ্ব অণুজীবতত্ত্বের অবিশ্বাস্য অগ্রগতির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হলো। যা বহু আমেরিকান বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ছিল তা সম্ভব হলো সাঁইথিয়া বীরভূমের একটি মধ্যবয়সী বাঙালীর একাগ্রতার ফলে।

কিন্তু 'বাগ' বলতে এখনও ছারপোকা ছাড়া আমি কিছুই কল্পনা করতে পারছি না। সুরসিক অসীমবাবু বললেন, "আরে ব্রাদার, ব্যাপারটা বয়-মিট্স-এ-গার্ল স্টোরি নয় যে বাঙালী গল্পলেখক টপাং করে বুঝে ঝপাং করে গপ্পো বানিয়ে ফেলবে। একমাত্র সুকুমার রায় কিছুটা আগাম ভাবতে পেরেছেন—যেমন হাঁস ও সজারুর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে 'হাঁসজারু' হলো। কিংবা ধরো, গাধা ও জেব্রায় ভাব ঘটিয়ে 'গাব্রা' তৈরি করা হলো। কিংবা ধরো, পিঁপড়ের সহায়তায় তুমি এমন ভেজিটারিয়ান ছারপোকা বানালে যে কেবল মিষ্টি খেতেই ভালবাসে—নাম দিলে ছিঁপড়ে। কিন্তু এসব তবু তো চোখে দেখা যায় যা একদমই দেখা যায় না সেই নিয়েই তো আনন্দবাবুর মতন মাইক্রোবায়োলজিস্টদের কাজ কারবার।"

রণজিৎবাবু বললেন, "আপনি নিশ্চয় কাগজে রিপোর্ট পড়েছেন ওঁর

গবেষণা হচ্ছে পেট্রোল সংক্রান্ত। ওঁর তৈরি পোকা চটাপট তেল খেয়ে নিতে ওস্তাদ—তেল পেলে তারা কিছুই চায় না। আপনি হয়তো বলবেন, এই পেটুক পোকা নিয়ে কোম্পানিরা কি করবে?"

আমি বললাম, "দয়া করে ইন্ডিয়াতে যেন এই পোকা পাঠানো না হয়। এমনিতেই পেট্রোল স্টেশনে তেলের মাপ নিয়ে সদাসন্দেহ, এরপর পেট্রোলখেকো পোকার ছুতো থাকলে আর দেখতেই হবে না। গোরুতে কয়লা খেয়ে নিচ্ছে এমন অভিযোগও সরকারী স্টকবাবুরা সেই বৃটিশ আমল থেকে ওপর মহলে পাঠাচ্ছেন!"

রসিকতা বন্ধ রেখে 'পেটুকানন্দ' তেলপোকার যা উপকারিতার সম্ভাবনা পাওয়া গেলো তো সুদূরপ্রসারী। মনে করুন, হাজার-হাজার টন তেল নিয়ে কোনো তৈলবাহী জাহাজ চলেছে একদেশ থেকে আর-এক দেশে। তারপর কোনো দুর্ঘটনায় ওই তেল ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সমুদ্রের জলে। মাইলের পর মাইল ধরে ভেসে এই তেল এগিয়ে আসছে উপকূলের জনবসতির দিকে। এই তেল সর্বনাশ করবে জনপদের—অথচ একে সরানোর কোনো পথ নেই।

এইবার ভাবুন, বৈজ্ঞানিক দিকটা। লক্ষ-লক্ষ মানুষের মঙ্গলের জন্য আপনি খবর দিলেন কোনো বিশেষজ্ঞকে। তিনি ওই তেলখেকো পেটুকানন্দ পোকাদের ছেড়ে দিলেন সমুদ্রে—তারা মন্ত্রবৎ বিপুল জলরাশিকে তৈলদূষণ থেকে মুক্ত করলো। এ তো একটি দিক। এই পোকারই মাসতুতো ভাইকে আপনি নামিয়ে দিলেন মাটির তলায়, তেল অনুসন্ধানের কাজে। কোটি কোটি টাকার সম্পদ আবিষ্কার হলো জীবাণুদের সাহায্যে।

ব্যাক টু আনন্দমোহন চক্রবর্তী। "আনন্দ এখন আর জেনারেল ইলেকট্রিকে নেই। সে শিকাগোতে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় মেডিক্যাল সেন্টারে মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক। নানা বিস্ময়কর গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।"

কিন্তু শিকাগো সে তো এই ওহায়ো রাজ্য থেকে অনেক দূর। আনন্দ চক্রবর্তীর দর্শন কি তা হলে আমার ভাগ্যে নেই?

অসীম দত্ত আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, "হতাশ হবেন না। মনে রাখবেন আপনি শ্রীহট্টের দত্তর কাছে অনুরোধ করেছেন। শিলেটি দত্তরা যদি একবার ঠিক করে আপনার সাধ-আহ্লাদ পূরণ করবে তা হলে পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই তাকে আটকায়। আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে আপনার দেখা হচ্ছেই—নিদেনপক্ষে ওঁর শ্যালিকার সঙ্গে! বৈজ্ঞানিক আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সম্বন্ধে কিছু জানতে না-পারলেও জামাইবাবু আনন্দমোহন চক্রবর্তী সম্পর্কে

আপনি বহু অপ্রকাশিত খবর নিয়ে যেতে পারবেন ফর কলকাতার মেয়েলী পত্র পত্রিকা।"

বন্যদের বনে, শিশুদের মাতৃক্রোড়ে এবং কৃতবিদ্য গবেষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে স্থাপন না করলে তাদের পূর্ণ মহত্ত্ব বিকশিত হয় না। জন ক্যারল বিশ্ববিদ্যালয়টি যে-চত্বরে তাঁর নাম ইউনিভার্সিটি হাইটস, ওহায়ো। সেখানেই ষষ্ঠ নর্থ আমেরিকান বাঙালী সম্মেলনের জন্য নির্দিষ্ট বিশাল সভাগৃহের অদূরে শ্যালিকাপরিবৃত অবস্থায় এক জামাইবাবু বাঙালীকে হাল্কা মেজাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা গেলো!

সুদূর আমেরিকাতেও সুদর্শন জামাইবাবুটি যে গরদের পাঞ্জাবি ও ধুতি পরেছেন তার নমুনা জামাইষষ্ঠীর শুভপ্রভাত ছাড়া এই কলকাতা শহরেও বিরল হয়ে উঠেছে। দেশত্যাগ করার আগে দেশবিভাগ করে বিপ্লবী বাঙালীর বারোটা ইংরেজরা বাজিয়ে গিয়েছে। আর দৃষ্টিনন্দন বাঙালীকে শেষ করলো এই টেরিলিন কোম্পানিরা! ধুতি ছাড়িয়ে চোঙা পরিয়ে জাতটার শেষ বৈশিষ্ট্য তারা মুছে দিলো—এই মহাপাপের জন্য বিলিতি আই-সি-আই ও আমেরিকান ডুপন্ট কোম্পানি বাঙালীর ইতিহাসে চিরদিনের জন্য ক্ষমার অযোগ্য হয়ে রইলেন!

তাও ভাল, নর্থ আমেরিকান বাঙালী সম্মেলনে এসে জন ক্যারল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আগস্টের এই মধ্যদিনে যত ধুতি পাঞ্জাবিপরা সুবেশী বঙ্গসন্তান দেখলাম তা অনেকদিন চোখে পড়েনি। বাঙালীত্বের শেষ চিহ্নগুলি খুঁজে বেড়াবার জন্য আগামীকালের গবেষকদের হয়তো বাঙলার বাইরেই সন্ধানকার্য চালাতে হবে।

ইউনিভার্সিটি হাইটস্ সভাগৃহের প্রশস্ত লবির এক কোণে যে জামাইবাবুটি আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন তিনি অবশ্যই অতীব সুদর্শন, বয়স কিছুতেই বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি হতে পারে না। মেদহীন সুশাসিত শরীর, সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন স্তম্ভে এই রঙকেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রূপে রাজটীকা দেওয়া হয়।

সম্মেলনের কো-চেয়ারপার্সন রণজিৎ দত্ত বিজয়গর্বে বললেন, "ওই তো আমাদের আনন্দ—আমেরিকার ডঃ এ. এম. চক্রবর্তী—ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি অ্যাণ্ড ইমিউনোলজি, ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় মেডিক্যাল সেন্টার।"

পরবর্তী রসরসিকতাটি এই রকম ঃ "আনন্দ এই কনফারেন্সে আসবে না তা কখনও হয় ! ওর শ্যালিকা এখানকার উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন। ওহায়ো থেকে কান টানলে শিকাগো থেকে মাথা আসবেই !"

আরও আনন্দ সংবাদ, স্বয়ং আনন্দবাবুও নাকি এই অধমের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য খোঁজাখুঁজি করছেন। প্রবাসের গেরস্ত বাঙালীরা অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে দেশ থেকে আসার রাহাখরচ জুগিয়েছেন—এতো দূরে এসে মাইকের সামনে একটা প্রমাণসাইজের 'পালাগান' না-গাইলে পয়সা উসুল হয় না—সেই সাহিত্যসংক্রান্ত কাজটা আমাকে সকালের দিকেই সারতে হয়েছে।

'আজকের বাঙালী সমাজ'—কুলান অডিটোরিয়ামে শ'পাঁচেক দেশী ভায়ের সামনে এই ছিল আমার কেত্তনের বিষয়। অসীম দত্ত মহাশয়ের সময়োচিত রসিকতা, "সমাজও নেই, বাঙালীও যেতে বসেছে ! আপনি মিনিট পঞ্চাশেক টানবেন কী করে ?"

আমার কাতর নিবেদন, "বিফলে মূল্য ফেরত, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। দায় পরিশোধের দুর্মূল্য ডলার এই ছা-পোষা হাওড়ীয় কোথায় পাবে ? যদিও শ্রীহট্টীয় নই, তবু একটু সাফল্য প্রার্থনা করুন !"

উঃ সে এক বক্তৃতা ! ভ্যালিয়াম নামে এক উদ্বেগনিরোধক সুইস বটিকার কল্যাণে এবং বিবেকানন্দর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে সিসটার্স, ব্রাদারস অ্যাণ্ড সিসটার-ইন-লজ অফ আমেরিকার সামনে আমি যে কী নিবেদন করেছি তা আমার নিজেরই খেয়াল নেই। শুধু মনে আছে, এক টুকরো চিরকুটে আমি মূল বক্তব্যটা লিখে নিয়েছিলাম। 'কে বলে বাঙালী মৃত ? নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে এতো আনন্দ পৃথিবীর আর কোনো সমাজ পায় না। বাঙালী তিন প্রকার ঃ মাইল্ড, মিডিয়াম ও সুইসাইড। বাঙালীকে মরিয়া প্রমাণ করিতে হইবে সে মরে নাই ! এবং আত্মহনন যেহেতু আইনবিরুদ্ধ সে-হেতু পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজতেই হবে। বাঙালী সমাজের মুক্তির পথ সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সংস্কৃতিতে নয়—মুক্তির পথ বিত্তের সাধনায়, বাঙালীর ঘরে-ঘরে আবার লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগ্ম সাধনা শুরু হোক।"

আনন্দমোহন চক্রবর্তী এই জনসভায় ছিলেন কিনা তা আমি মঞ্চ থেকে লক্ষ্য করিনি। কিন্তু দেখলাম, আমার মূল বক্তব্যটির সারাংশ তাঁর মাথায় বেশ ঢুকে গিয়েছে।

শ্যালিকা সান্নিধ্যে সস্ত্রীক আনন্দমোহন আমাকে মুহূর্তে আপন করে নিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর ক্লিভল্যাণ্ডনিবাসী ভায়রাভাই-এর সঙ্গে। (এই সম্পর্কটির জন্য একটি পরিচ্ছন্ন নিটোল সংস্কৃত শব্দ থাকলে ভাল হতো !)

বয়সের তুলনায় আনন্দকে অনেক তরুণ দেখায়। বৈজ্ঞানিক সাফল্যের

তুলনায় নিজেকে অনেক হাল্কা রাখার দুর্লভ পথটিও তিনি আবিষ্কার করেছেন। আদর্শ জামাইবাবুর মডেল। কন্যার এই ধরনের স্বামীপ্রাপ্তির জন্যেই আমাদের নিকটাত্মীয়ারা উপবাসে শরীর ক্লিষ্ট করেন।

প্রথমে রসিকতার আদানপ্রদানে। আমার সঙ্গীর সংযোজন, "শ্যালিকা ও জামাইবাবুর মধ্যে কে বেশী বিখ্যাত তা বলা খুব শক্ত। ইনিই একমাত্র ক্যালকাটা লোরেটো ললনা যিনি মার্কিন মুলুকে বসে বাইশ রকমের সন্দেশ তৈরি করে অতিথিদের খাওয়াতে পারেন। চক্রবর্তী মশাই তো পোকামাকড়ে ডুবে রয়েছেন, হরলিকসের খালি বোতলে রাতারাতি গলদাচিংড়ি উৎপাদনের কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আমাদের জন্যে এখনও আবিষ্কার করেননি।"

শ্যালিকা প্রতিবাদ তুললেন, "বাইশ নয়, জামাইবাবুর জন্যে এবারে মাত্র এগারো রকম সন্দেশ করে রেখেছিলাম।"

"আমরা ওঁর শ্যালিকাসৌভাগ্য সম্পর্কে ঈর্ষাবোধ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কী করতে পারি?"

শ্যালিকাকে বললাম, "আপনি বিব্রত হবেন না। আপনাকে মার্কিন মুলুকে নিরাপদে সুপাত্রস্থ করার জন্য আনন্দবাবু যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা ওঁর আবিষ্কার-কর্ম থেকে যে কোনোরকমেই গুরুত্বহীন নয়, এমন গোপন রিপোর্ট আমার কাছে আছে। আনন্দবাবু ইলিনয় রাজ্য থেকে ওহায়ো রাজ্যে ঘনঘন এসে আপনার ভাবী স্বামীদেবতা সম্পর্কে পরিচিত মহলে নানা রকম খোঁজখবর নিয়েছেন এবং বিভিন্ন অ্যাসিড টেস্ট-এর পরেই কলকাতায় শ্বশুরমশায়কে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। সুখী বিবাহিত জীবনে আপনি জামাইবাবুকে এগারো কেন একশো দশ রকম সন্দেশ তৈরি করে খাওয়ালেও আমাদের কিছু বলার থাকতে পারে না।"

"লোরেটো-শিক্ষিতা বঙ্গতনয়াদের রন্ধনপটুতা সম্পর্কেও দেশবাসীর ভুল ভাঙবে, যদি এ-বিষয়ে যথাসময়ে দু'একটা লাইন কোথাও লেখা হয়।" আরেকজনের মন্তব্য। আমার সংযোজন, "নিজের স্বার্থেই এবার তা আমাকে করতে হবে, কারণ আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাটিও মিড্‌লটন রো-এর ওই কলেজের ছাত্রী। জয় হোক লোরেটা-ললনাদের।"

আনন্দমোহন চক্রবর্তী এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "আপনার কিছু-কিছু লেখা আমার নজরে এসেছে। আপনি শুধু বাঙালীদের গল্পই শোনান না, বাঙালীর বিত্তসন্ধান ও অন্নসমস্যা সম্পর্কেও আপনার উদ্বেগ রয়েছে মনে হয়। সবদিক থেকে একই সঙ্গে সজাগ না হয়ে উঠলে জাতির নবজাগরণ শুরু হবে না। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও কথা আছে আপনার সঙ্গে। কিছুদিন আগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এদেশে এসেছিলেন। এখানকার অনাবাসীদের সঙ্গে বিজ্ঞান,

প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হলো। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, পুরনো সেই হচ্ছে-হচ্ছে হবে-হবে মানসিকতা ভারতবর্ষ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।"

আনন্দবাবু নিজের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম সামলে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে কয়েকবার দেশ ঘুরে এসেছেন। তাঁর প্রধান কাজকর্ম অবশ্যই রাজধানী দিল্লীতে এবং কিছুটা হায়দ্রাবাদে। দু'একবার কলকাতাতেও বুড়ি ছুঁয়েছেন। কলকাতা তাঁর শ্বশুরবাড়িও বটে। তবে প্রিয় বাসস্থান গোলপার্কে—রামকৃষ্ণ মিশন আন্তর্জাতিক অতিথিশালা। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আনন্দবাবুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে—কারণ ভারতবর্ষের নতুন মানবসমাজ গঠনে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের কিছুটা সমঝোতা প্রয়োজন হবে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতবর্ষের ভিত্তিভূমিতে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলা সম্পর্কে যেসব কথা বলেছিলেন তা এখনও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি।

আনন্দবাবুর সঙ্গে ওই যে জন ক্যারল বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যামণ্ড রুমের সামনে ভাব হলো তা সামান্য কিছুদিনের মধ্যে বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে, গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন অতিথিশালায়, কলকাতা-বোম্বাই বিমানযাত্রার পথে। পরিচিত হয়েছি তাঁর শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে, চিঠি পেয়েছি পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে।

শ্বশুরমশাই বলেছেন, "ওই আমার জামায়ের একটি মিষ্টি স্বভাব—পৃথিবীর কত জায়গায় যায়, কত কাজে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু প্রিয়জনদের ভুলে যায় না। সব জায়গা থেকেই পিকচার পোস্টকার্ড পাঠায়, পিছনে কয়েক লাইন লিখে দেয়, আমাদের প্রাণ জুড়োয়।"

বলাবাহুল্য, আমারও সেই সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের এই দেশে একসময়ে লেখকদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের, দার্শনিকদের, চিকিৎসাবিদ্‌দের, আইনজ্ঞদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতো, একে অপরের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করতেন। এখন এই কলকাতা শহরে আমরা সকলেই নিজ-নিজ দুর্গে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে ফোর্ট উইলিয়ম নামটির যথার্থতা প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা করছি!

বিজ্ঞানের যে জটিল বিষয়ে আনন্দমোহনের কাজকর্ম সে-সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এতোই কম যে তার গভীরে প্রবেশ করার ধৃষ্টতা একেবারেই নেই। কিন্তু যা বুঝলাম, এই বায়োটেকনলজির ওপরেই মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করছে।

আনন্দমোহনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভারতের গবেষণা ও শিল্পোদ্যমে তার ব্যবহার

সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে মার্কিন দেশে বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের সম্বন্ধেও কথা এসে গিয়েছে।

ব্যাপারটা দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে যতটা বুঝেছি, তা অনেকটা এই রকম: আমেরিকা চিরকালই ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগীদের দেশ যার প্রচলিত প্রতিশব্দটি হলো আঁতরপ্রেন্যর। কারবারী বা উদ্যোগী বললে ঠিক ব্যাপারটা আসে না।

সত্তর-আশি বছর আগে ম্যাকেঞ্জি কিং নামে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, "শ্রমিকরা কিছুই করতে পারে না যদি না মূলধন থাকে। আবার মূলধন নিয়ে কী হবে যদি শ্রমিক না থাকে? শ্রম ও মূলধন দুইই অকেজো যদি না তার পেছনে থাকে ম্যানেজমেন্ট। আবার ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালকরা যতই মহাপুরুষ হোন সমাজের সমর্থন ছাড়া তাঁরা কী করতে পারেন?"

আঁতরপ্রেন্যরদের আকুতি থেকেই নাকি আমেরিকার জন্ম। আদি এই উদ্যোগী পুরুষটির নাম কলম্বাস। প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে তাঁর প্রচেষ্টার জন্যে মূলধন জোগালেন স্পেনের রাণী ইসাবেলা। নতুন ভূখন্ড আবিষ্কার হওয়ায় স্পেন যথেষ্ট লাভবান হলো। উনিশ শতকের শেষ দিকে আমেরিকায় উদ্যোগীদের সুবর্ণযুগ শুরু হলো—সেই সময় কৃষিপ্রধান আমেরিকায় শিল্পবাণিজ্যের ভিত্তিভূমি রচিত হলো। কয়েকজন উদ্যোগী পুরুষ আমেরিকার ভোল পাল্টে দিলেন—তাঁদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হলো বিরাট-বিরাট ইস্পাত কারখানা, মোটরগাড়ির কারখানা, কেমিক্যাল কোম্পানি এবং পেট্রোল কোম্পানি। এই শতাব্দীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে আবির্ভাব হলো বহুজাতিক কর্পোরেশনের—যেমন ডুপন্ট, ওয়েস্টিং হাউস, আর-সি-এ, জেনারেল ইলেকট্রিক (যেখানে আনন্দবাবু এক সময় গবেষণা করতেন)। এঁদের চেষ্টাতেই আমরা পেলাম রেডিও, টেলিভিশন, নাইলন, ট্রানজিস্টর যা সমস্ত মানবসমাজের জীবনধারা পাল্টে দিলো।

আজকের আমেরিকান শিল্পোদ্যোগের রূপরেখা কিন্তু সম্পূর্ণ পাল্টাতে চলেছে। বিরাট-বিরাট কোম্পানির সেই হৈ-চৈ আর নেই। গত কয়েক বছরে তাঁরা লক্ষ-লক্ষ কর্মীকে ছাঁটাই করেছেন। অথচ ছোট কোম্পানিরা একই সময়ে প্রায় এক কোটি নতুন লোকের অন্নসংস্থান করেছেন।

ইউনিভার্সিটি হাইট্স-এর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কফি পান করতে করতেই আমি শুনলাম "ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমেরিকান অর্থনীতি ক্রমশ সার্ভিস বা সেবামূলক অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে। যার অর্থ হলো, বড়-বড় ইস্পাত, কেমিক্যাল, এমন কি ইলেকট্রনিক কলকারখানায় যত লোক কাজ করছেন তার থেকে বেশি লোক চাকরি পাচ্ছেন রেস্তোরাঁয়, ট্যুরিজমে, ব্যাংকিং-এ, কমপিউটর সফটওয়ারে, হাসপাতালে, ইস্কুলে ইত্যাদিতে। ডাইনোসর

আকৃতির এমন আমেরিকান কোম্পানিও আছে, যেমন মিনেসোটা মাইনিং ম্যানুফ্যাকচারিং, যাঁরা প্রায় ৬০,০০০ জিনিস তৈরি করেন। কিংবা জগদ্বিখ্যাত জেনারেল মোটরস্ কোম্পানির কথা ধরুন। এঁরা এখন শুধু মোটরগাড়ির ব্যবসাতেই নেই। আমেরিকার বৃহত্তম তেজারতি কারবারি বলতেও এখন তাঁদেরই বোঝায়। এ-ছাড়া এঁরা এখন ডাটা প্রসেসিং-এর ব্যবসায় নেমেছেন, রোবট বানাচ্ছেন, এমনকি স্বাস্থ্য-যত্ন সংক্রান্ত ব্যবসায়ে নামবার পরিকল্পনা নিয়েছেন।"

আমি শুনছি এই সব কথা। একটা জিনিস জানা ছিল না, আগে সব কোম্পানিই নিজে সমস্ত যন্ত্রাংশ তৈরি করা পছন্দ করতেন। অর্থাৎ যদি মোটরগাড়ি তৈরি করতে চাও তাহলে শুরু করো মাইনিং থেকে—লোহা উঠুক খনি থেকে ইস্পাতে পরিবর্তিত হবার জন্যে, তারপর একই কোম্পনিতে তৈরি হোক সব রকম যন্ত্রাংশ। এক ভদ্রলোক জানালেন, "একসময় হেনরি ফোর্ড প্রতিষ্ঠিত ফোর্ড কোম্পানি ভেড়া পর্যন্ত প্রতিপালন করতেন—কারণ এই ভেড়ার পশম থেকে মোটর গাড়ির সীটকভার তৈরি হতো। এখন রেওয়াজ, যতটা পারো অন্য জায়গা থেকে যন্ত্রাংশ কেনো। ফোর্ডের গাড়ির অর্ধেকের বেশি যন্ত্রাংশ এখন বাইরে থেকে কেনা। কখনও-কখনও গোটা গাড়িটাই বাইরে থেকে তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে।"

এর কারণ কী জানতে চাইলে, ওখানেই শুনলাম, "যে-প্রতিষ্ঠান সব চেয়ে সস্তায় সব চেয়ে সেরা জিনিস তৈরি করবে তার কাছ থেকেই জিনিস আসুক। মূল প্রতিষ্ঠানকে অজস্র টাকা খাটিয়ে প্রত্যেকটি জিনিস তৈরির কারখানা বসাতে হলো না, ফলে মূলধনের ওপর চাপ কমে গেলো।"

আনন্দবাবু মৃদু হাসলেন। আমি শুনলাম, "আর একটা কারণ, টেকনলজির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আজ আপনি একটা যন্ত্রের ডিজাইন করলেন, দু'বছর পরেই সেটা নতুন কোনো আবিষ্কারের দাপটে সেকেলে হয়ে গেলো। ইলেকট্রনিক্সে এবং কমপিউটারে কোনো-কোনো প্রোডাকট্-এর জীবনকাল মাত্র দুই কিংবা তিন বছর।

আমার মনে পড়লো, আমার অভাগা জন্মভূমির কথা। আমার বাড়ির সামনের পাটকল তিপ্পান্ন বছর আগে যেমন ভাবে চলতো এখনও সেই একই পদ্ধতিতে চলছে। এমন কারখানা আমি দেখেছি (এবং এঁদের নামডাকও আছে) যেখানে ষাট-সত্তর বছরের পুরনো যন্ত্রপাতি এখনও মনের আনন্দে ব্যবহার করা হচ্ছে। মালিকরা যতটা পারেন টাকা লুটে নিচ্ছেন, নতুন টেকনলজিতে অর্থলগ্নি করে সময়োপযোগী জিনিসপত্র তৈরিতে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মার্কিন দেশে ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে, টেকনলজির এই স্বল্পায়ুর

জন্যে বড় কোম্পানিরা একই ঝুড়িতে সব ডিম না রেখে বাজার থেকে যতটা পারেন যন্ত্রাংশ কিনছেন—এর সুবিধা হলো যে-মুহূর্তে নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আসবে, সে-মুহূর্তে টুক করে পুরনো উৎপাদন পদ্ধতি থেকে তাঁরা সরে যেতে পারবেন।"

তা হলে মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াচ্ছে ? জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং দাপটে আমেরিকায় বড়-বড় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে ? আমার ওদেশে থাকার সময়েই দু'খানা জগদ্বিখ্যাত ইস্পাত কারখানা গণেশ ওল্টালো। এ এক অদ্ভুত জাত। নিজেদের কারখানা একের পর এক বন্ধ করে বাইরে থেকে সেই একই জিনিস জলের দরে কিনছে। তাহলে আমেরিকার শিল্পসমৃদ্ধির সুবর্ণযুগ এবার কি শেষ হবার পথে ?

আমাকে বোঝানো হলো, "হ্যাঁ, অনেকে এ-ব্যাপার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ওইরকম নয়। গত বারো বছরে বড়-বড় আমেরিকান কলকারখানায় লাখ পঞ্চাশেক শ্রমজীবীর সংখ্যা কমলেও উৎপাদন বেড়েছে শতকরা চল্লিশ ভাগ।"

এক ভদ্রলোক বললেন, "শুনুন কিছু হিসেব। সেকেলে কলকারখানা যতই লাটে উঠুক, পৃথিবীর ইতিহাসে শান্তিকালীন সময়ে কোনো দেশ কখনও এতো চাকরির সুযোগ তৈরি করতে পারেনি যা করেছে এই মার্কিনীরা। তিয়াত্তর সালের আট কোটি চাকরি পঁচাশি সালে বেড়ে দাঁড়ালো এগারো কোটিতে ! আর পঁচানব্বই সালের মধ্যে আরও দেড় কোটি চাকরির সুযোগ তৈরি হবে এদেশের অর্থনীতিতে। আপনি ইস্পাত কারখানায় চাকরি পেলেন, না ম্যাকডোনল্ড ফাস্টফুডে চাকরি পেলেন তাতে আপনার কি এসে যায় ? আমেরিকান শ্রমমন্ত্রী তো সগর্বে ঘোষণা করলেন, আগামী তেরো চোদ্দ বছরে চাকরি-সন্ধানীদের থেকে চাকরির সংখ্যা বেশি থাকবে। তবে হ্যাঁ, আপনি ঠিক যেরকম চাকরিটি চাইছেন তা হয়তো না পেতে পারেন। আপনার ইচ্ছে আপিসের বড় কেরানি হওয়া, কিন্তু চাকরি যেটা রয়েছে, সেটা হয়তো কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেন কিচেনে আলুভাজার।"

একটি মজার খবর পাওয়া গেলো। সম্প্রতি যে-কোম্পানিটি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে এবং যার প্রচুর লাভ ও রমরমা তার সঙ্গে তথাকথিত সুপার-হাই টেকনলজির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই ! এটি হলো একটি চুল ছাঁটাই সেলুনের চেন !

জয় মা-লক্ষ্মীর জয় ! আমাদের নন্দ নাপিতকে কোনোরকমে একখানা গ্রীনকার্ড ধরিয়ে দিলে এখানে ভেল্কি খেলা দেখাতে পারতো। নন্দর স্পেশালিটি—পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ শল্যচিকিৎসকের নিপুণতায় নরুণ

দিয়ে কাটা। এই সঙ্গে ইণ্ডিয়ান নরুণ (গত পাঁচ হাজার বছরে যার কোনো ডিজাইনিং পরিবর্তন হয়নি) নতুন এক বাজারের সন্ধান পেতো।

নন্দ নাপিত অনাবাসী ভারতীয় (এন-আর-আই) হয়ে মাঝে-মধ্যে যখন আমাদের হাওড়া-শিবপুরে ছুটি কাটাতে আসতো তখন স্থানীয় রোটারি ক্লাবে আমরা তার সম্বর্ধনার আয়োজন করতাম। নন্দর ডলারের দিকে আমরা কোনোরকম শনির দৃষ্টি ফেলতাম না। মায়ের দিব্যি করে বলছি, ভারত-সন্তানের ডলার ওই মার্কিন দেশেই সহস্র থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে কোটিতে রূপান্তরিত হোক, আমরা শুধু বিশ্ববাসীকে দেখাতে চাই, এই নন্দই সুযোগসুবিধে পেলে আমাদের মহানন্দের কারণ হতে পারে।

নতুন চুলছাঁটা কোম্পানি সম্পর্কে সবচেয়ে মজার যা খবর—কোম্পানির দুই প্রতিষ্ঠাতারই কাঁচিধরার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

অভিজ্ঞতা না থাকলেও, এদের ছিল মগজ এবং উচ্চাভিলাষ—সারা দিন ক্ষুর শানিয়ে, কাঁচি চালিয়ে শতখানেক ডলার কামিয়ে সন্তুষ্ট হবার ছেলে তাঁরা নন।

তাঁরা ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানীর মানসিকতায় মার্কেট রিসার্চ করলেন—চুলছাঁটার দোকানের সাফল্যের রহস্যটা কী? গবেষণায় বেরুলো: দোকানটা কোথায়, কাছাকাছি গাড়িঘোড়া পাওয়া যায় কিনা এবং চুলছাঁটার জন্য গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কিনা। আপনার পাড়ার নন্দ নাপিতও জানে, সব লোক, এমনকি বেকার এবং বৃদ্ধ পেনসনাররাও সেলুনে এসে ঘড়ির দিকে তাকান, সময় সম্বন্ধে ছটফট করেন।

এই দুইজন সেলুন-পতি লোকজন নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে এবং একের পর এক দোকান খুলে বাজিমাত করে দিয়েছেন। অথচ এঁদের ঠিক আগের ব্যবসায়ে ওঁরা গণেশ ওল্টাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁদের একজন খুবই স্টাইলে বড়-বড় খবরের কাগজের রিপোর্টারদের বলেছেন, "কাঁচা টাকা কখন প্রয়োজন হবে তা অন্তত ছ'মাস আগে আমরা বুঝতে পারি এবং আমরা টাকার আগাম ব্যবস্থা করে ফেলি। আগের ব্যবসায় ফেল হওয়ার কারণ, ওই ব্যাপারটা ঠিক ম্যানেজ করতে পারিনি।"

সাধু! সাধু! বোঝা যাচ্ছে, নবীন দেশ আমেরিকায় নব-নবীন উদ্যোগীদের বিপুল সাফল্য-সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও সে-দেশে হেনরি ফোর্ড ও জন ডি রকিফেলাররা আর জন্মগ্রহণ করবেন না। আমরা আর দেখতে পাবো না কার্নেগি অথবা ডুপঁ-দের।

দুটি বিষয়েই মন্তব্যের ঝড় উঠলো অনাবাসী বাঙালী মহলে। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হলো, নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ইত্যাদি

সংবাদপত্রে গভীরতর মনোনিবেশ করতে। এই সব বিষয়ে সেখানে নাকি নিত্য আলোচনা চলে—যা আমাদের রাজনীতি ও রঙ্গজগতমুখী বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের পক্ষে অকল্পনীয়।

প্রথম সমালোচনা ঃ দোহাই, দেশের লোককে এই ভুল বোঝাবেন না যে আমেরিকান সমাজ এমনই প্রাণশক্তিহীন হয়ে উঠেছে যে তারা এখন আর ফোর্ড, কার্নেগির জন্ম দিতে পারবে না—কারণ এখন মাতসুহিতা, সুমিটোমো, মিৎসুবিসির যুগ! এই খবর পেলে রকে-বসা বাঙালীরা উৎফুল্ল হবেন এই কারণে যে তাঁরা তো স্বীকারই করে নিয়েছেন, রুগ্না বঙ্গজননী ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের জন্ম দিতে পারবে না।

আমেরিকান বন্ধ্যাত্বের কারণ, আমেরিকান কোম্পানি এবং ব্যক্তিদের ওপর আয়কর বিভাগের দুর্জয় দাপট। হেনরি ফোর্ড ও রকিফেলার যখন টু-পাইস কামিয়েছেন তখন ফেডারেল ট্যাক্স ছিল নামমাত্র। ১৯১১ সালে রকিফেলার যখন ব্যবসা থেকে অবসর নিলেন তখনকার যুগে তাঁর সম্পত্তির দাম দেড় হাজার মিলিয়ন ডলার (দু'হাজার কোটি টাকার মতন!) ট্যাক্সওয়ালাদের কল্যাণে এখন আর এই ধরনের ধনসঞ্চয় সম্ভব নয়! তবে এরই মধ্যে দু'চারজন দু'একটা ছোটখাট বুদ্ধি খাটিয়ে, সামান্য কিছু টাকা ঢেলে কোটিপতি হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে কেউ একখানা ফোকসওয়াগেন বাস বিক্রি করে অ্যাপ্‌ল কমপিউটার নামে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আবার কেউ সবুজ চায়ের ব্যবসায় নেমেছেন (সেলেসচিয়াল সিজনিংস), আবার কেউ স্রেফ মিঠাই দোকানের চেন শুরু করেছেন আমেরিকান কুকি বেচবার জন্যে। বিরানব্বইটা আমেরিকান কুকির দোকান করে যদি দেশবিখ্যাত হওয়া যায় (আমেরিকান কুকি এমন একটা আহামরি কিছু পদার্থ নয়!), তাহলে আমাদের গিরীশ, নকুড়, ভীমনাগ, দ্বারিক, গাঙ্গুরাম, পরশুরাম, মিঠাই, তেওয়ারি, শর্মারা যদি ভারতীয় মিষ্টান্নামৃত নিয়ে ওদেশে একবার নাক গলাতে পারতেন কী ব্যাপারখানাই যে হতো!

মিছরিদা আমাকে তো দুঃখ করে বলেছিলেন, "ওরে আমাদের রণকৌশলেই ভুল হয়ে গিয়েছে—বিদেশে শুধু বেদান্ত-উপনিষদ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে এ-জাতকে কাত করা যাবে না। সেই সঙ্গে চাই শিঙাড়া, জিলিপি, গজা, সন্দেশ, রসগোল্লার বহুমুখী আক্রমণ। তারপরেই পাঠাতে হবে ইডলি-দোসা, সুকতো, শাক-চচ্চড়ি, ছ্যাঁচড়া টেকনলজি—দ্যাখ না দেশটা আমাদের পায়ের তলায় লুটোয় কিনা। সামান্য টিভি, টেপরেকর্ডার, ভি-সি-আর, আর দু'একখানা দামে-সস্তা কাজে-ভাল মোটর গাড়ি পাঠিয়ে জাপানীরা কী করে ফেললো দেশটার। জাপানীরা এখন নাকি হাজার-হাজার কোটি ডলার ধার দিচ্ছে

আমেরিকান সরকারকে এবং আমেরিকান বিজনেসকে!"

মারো গোলি জাপানীদের! ওদের সাফল্য নিয়ে তো বিশ্বময় আলোচনা। খাঁদা-নাকারা দুনিয়ায় সবচেয়ে নাকউঁচু জাতের নাক দেওয়ালে ঘষে প্লেন করে দিয়েছে। আমরা ফিরে যেতে চাই ছোট বিজনেসের আলোচনায়। বুঝছি, বিরাট দেশ আমেরিকায় এখন নতুন স্লোগান—স্মল ইজ বিউটিফুল। ছোট পরিবারই সুখী পরিবার, ছোট উদ্যোগই সেরা উদ্যোগ—অর্থাৎ বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে!

ইউনিভার্সিটি হাইটস-এর লাউঞ্জে দাঁড়ানো এক দেশোয়ালী বন্ধু মন্তব্য করলেন, "কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, ছোট উদ্যমের ব্যর্থতার সংখ্যাও বেশি। প্রতি দশটা উদ্যোগের মধ্যে অন্তত ন'টা প্রথম দু'বছরের মধ্যেই লালাবাতি জ্বালাবে।"

"সে কি দাদা! এসব কথা তো কলকাতার সরকারী ব্যাংকে ধুরন্ধর বেওসাদার সম্বন্ধেই শোনা যায়!"

একজন বললেন, "তফাত একটু অবশ্য আছে। আপনাদের ওখানে ব্যাংকের মাথায় হাত বুলিয়ে টাকাটা নিয়ে ভেগে পড়াটাই হলো প্রধান ব্যবসা। আর এখানে যথাসাধ্য উদ্যমে নতুন কিছু করবার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হওয়া।"

"তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী?" আমার সবিনয় প্রশ্ন। ক'দিনের জন্যে উদ্যমের এই মহাতীর্থে এসে আমি কতটুকুই বা বুঝতে পারি এবং কতটুকুই বা জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারি যা আমার অভাগা দেশের সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে?

প্রযুক্তিবিদ্যায় ডক্টরেট একজন হৃদয়বান মধ্যবয়সী বঙ্গসন্তান আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, "সংক্ষিপ্তসার করলে মোটামুটি এইরকম দাঁড়াচ্ছে—সুবিশাল কলকারখানায় হাজার-হাজার লোকের চাকরির সম্ভাবনা কমছে, যদিও তার অর্থ এই নয় যে এই ধরনের উদ্যমের উৎপাদনশক্তি কমছে। দ্বিতীয়তঃ, ছোট-ছোট উদ্যম এদেশের নাগরিকদের চোখে নতুন সম্মান লাভ করছে। বড়-বড় কোম্পানি ছেড়ে অনেকে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন। তৃতীয়তঃ, ম্যানুফাকচারিং অর্থনীতি থেকে সার্ভিস অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে। তাছাড়া ছেলেদের সঙ্গে বেশ কিছু মেয়েও নতুন ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়ছেন।"

এই শেষোক্ত ব্যাপারটা আমার তেমন জানা ছিল না। এক সুন্দরী বঙ্গললনা বললেন, "এ-দেশে মেয়েদের দুঃখ, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা সমমর্যাদা পান না, যদিও আইন-টাইন তাঁদের পক্ষে করা হচ্ছে। এই ধরুন, কাগজে বেরিয়েছে একজন পুরুষশ্রমিক পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে, তাকে ডিঙিয়ে একজন মহিলাকে

প্রমোশন দেওয়ায় সে মাথা ঠিক রাখতে না-পেরে সেই মহিলার শ্লীলতাহানি করেছে।"

"অ্যাঁ! মহিলামুক্তির মহাতীর্থে একি কথা?"

বঙ্গললনা বললেন, "আপনি মিজ্ মেরি কে অ্যাশ-এর জীবনবৃত্তান্ত নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর পুরনো ফাইল থেকে পড়ে ফেলুন। ইনি একটা ছোট্ট ডাইরেক্ট-মেলিং কোম্পানিতে কাজ করতেন যেখানে তাঁর প্রমোশন প্রতিবারই আটকে যেতো স্রেফ মহিলা বলেই। মনের দুঃখে এবং বিরক্তিতে ১৯৬৩ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই ছোট্ট একটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন—মেরি কে কসমেটিকস্ ইনকরপোরেটেড। এঁর উদ্ভাবনী প্রতিভা হলো দরজায়-দরজায় ফেরি করে প্রসাধনসামগ্রী বিক্রি করা। প্রচণ্ড সফল উদ্যম। বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ এখন প্রায় আটশ কোটি টাকার মতন। অর্থাৎ আমাদের টাটা ইস্পাত কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন!"

সংখ্যাতত্ত্ববিশারদ একজন বঙ্গপুঙ্গবের সংযোজন: "সেলফ-এমপ্লয়েড বা স্বনিয়োজিত মানুষের কথা তো কলকাতাতেও এখন শোনা যাচ্ছে। মার্কিন মুলুকে এরকম লাখ পঞ্চাশেক পুরুষ আছেন, কিন্তু এঁদের সংখ্যা খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে না। অথচ স্বনিয়োজিত মহিলারা দলে ভারী হচ্ছেন দ্রুতবেগে। লাখ পঁচিশেক তো হবেনই। অন্তত এক লাখ নতুন মহিলা ঢুকছেন প্রতি বছর!"

"চমৎকার! মা-লক্ষ্মীদের বাড়-বাড়ন্ত হোক। এই দেখে বঙ্গললনারাও ঝাঁপিয়ে পড়ুন বাণিজ্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। এতে বাংলা উপন্যাস-শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হবে (দুপুরে কে শরৎ চাটুজ্যে—শরদিন্দুর ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করবেন?) কিন্তু ভাল হবে দেশের।"

না, আমি ভারতের গর্ব মাইক্রোবায়োলজির বিশ্ববিদিত অধ্যাপক ডঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তী থেকে বড্ড দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ ওই তো তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে জামাইবাবু স্টাইলে অপেক্ষা করছেন আমার সঙ্গে একটু ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে। ভারতবর্ষ ও বাংলার শিল্পভাবনা সম্পর্কে তাঁরও নিজস্ব চিন্তা রয়েছে।

আমি এবার আনন্দমোহনের দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম, "আপনাকে ছাড়ছি না। অনেক কথা আছে।"

আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা মানেই এক বিশেষ অভিজ্ঞতা।

যে-দেশে আনন্দবাবু বড় হয়েছিলেন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও কোম্পানির পরিচালকদের মধ্যে বিপুল মানসিক ও সামাজিক দূরত্ব। কোম্পানির কর্তাদের ধারণা, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁরা উড়ু-উড়ু

মনের দার্শনিক, নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগাযোগ নেই—এমন কি পাণ্ডিত্যে প্রধান হলেও কাজে-কর্মে তাঁরা কতখানি তৎপর, সে-বিষয়ে তাঁদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ। অপরদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপকদের মনে ব্যবসায়—পরিচালকদের সম্বন্ধে প্রবল অবিশ্বাস। এঁদের নৈতিক মানও অনেকের কাছে সন্দেহজনক। দুই পক্ষের মধ্যে কোনো যোগাযোগ না-থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সাধারণ মানুষের কাজে লাগছে না, আর কলকারখানার লোকরা ছুটছেন জাপান, জার্মানি, আমেরিকার বস্তাপচা উচ্ছিষ্ট প্রযুক্তির সন্ধানে।

সেরা যা প্রযুক্তি, তা বিদেশের কোনো কোম্পানিই ভারতীয় কোম্পানিকে দিতে উৎসাহী নন। এইসব তখনই পাওয়া যায় যখন নতুন কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে বা হতে চলেছে। নতুন-নতুন প্রযুক্তি অবশ্য এখন পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই পুরনো হয়ে যাচ্ছে।

আনন্দবাবুর কাছেই জানলাম, আমেরিকায় এই অবস্থাটা ঠিক উল্টো। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের সঙ্গে কোম্পানি কর্তৃপক্ষদের নিবিড় পরিচয় এবং প্রায়ই ভাবের আদান-প্রদান হয়। অনেকে জানেন না যে আই-বি-এম কোম্পানি এখন বিশ্বজোড়া ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে তার আদিতে ছিল এই কোম্পানির আর্থিক সাহায্যপুষ্ট একটি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রকল্প। আই-বি-এম কোম্পানির দূরদর্শী পরিচালক চেয়েছিলেন এমন একটি যন্ত্র যা শুধু গণনা করবে না, তার স্মৃতিও থাকবে!

বিশ্ববিদ্যালয় ও কোম্পানিদের আত্মিক যোগাযোগের ফলে অধ্যাপকরা হয়ে উঠছেন অনেক বাস্তবসচেতন এবং কোম্পানিরা হয়ে উঠছে জ্ঞাননির্ভর!

আমাদের দেশে কোম্পানিদের সাফল্যের চাবিকাঠি, কি করে কম দামে কিনে বেশি দামে বেচা যায়, কি করে আইন বাঁচিয়ে সরকারী করের বোঝা এড়ানো যায়; কি করে মতলব খাটিয়ে সরকারী অনুদানের সুযোগ-সুবিধে পকেটস্থ করা যায়! তাই বড়-বড় কোম্পানির সবচেয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটি হলেন ট্যাক্স কনসালট্যান্ট অথবা রাজধানীর সরকার সংযোগ-অধিকর্তা। আর-অ্যাণ্ড-ডি অথবা গবেষণা-প্রধানরা এদেশের কোম্পানি কালচারে চতুর্থ অথবা পঞ্চম পর্যায়ে পড়ে আছেন। আর পৃথিবীর সেরা দেশ আমেরিকা বুঝে নিয়েছে ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সাফল্যের সোনার কাঠিটি হলো জ্ঞান—নলেজ, নো হোয়াই, নো হাউ, বৈজ্ঞানিক ইনফরমেশন।

আমি জেনে বিস্মিত হলাম, জগতে শতকরা পাঁচ ভাগ লোকের দেশ ইউ-এস-এ থেকে এই সেদিন পর্যন্ত পৃথিবীর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎপত্তি হচ্ছিল। সম্প্রতি এটি কমে শতকরা পঞ্চাশ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে মার্কিন মুলুকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খরা শুরু হয়েছে। আসলে ওখানে আবিষ্কার সংখ্যা ঠিকই আছে, কিন্তু অন্যদেশে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রচুর বাড়ানো হচ্ছে। এই চেষ্টা বিদেশে আরও বাড়বে এবং পরবর্তী দশ বছরে মার্কিন আবিষ্কারের গুরুত্ব হয়তো শতকরা পঞ্চাশ থেকে শতকরা তেত্রিশে নেমে আসবে।

জাপানীরা নতুন জ্ঞানসঞ্চয়নে কিভাবে উঠে পড়ে লেগেছে তার একটা উদাহরণ পাওয়া গেলো। ১৯৮৪ সালে জাপানী কোম্পানি হিতাচি আমেরিকায় যতগুলি পেটেন্ট নিয়েছে তার সংখ্যা বিখ্যাত আমেরিকান কোম্পানি টেক্সাস ইনসট্রুমেন্ট থেকে চারগুণ বেশি। অমন যে অমন আমেরিকান কোম্পানি জেনারেল মোটরস, ফোর্ড ও ক্রাইসলার—এঁরা তিনজনে মিলে সম্প্রতি যতগুলি আবিষ্কারের পেটেন্ট সংগ্রহ করেছেন একা জাপানী নিশান কোম্পানি তার থেকে অনেক এগিয়ে আছে। জাপানী কোম্পানি ফুজি ফটো ফিলম্‌স বেশি আমেরিকান পেটেন্ট পেয়েছে আমেরিকান ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানি থেকে।

জাপানীরা বিপুল বিক্রমে নতুন-নতুন গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করে চলেছেন এবং সেইসঙ্গে অবিশ্বাস্য প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে মার্কিন মুলুকেও। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বর্ণখনিকে প্রযুক্তিগতভাবে কাজে লাগিয়েই জাপানীরা গত কয়েক দশকে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারা এখন বুঝতে পারছে, আমেরিকার এই অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার অদূর ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত না-ও হতে পারে, তার জন্যে প্রয়োজন হবে তাদের নিজস্ব সাধনা ও সিদ্ধির।

আনন্দবাবু বললেন, "যেসব বিষয়ে এখন বিশ্বের বৈজ্ঞানিকসমাজ বিশেষভাবে উৎসাহী, তার মধ্যে রয়েছে অতি-অগ্রসর ইলেকট্রনিকস্, সেরামিকস, রোবট, বায়োচিপস্, কৃত্রিম বুদ্ধি এবং অবশ্যই বায়োটেকনলজি।"

এতোদিন আমাদের ধারণা ছিল, যে-দেশে যত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেই দেশের তত সমৃদ্ধি। সেই হিসেবে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ হওয়া উচিত ছিল ইন্দোনেশিয়া, যা এখন দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম।

তারপর ধারণা হয়েছিল, যে-দেশে কলকারখানা ও দক্ষ শ্রমিক আছেন তাঁরাই বিজয়ী হবেন—প্রমাণ জাপান, কোরিয়া। আগামী যে যুগ আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো সেখানে জ্ঞান বা ইনফরমেশনই হবে প্রধান জাতীয় সহায়। ওই বস্তুটি থাকলে মূলধন অথবা কাঁচামাল ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অবিশ্বাস্য শক্তির ওপর নির্ভর করেই আমেরিকানরা প্রত্যাশা করছেন, ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে উত্তরোত্তর কর্মী-সংখ্যা কমিয়েও তাঁরা দুনিয়ার নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারবেন। একটা হিসেব এই রকম : ১৯৮৫ সালে শতকরা পঁচিশ ভাগ আমেরিকান কর্মী কলে-কারখানায় ম্যানুফ্যাকচারিং

কাজে নিযুক্ত ছিলেন। একবিংশ শতকের গোড়ায় শতকরা দশভাগ আমেরিকান কর্মী এই কাজ করবেন। এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্পের যোগসূত্র আরও নিবিড় হবে।

ইতিমধ্যেই তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। একটা উদাহরণ হলো কম্পিউটারের জন্যে প্রয়োজনীয় মাইক্রোচিপ। এর নক্সা তৈরি হচ্ছে আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে ক্যালিফোর্নিয়ায়, সেটি যাচ্ছে স্কটল্যাণ্ডে প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্যে, সেই জিনিস পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এশিয়ার সুদূর প্রাচ্যদেশে পরীক্ষা করে জোড়া দেওয়ার জন্যে। এবার সেই মাল ফিরে আসছে আমেরিকায় বিক্রি হওয়ার জন্যে।

বিশ্বের এই বিস্ময়কর ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির সম্ভাবনায় আমরা বাঙালীরা ছিটেফোঁটা কিছু পাবো কিনা এই প্রশ্ন তুলবার আগেই আর একটি বিষয় উঠলো। মার্কিন দেশে এইসব গবেষণা বা প্রতিষ্ঠান তৈরির মূলধন কারা যোগাচ্ছেন, কারা ঝুঁকি নিচ্ছেন ?

আনন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভেনচার ক্যাপিটাল কথাটা নিশ্চয়ই আপনাদের কানে পৌঁছে গিয়েছে ?"

আমরা রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজে নানাবিধ অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কিন্তু জাত-বাঙালী হিসেবে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।

আনন্দবাবুর কথায় মনে হলো, 'উদ্যোগ-মূলধন' কথাটি বোধহয় চললেও চলতে পারে ! নতুন উদ্যোগ সৃষ্টির জন্যে যে অর্থ তার নাম উদ্যোগ-মূলধন।

এই নতুন উদ্যোগে মূলধন খাটাতে উৎসাহ দেবার জন্যে আমেরিকায় নানারকম কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের রোজগার একটু বেশি, তাঁরা তাঁদের আয়ের একটা অংশ এইভাবে বিনিয়োগ করে ট্যাক্স বাঁচাচ্ছেন। অবশ্যই এইসব উদ্যোগে বেশ কিছুটা ঝুঁকি আছে—প্রচেষ্টা সফল না-ও হতে পারে, টাকাটা জলে যেতে পারে, কিন্তু যদি একবার সফল হয়, তখন অবিশ্বাস্য লাভ !

আপনার যদি কোনো উদ্যোগ-স্বপ্ন থাকে তবে এগিয়ে আসুন—টাকার অভাব হবে না। এই ধরনের প্রচেষ্টায় খাটাবার জন্যে রয়েছে অন্তত বারো হাজার মিলিয়ন ডলার—যাকে দিশি টাকায় রূপান্তরিত করতে গেলে আমার অঙ্ক বিদ্যায় হবে না ! অবিশ্বাস্য সাফল্যের কথা শুনতে চান ?

মিচেল কাপোর—বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। আগে রেডিওতে অনুরোধের আসরমার্কা একটা প্রোগ্রাম চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারপর কিছুদিন মহেশ যোগী উদ্ভাবিত ট্রান্সেনডেন্টাল মেডিটেশন-এর শিক্ষক। এখন কোটি-কোটি ডলারের লোটাস ডেভলেপমেন্ট কর্পোরেশনের মালিক।

বড়-বড় কোম্পানি বেশ বিপদে পড়েছেন। তাঁরা দেখছেন মোটা মাইনেতে

সেরা ম্যানেজার নিয়োগ করলেও ম্যানেজাররা কিছুদিনের মধ্যে হাজার রকম নিয়মকানুনের ফাঁসে জড়িয়ে নিজেদের সেই কল্পনাশক্তি ও উদ্যম হারিয়ে ফেলছেন যা ছিল এইসব কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতাদের প্রধান মূলধন। এঁরা অনেকে এখন তাই ম্যানেজারদের উৎসাহ দিচ্ছেন—কোম্পানির অর্থসাহায্যে নতুন কোনো উদ্যোগ সৃষ্টি করুন। কেউ-কেউ আবার ছোট-ছোট গবেষণাকেন্দ্রিক উদ্যোগে শেয়ার কিনছেন যাতে একদিন ছোট জায়গায় বড় কিছু আবিষ্কার হলে তার কিছুটা সুবিধে পাওয়া যায়।

আনন্দমোহন বললেন, "ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি আমেরিকায় এসে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম। ঠিক ছিল এক ঘন্টা থাকবেন। কিন্তু ব্যাপারটা এমন জমে উঠলো যে শেষ পর্যন্ত তিনি দু'ঘন্টা ধরে আলোচনা করলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে বেশ অবহিত—ভারতবর্ষ যেখানে রয়েছে সেখানে থাকতে হলেই যে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে তা তিনি বোঝেন। তিনি জানেন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে জোর কদমে আমাদের এগোতে হবে। সরকারী লাল ফিতের বন্ধনই যে অনগ্রসরতার একটা কারণ, তা তিনি অবশ্যই বুঝতে পারেন। এই বাঁধন খানিকটা ঢিলে করলে অগ্রগতি অনিবার্য।"

এরপর আনন্দ চক্রবর্তী দিল্লিতেও সরকারী নিমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং এইসব যোগাযোগ থেকেই সৃষ্টি হলো ভারতের বিশেষ ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনলজি। উদ্দেশ্য একটাই, ভারতবর্ষও বায়োটেকনলজির ক্ষেত্রে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করুক এবং তার থেকে নতুন শিল্প সম্ভাবনা গড়ে উঠুক।

"গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগও সন্ধান করছি।" আনন্দমোহন বললেন, "এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হোক যেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও গবেষণায় এগিয়ে চলুন এবং প্রয়োজনে অন্য দেশ তার সুবিধে নিক।"

"এদেশের কোম্পানিদের কিভাবে এই কাজে জড়ানো যায় তা আমরা ভেবে দেখছি", আনন্দবাবু বললেন এবং সেই সঙ্গে দুঃখ করলেন, "ইন্ডিয়ান কোম্পানিরা বিদেশ থেকে প্রযুক্তি কিনে চটপট প্রফিট ঘরে তুলতেই ব্যস্ত, গবেষণায় তাঁদের মন নেই। অথচ মার্কিন মুলুকে সব কোম্পানির একটা সুদূরপ্রসারী স্ট্রাটেজিক প্লানিং আছে। ভবিষ্যতে শিল্পের রূপরেখা কি হবে তা আন্দাজ করে লাভের পাঁচ অথবা দশ শতাংশ এমন সব গবেষণায় ব্যয় করেন, যার সঙ্গে হয়তো বর্তমান ব্যবসার কোনো সম্পর্কই নেই।"

"বিজ্ঞান ও ব্যবসায় বুদ্ধির মিলন হলে কী হয়, তা শুনুন এবারে," বললেন আনন্দমোহন চক্রবর্তী।

"এই তো মাত্র সেদিনের কথা—১৯৭৮ সাল। হার্বার্ট বয়ার, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রির অধ্যাপক। তিনি বায়োটেকনলজির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও এ-বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা করলেন। খবরের কাগজে সেই বক্তৃতার রিপোর্ট পড়লেন রবার্ট সোয়ানসন নামে এক ছোকরা। রিপোর্ট পড়েই তিনি বয়ারকে লিখলেন, 'আমি সম্প্রতি বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এম-আই-টি) থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিসট্রেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছি, আমি আপনার সঙ্গে কুড়ি মিনিটের জন্যে দেখা করতে চাই'।

হার্বার্ট লিখলেন, 'আপনি আসতে পারেন, তবে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না'।

"কিন্তু আসল সাক্ষাৎকার চললো দু'ঘন্টা ধরে। রবার্ট সোয়ানসন জানতে চাইলেন, গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা বয়ার কিভাবে সংগ্রহ করবেন? বয়ার জানালেন, তাঁকে সরকার অথবা কোনো খয়রাতি ফাউণ্ডেশনের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে হয়। রবার্ট সোয়ানসন বললেন, 'আমার চাকরিবাকরিতে মন নেই। আমি নতুন কোনো উদ্যমে নিযুক্ত হবার উত্তেজনা খুঁজছি। আসুন না আমরা দু'জনে হাত মেলাই। আপনি আপনার পরবর্তী গবেষণার জন্য কারও কাছে হাত পাতবেন না। আপনার আমার কোম্পানিই এই টাকা দেবে। আসুন আমরা দুজনে হাজার পঞ্চাশেক ডলার ঢেলে একটা কোম্পানি স্টার্ট করি—নাম হোক জেনেনটেক। আমি এখনই পাঁচ হাজার ডলার ঢালছি। আপনি হবেন এই কোম্পানির গবেষণা সংক্রান্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আমি হবো বিক্রি এবং ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট'।

"তারপরে যা ঘটেছে তা এখন উপন্যাসের থেকেও অভিনব। জেনেনটেক ইনকরপোরেটেড বায়োটেকনলজির ব্যবহার ঘটিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন ডায়াবিটিসের পক্ষে অপরিহার্য ইনসুলিন এবং হিউম্যান গ্রোর্থ হর্মোন বিষয়ে।"

ইনসুলিনের ব্যাপারে আনন্দবাবু যা বলেছিলেন তা আমি ঠিক মতন লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলাম কিনা সন্দেহ। আমার ভুল হতে পারে। তবে যা মাথায় ঢুকেছিল তা এই রকম—ইনসুলিন সংগ্রহ করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত কষাইখানায় পশুশরীর থেকে। এই ইনসুলিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম, এবং পৃথিবীতে ডায়াবিটিস রোগীদের বিরাট চাহিদা মেটানো ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই লাইনে বিখ্যাত কোম্পানির নাম—আমেরিকার এলি লিলি।

জেনেনটেকের গবেষণা হলো টিসু কালচার সংক্রান্ত। যার ফলে ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে পশু শরীরে এই ইনসুলিনের উৎপাদন অবিশ্বাস্য হারে

বেড়ে যাবে, যা স্বাভাবিকভাবে জিন তৈরি করতে প্রস্তুত নয়। জিন ও ব্যাকটিরিয়ার কিছু একটা বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ ঘটিয়ে এমন একটা ব্যাপার ঘটলো যে ইনসুলিন উৎপাদন অনেক সহজ হয়ে উঠলো।

এই বিদ্যা দিয়ে জেনেনটেক নিজে নতুন কারখানা খুললো না, তারা এলি লিলি কোম্পানির সঙ্গেই একটা ব্যবস্থা করে ফেললো। তার পরের ব্যাপারটা আরও চমকপ্রদ। সেই পঞ্চাশ হাজার ডলারের জেনেনটেক কোম্পানির দাম এখন কয়েকশ কোটি টাকা। এঁরা দ্রুতগতিতে আরও কিছু ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং পৃথিবীর বিখ্যাত-বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানি এই গবেষণা-কোম্পানিতে কিছু শেয়ার নেবার জন্যে ব্যাকুল। সোয়ানসন ও বয়ার পাঁচ-ছ বছরে কয়েক শ কোটি টাকার মালিক হয়েছেন বায়োটেকনলজির মাহাত্ম্যে।

দেশে ফিরে এসে জেনেনটেক ইনকরপোরেটেড সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করছিলাম। এতো বিরাট সাফল্য, কিন্তু মার্কিন ডাইরেক্টরি দেখলে বোঝে কার সাধ্য ! কোম্পানির ঠিকানা চারশ ষাট পয়েন্ট স্যান ব্রুনো বুলেভার্ড, স্যানফ্রানসিসকো। প্রেসিডেন্ট : রবার্ট এ সোয়ানসন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট : হার্বার্ট ডি বয়ার। বিক্রি : ৩২.৬ মিলিয়ন ডলার। কর্মী সংখ্যা ৫০০। প্রোডাক্ট : ওষুধ, ইনডাসট্রিয়াল কেমিক্যালস ও কৃষি সংক্রান্ত জিনিসপত্তর !

আমার অনুরোধে আনন্দমোহন বায়োটেকনলজির বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এর ফলে নতুন-নতুন ওষুধ আবিষ্কার হবে অনেক কম খরচে যা মানুষ ও পশুদের কাজে লাগবে। তারপর ধরুন নতুন-নতুন ভ্যাকসিন। এর অসীম সম্ভাবনা।

গ্রোথ হরমোনটা কি জানতে চাইলে আনন্দমোহন বললেন, "ধরুন, কয়েক ফোঁটা হরমোন ঢোকালে ছাগল এবং মুরগির সাইজ হয়তো বিরাট হবে। যে ছাগল বড় হতে দু'বছর লাগতো তা ছ'মাসে প্রমাণ সাইজের হবে, ফলে গ্রাম্য চাষীদের রোজগার শতগুণ বেড়ে যেতে পারে এবং সাধারণ মানুষের উপকার হবে। কিংবা ধরুন, গোরুর দুধ দশগুণ বেড়ে যাবে। বাউনের সেই গোরুর কথা আমরা তো শুনেছি, যা খাবে কম অথচ দুধ দেবে বেশি ; তা হয়তো এই বায়োটেকনলজির দ্বারাই সম্ভব হবে।"

"আর কৃষিক্ষেত্রে এই বিদ্যার সম্ভাবনা তো প্রায় রোমাঞ্চ জাগায়। ধরুন এমন ধান বা গমের বীজ তৈরি হলো যা খুব কম জলেও বড় হয়ে উঠবে অতি দ্রুত। কিংবা বাতাবি লেবু সাইজের কমলালেবু আপনার বাগানে ফলতে শুরু করলো। বাতাবি লেবু হয়তো হয়ে উঠলো রাক্ষুসে সাইজের কুমড়োর মতন। চলে আসুন আমের ক্ষেত্রে। দশেরি আম ছোট বলে আর কোনো দুঃখ

আপনাদের থাকবে না—সাইজ দশগুণ বেড়ে উঠলো। তারপর টম্যাটোর স্বাদে ভরা পটাটো তৈরি করতে পারেন, নাম দিন পোটোম্যাটো। অর্থাৎ প্রকৃতি তখন মানুষের হাতের মুঠোয়। ছোটবেলায় দেখেছেন, মাঠে একবার ধান হয়, এখন সাঁইথিয়ায় তে-ফলা ধানের দেখা পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে হয়তো দেখলেন, এমন ধান হচ্ছে যা দু'সপ্তাহেই প্রমাণ সাইজের হয়ে উঠেছে।"

"তারপর ধরুন সুরাসার ইনডাসট্রিয়াল অ্যালকোহল। ঝটপট আট-দশগুণ উৎপাদন বাড়িয়ে ফেলা কিছুদিনের মধ্যেই অসম্ভব থাকবে না। যদি আমরা মন দিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাই। আমরা এই বিদ্যা বীট চিনি বা আখের ক্ষেত্রে লাগাতে পারি। নারকোল তেল, সরষের তেল, পাম অয়েলের ক্ষেত্রেও এই বিপ্লব আনা যেতে পারে। তবে ভারতবর্ষ যদি নিজে গবেষণায় না ঢোকে তা হলে পরের দয়ার ওপর থাকতে হবে, এই সব বিদ্যা সংগ্রহ করার জন্যে কোটি-কোটি টাকা রয়ালটি গুণতে হবে। একটা মস্ত সুবিধে, ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অভাব নেই—তাদের শুধু একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে এনে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক কাজে লাগাতে হবে।"

যা শুনতে খুব ভাল লাগলো, কেন্দ্রীয় সরকার এ-বিষয়ে প্রচন্ড আগ্রহী। এইসব গবেষণা চালানোর জন্যে হাজার-হাজার একর জমি জুড়ে কোটি-কোটি টাকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। এবং অনাবাসী ভারতীয়রাও এই উদ্যোগে টাকা ঢালতে রাজি। ইতিমধ্যেই কিছু-কিছু ভারতীয় কোম্পানিও আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তবে দুঃখের কথা এই যে কিছুদিন আগে এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করতে যাঁরা বিদেশে গিয়েছিলেন তার মধ্যে কোনও কলকাতার কোম্পানি ছিল না।

"অথচ প্রচন্ড সম্ভাবনা আছে কলকাতার।" দুঃখ করলেন আনন্দমোহন, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ভীষণ পিছিয়ে যাচ্ছে, শংকরবাবু। নতুন ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের কোনো ভূমিকাই নেই। অথচ পঁচিশ বছর আগে কিন্তু এমন ছিল না।"

অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের নির্বিরোধী মানুষ এই আনন্দমোহন। কম কথারও মানুষ বটে। তবুও একসময় বললেন, "গত পনেরো বছরে সর্বভারতীয় সম্মানের ক'জন বৈজ্ঞানিক আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরিয়েছে?"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন আনন্দমোহন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, "এর কারণ কী? কোনো নেতা বা কোনো রাজনৈতিক দলই তো বিজ্ঞানীদের বলেননি, আপনারা বিজ্ঞান সাধনাকে শিকেয় তুলে পলিটিকস করুন।"

উত্তর দিতে চাইছেন না আনন্দমোহন। কিন্তু আমি ছাড়বো না। মুখ না তুলে শান্তভাবে তিনি বললেন, "এখনকার বিজ্ঞানীরা বোধ হয় একটু উদ্যমহীন,

নিজেদের এগজার্ট করেন না। বিনা সংগ্রামে পরাজয় স্বীকারের মনোভাব বড্ড বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।"

আমি তাকাচ্ছি আনন্দমোহনের মুখের দিকে। তিনি বললেন, "কাগজে পড়ি কলকাতা 'ডাইং সিটি'। কলকাতার প্রাণশক্তি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলেই আমার বিশ্বাস। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে আমি মাঝে-মাঝে যাই, মানুষের সঙ্গে কথা বলি। যা আমাদের অভাব তা হলো 'গাট্স্', তেজের, সাহসের, সংকল্পের!"

তবে নিরাশ হতে রাজি নন সেন্ট জেভিয়ার-এর প্রাক্তন ছাত্র আনন্দমোহন চক্রবর্তী। "আমি শুনছি, নতুন এক প্রজন্মের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যারা কর্মযজ্ঞে নামতে চায়। আমি এবং বিদেশের অনেকেই তাদের সাহায্য করতে চাই। একটা জিনিস দেশের লোকদের দয়া করে বলবেন, ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রগতির যে-চেষ্টা সম্প্রতি শুরু হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের কোনো ভূমিকাই থাকবে না, যদি না এখনই আমরা সকলেই সজাগ হই। বায়োটেকনলজির বিপ্লব কলকাতাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। আমার কিছু আমেরিকান বন্ধু আছেন, যাঁরা সামান্য টেকনলজি দিতে অরাজি হবেন না, অনাবাসী বাঙালীরা যোগ্য আধার পেলে কিছু টাকাও ঢালতে পারেন।"

আবার সেই দুঃখের সুর, "গত কুড়ি বছর ধরে ভারতের বিজ্ঞানতীর্থ কলকাতা পিছিয়ে চলেছে তো চলেছেই। আমি যখন আগামী দশকের কথা ভাবি তখন দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। তবে আপনাকে যা বলছিলাম, শুধু সমালোচনা করে কি হবে? নতুন পথ খুলতে হবে। সাফল্য একবার এলে তার নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ আরও সাফল্যের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে। এই ভাবেই তো আমেরিকা তার সাফল্যের স্বর্ণসৌধ গড়ে তুলেছে।"

আনন্দমোহন বললেন, "বিদেশে অনেকদিন থেকে একটা সারসত্য বুঝেছি, কাজে ভয় করলে চলবে না, সুযোগ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তবে শুধু উৎসাহ থাকলেই কাজে সফল হওয়া যায় না। সেইসঙ্গে চাই কর্মশক্তি, সহ্যশক্তি, মগজ এবং 'মোটিভেশন'। এই শেষকথাটার বাংলা আমার জানা নেই। এমন এক প্রবর্তনা যা মানুষকে অসম্ভবকে সম্ভব করার সাধনায় অনুপ্রাণিত করে।"

অন্য কেউ হলে কথাগুলো হয়তো লেকচারের মতন শোনাতো। কিন্তু আনন্দমোহনের অভাবনীয় সাফল্য আমাদের যুবক সমাজের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে। আমি জানি, এই যুবকটি একদিন মাত্র আট ডলার পকেটে নিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরের অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং নিজের সাধনায় সরস্বতীর মানসপুত্র হিসেবে এখন বিদেশীদের প্রীতি ও সম্মান

লাভ করেছেন।

শেষ পর্যায়ে আমি নতুন দেশ আমেরিকা সম্বন্ধে দু'একটি প্রশ্ন করার লোভ সংবরণ করতে পারিনি।

কম কথার মানুষ আনন্দমোহন একটু ভাবলেন। তারপর বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় বক্তব্য একটু না ফেনিয়ে বললেন, "ভীষণ প্রতিযোগিতার দেশ এই আমেরিকা। তবে কাজে ভয় না পেলে যথেষ্ট সুযোগ আছে এখানে। আপনি যতটা সফল হতে চান ততটাই হতে পারেন যদি মদত জোগাতে পারেন।"

"মার্কিনী সভ্যতার শক্তিগুলো যদি একটু দেখিয়ে দেন"—আমার সবিনয় নিবেদন সাঁইথিয়ার ছেলে এবং কলকাতার জামাইবাবু আনন্দমোহনের কাছে।

আনন্দমোহন এবার কোনো চিন্তাই করলেন না। "লিখে নিন, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় এই সভ্যতায় সত্যিই সম্ভব। এ-বিষয়ে কোনো বুজরুকি নেই। যদি কারও কোনো যোগ্যতা থাকে আমেরিকা তাকে সুযোগ দেবে। তবে বড্ড কঠিন প্রতিযোগিতা, দুনিয়ার সব জায়গা থেকে মানুষ এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হয়েছে ভাগ্যলক্ষ্মীর জয়মাল্য নিতে। যারা এখানকার লোক তাদের পক্ষেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ কঠিন। কিন্তু অতি-নিন্দুকেরও স্বীকার করতে হবে, বিশেষ কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই, যে ইচ্ছে করবে সে-ই রণক্ষেত্রে নেমে পড়তে পারে, যখন খুশি।"

"তারপর ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

আনন্দমোহন বললেন, "যে-কোনো বিষয়ে যারা নতুন পথের ইঙ্গিত দিতে পারে তাদের মাথায় করে রাখে এই দেশের মানুষ।"

দু'একটা দুর্বলতারও সন্ধান করছি আমি, আনন্দমোহন বুঝলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, "প্রচন্ড প্রতিযোগিতাই এ-সমাজের প্রধান দুর্বলতা। প্রত্যেকেই কখন হেরে যাবো এই দুশ্চিন্তায় সারাক্ষণ মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে। অনিশ্চয়তার এই পীড়ন বা চাপের ফলে সমাজকে অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে। সামাজিক ও পারিবারিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা আপনার নজর এড়াবে না।"

একটু ভাবলেন আনন্দমোহন। বললেন, "এর একটা কারণ বোধহয় মানুষের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা বা স্বাধীনতা। সবাই জানে, যা হয় একটা কিছু করে বেঁচে থাকা যাবে, না খেয়ে মরবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অর্থনীতিই বোধহয় সব দেশে পারিবারিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের দেশের ছেলেরা জানে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, কিন্তু আমেরিকায় তা নয়।

যে-শক্তি পরিবারকে একসূত্রে গেঁথে রাখে তা আমেরিকায় দুর্বল, সামাজিক ভিত্তিটাও বোধহয় কিছুটা দুর্বল। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ জানি না, তবে এইটাই সত্যি।"

আনন্দমোহনের শেষ কথাটি আমার অনেকদিন মনে থাকবে। খেয়ালের বশে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং প্রবল ব্যক্তিস্বাধীনতা দুটো মিলিয়েই বোধহয় এমন বিচিত্র সমাজ তৈরি হয়।"

ক্লিভল্যান্ডে সম্মেলনের দিনগুলো বড় আনন্দে কেটেছিল। বাঙালীর মানসিক সজীবতার সঙ্গে আমেরিকান কর্মদক্ষতার মিলনে সবরকম ব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল অতি চমৎকার।

বাঙালী পুরুষ ও বাঙালী মহিলা মুখে হাসি ফুটিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে চলছে আড্ডা। অথচ সব কিছু আয়োজন চলছে ঘড়ির কাঁটার মতন। কত দূর দূর অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন সপরিবারে, তাঁদের অসুবিধেও অনেক। কিন্তু সবাই হাসিমুখে সব রকম কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছেন। সারাজীবনে কম সভা-সমিতিতে যাইনি, কিন্তু ক্লিভল্যান্ডের মতন এমন চমৎকার ব্যবস্থাপনা কোথাও দেখিনি।

কর্মকর্তাদের আর একটা মজার দিক হলো, এতো বড় সম্মেলনের আয়োজনের দায়িত্ব ছাড়াও প্রত্যেক পরিবারেই বেশ কয়েকজন দূরের অতিথি এসেছেন, এবং তাঁদের সকলকে নিয়ে সারাক্ষণ নরক গুলজার হচ্ছে! ব্যাচেলর রণজিৎ দত্ত তো দশভুজ হয়ে উঠেছেন—তাঁর বাড়ি এখন হাউস ফুল—অথচ সবকিছু সাংসারিক দায়িত্ব তাঁর। একটি ঠিকে কাজের লোক সপ্তাহে দু'বার ঘন্টাখানেকের জন্যে আসেন। কিন্তু রণজিৎ দত্তর ছবির মতন সাজানো সংসার দেখলে কে বলবে তাঁর গৃহিণী নেই, রাঁধুনি নেই, চাকর নেই?

কাজেকর্মে কষ্ট আছে, কিন্তু হাতের গোড়ায় দেশের মানুষ পেলে বিদেশের বাঙালীরা সব দুঃখ ভুলে কিছুক্ষণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। যে-সব পরিবার বাইরে থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রয়েছেন, প্রসন্নহৃদয় রণজিৎ তাঁদের স্ত্রীদেরও বলছেন, "আমার বউ নেই কিন্তু বাড়িতে সাজগোজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ আয়না আছে। সুতরাং চলো সব ওখানে সন্ধ্যার আসরে হাজির হবার আগে।" এর অর্থ রণজিৎবাবু অগণিত মানুষকে চায়ের নামে ভূরিভোজনে আপ্যায়ন করবেন—বাড়িটা সব অর্থে আনন্দভবন হয়ে উঠবে।

ডঃ দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যও এই আড্ডায় উপস্থিত হয়েছেন। এঁর মেজাজটি অনেকটা মুজতবা আলীর রচনার মতন—সুযোগ পেলেই একটু ইয়ারকি ফচকেমি করে নেন।

আনন্দমোহনের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনার কয়েকটি পয়েন্ট আমি রণজিৎ-গৃহের ড্রইংরুমে বসে টুকে নিচ্ছিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দিব্যেন্দু বললেন, "আরে মশাই লেখা তো সারাজীবন আছে, ক্লিভল্যান্ডের এই আড্ডা তো আর আগামীকাল থাকবে না।"

"বেচারা ঢেঁকি! তাকে স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হয়।" আমাকে সমর্থন করলেন রণজিৎবাবু।

আনন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে যে-বিষয়ে কথা হচ্ছিল তা দিব্যেন্দু কিছুটা শুনেছেন। দিব্যেন্দুর রসিকতা, "সায়েবদের জয়যাত্রা মন খারাপ করে দেয়, কিন্তু মাঝে-মাঝে তেড়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিছুদিন আগে কোথায় যেন একটা লেখা পড়েছিলাম, প্রধান চরিত্রের নাম মিস্টার মানকেলো—তাকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল!"

এবার জানাতে বাধ্য হলাম মানকেলো সায়েবের ঘটনাটা আমিই লিখেছিলাম—গতবারের মার্কিন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে।

হৈ-হৈ করে উঠলেন দিব্যেন্দুবাবু। বললেন, "লেখাটা এখানে অনেকের প্রিয়—মুখে-মুখে প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজে খুব রটে গিয়েছে।"

দিব্যেন্দু ছাড়েননি। লেখাটা আমাকে পড়তে বাধ্য করেছিলেন। মানকেলো সায়েবের এই বৃত্তান্ত কোনো বইতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাঁর ব্যাপারটা জেনে রাখা প্রয়োজন ভেবেই এখানে দেওয়া হলো।

মাখনদার চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়েই বুঝলাম, উনি ভীষণ ইনসালটেড ফিল করছেন। বিদেশে অমন ঠান্ডা পরিবেশেও তাঁর চোখ দুটো ইলেকট্রিক হিটারের ইগনিশন কয়েলের মতো লাল হয়ে উঠেছে।

আমরা দুজনেই মিস্টার মানকেলোর কার্পেটে-মোড়া ঘরে ফুলের মতন নরম ফোম-রবারের গদিতে বসে আছি। কোনোরকম শারীরিক কষ্ট হবার কথা নয়। তবু মাখনদা বাংলায় আমাকে জানালেন, "খুব অস্বস্তি বোধ করছি, শংকর। মনে হচ্ছে যেন শর-শয্যায় বসিয়ে রেখেছে আমাকে।"

মাখনদার মেজাজ এবং মুখচোখ দেখে আমিও বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। একেই আমি নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ—তার ওপর পাকে-চক্রে এসে পড়েছি এই ফরেন কানট্রিতে। আমি কোনোরকমে ইডিয়মেটিক বাংলায় হাওড়া-শিবপুরের ইনটোনেশন দিয়ে মাখনদাকে অনুরোধ জানালাম—ধৈর্য

ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক! বিখ্যাত এই কোটেশনটা হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তাঁর কোনোদিনই ভুলবার কথা নয়।

কিন্তু অমন দেশাত্মবোধক উষ্ণ উদ্ধৃতিতেও কাজ হলো না। প্রত্যুত্তরে মাখনদা আমাদের ইস্কুলের আর একখানা বিখ্যাত উদ্ধৃতি ছাড়লেন, "ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ!" তারপরেই মাখনদার বিপদ সংকেত, "শংকর, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছে—আমার মেজাজের ব্রেক এবার নিশ্চয় ফেল করবে। তুই আমাকে ক্ষমা করিস। মনে হচ্ছে আমি তলিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু আর নিচে নামতে আমি রাজি নই।"

মাখনদার কথাতেই বুঝেছি, ক্রাইসিস পয়েন্টে পৌঁছতে আর দেরি নেই। ধৈর্যের বাঁধ বিপন্ন, বন্যা যে-কোনো সময় বিপদসীমা অতিক্রম করবে।

ক্রাইসিসটা কী? কোথায়? কেন? এবং মানকেলো সায়েবটিই বা কে?

কি করে বিদেশে দৈবের বশে আমি এই গোলমালে জড়িয়ে পড়লাম তা অবশ্যই আপনাদের কাছে নিবেদন করতে হবে। কিন্তু তার আগে মাখনদার পরিচয়টা আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখতে চাই।

মাখনদা মানে মাখনলাল পাঁজা। স্বদেশ থেকে সতেরো হাজার সাতশ সাতাশ মাইল দূরে এই শহরে মাখনদার সঙ্গে যে আমার পুনর্মিলন হবে তা আমাদের ইস্কুলের মহাকবি গৌরমোহন দাস পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেননি।

মাখনদার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা হাওড়া ওলাবিবিতলা লেনের মুখে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যখন বলছেন, "ও লর্ড, কেন তুমি এই ইন্ডিয়া সৃষ্টি করেছিলে? নরক বলে তো একটা জায়গা তোমার আন্ডারে ছিল, তাতেও মন পোষালো না?"

"কী এমন ব্যাপার হলো মাখনদা? অমন দাপাদাপি করছেন কেন?" আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"যারা নরকেও থাকবার যোগ্য নয়, সেইসব পাপীকে শাস্তি দেবার জন্যই তো ইন্ডিয়া এবং স্পেশালি এই হাওড়া শহর তৈরি হয়েছে।" এই বলে মাখনদা নাকের ওপর রুমালটা আরও জোরে চেপে ধরেছিলেন।

"রসিকতা করিস না, শংকর। সব জিনিসের ইয়ে একটা সীমা আছে," মাখনদা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "তুই এখনও ফিক-ফিক করে হাসছিস?"

"কী হলো আপনার মাখনদা?" ইস্কুলের সিনিয়র ছাত্রদের আমরা 'দাদা' ও 'আপনি' বলতে ট্রেনিং পেয়েছি। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দেখানোর অনেক সুবিধে—বাসে দাদারা কেউ থাকলে টিকিট কাটতে হয় না।

মাখনদা এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুই কী ওই পচা কাঁঠালের ভুতুড়িটা

দেখতে পাচ্ছিস না? তোর নাকের কি কোনো সিরিয়াস অসুখ করেছে?"

নাক তুলে কথা বলায় আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যাকে বলে কিনা অকৃত্রিম হাওড়া নাগরিক, আমাদের নাকের সহ্যশক্তি অনেক। রাস্তা, বাড়ির বারান্দা এসব তো ময়লা ফেলার জায়গা বলেই আমরা জানি। এই তো একটু আগেই বুড়োশিবতলায় মিষ্টির দোকানের সামনে একটা মরা বেড়ালকে পচতে দেখে এলাম। কই আমার তো মেজাজ খারাপ হলো না? সেখানে কেমন খোশ মেজাজে যুবকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা গল্পগুজব চলছে, কেউ তো ব্যস্ত হচ্ছে না। আর সামান্য একটা কাঁঠালের ভুতুড়ি—যার ওপর মাত্র ডজন পাঁচেক নীলরঙের মাছি নট নড়ন-চড়ন হয়ে বসে আছে, সেই দেখে মাখনদার এমন বদমেজাজ!

"আমেরিকা হলে এতোক্ষণে কী হতো জানিস?" মাখনদা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

আমি ইন্ডিয়ান নাগরিক, আমার আমেরিকা-রাশিয়া-চায়নার খবর রাখার কী দরকার? আমি পরের ব্যাপারে অতশত মাথা ঘামাই না।

মাখনদা বললেন, "এতোক্ষণে হৈ-হৈ পড়ে যেতো। অন্ততঃ দেড়শ টেলিফোন কল চলে যেতো আমেরিকান মিউনিসিপ্যালিটিতে। পুলিস এসে গ্রেপ্তার করতো যে এই কাঁঠাল ফেলেছে তাকে—কাঁঠাল খাও আর কাঁঠালের ফোঁড় গনো না।"

আমি তখনও অতশত বুঝি না। আমি বলেছিলাম, "আমেরিকা কী এখনও ব্রিটিশ শাসনে রয়েছে?"

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন মাখনদা। "এর সঙ্গে স্বাধীনতা পরাধীনতার সম্পর্ক কী? তুই ওয়ার অফ ইনডিপেনডেন্সের চ্যাপটার পড়িসনি? কোন দুঃখে ইউ-এস-এ ব্রিটিশের দাসত্ব করতে যাবে? বরং উল্টোটাই এখন সত্যি হতে চলেছে।"

আমি নার্ভাস হয়ে বললাম, "এই সব অত্যাচার পরাধীন দেশে ইংরেজরাই চালাতো জানতাম। আমার দেশের রাস্তায় আমার খাওয়া কাঁঠালের ভুতুড়ি ফেলবো তাতে পুলিসের কি? এটা তো আমাদের মৌলিক অধিকার। না-হলে এতো কষ্টে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মেরে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ইংরেজকে কুইট ইন্ডিয়া করিয়ে লাভ কী হলো?"

মাখনদার মাথায় তখন ফরেন ব্যাপারটা গজ-গজ করছে। বললেন, "অনেক পাপ করলে লোকে এই ইন্ডিয়ায় জন্মায়! বিদেশের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হয় না। সভ্য হতে আমাদের আরও দেড় হাজার বছর লেগে যাবে।"

মাখনদাই বলেছিলেন,"ফরেনে লোকে খৈনি টিপতে-টিপতে কানে পৈতে

জড়িয়ে কথায়-কথায় রাস্তার ধারে বসে পড়ে না। ফরেনে আমাদের মতো লোকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া করে না, গায়ে গা ঠেকলে ফরেনের সায়েবরা পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।"

"ফরেনে যে মা-ভগবতীকে কেটে খায়, তার বেলায় ?" আমি পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু মাখনদার সঙ্গে পেরে ওঠাই শক্ত ব্যাপার। তিনি বলেছিলেন, "হিন্দুরা যে কথায়-কথায় মোষ বলি দেয় তার বেলায় ? মোষ আর গোরুতে তফাৎ কি ? কালো রং বলে যত দোষ !"

আমরা মাখনদার কথাবার্তায় বুঝে ফেলেছি, তিনি মনে-মনে বিদেশকে ভালবেসে ফেলেছেন। এই ডার্টি ইন্ডিয়ার প্রায় কিছুই তাঁর পছন্দ নয়।

চলনে-বলনে মাখনদা একেবারে পাকা সায়েব হয়ে উঠেছেন। কি করে টাইয়ের গিঁট বাঁধতে হয়, কোন সময় কোন রঙের জুতো পরতে হয়, কখন থ্যাংক ইউ বলতে হয়, কত সামান্য কারণে চেনা-অচেনা লোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়, কোথায় পকেট থেকে রুমাল বের করতে নেই, কোথায় ঢেকুর তোলা নিষিদ্ধ—এসব তাঁর কণ্ঠস্থ।

মাখনদার সঙ্গে কিছুক্ষণ মিশলেই আমাদের হীনমন্যতা এসে যেতো। মাখনদার গায়ের শার্ট বকের মতো শাদা, ইস্ত্রিবিহীন প্যান্ট পরতে তাকে কেউ দেখেনি। মাখনদার জুতো সব সময় ঝক-ঝক করতো—ইচ্ছে করলেই ওদিকে মুখ রেখে চুল আঁচড়ে নেওয়া যায়। মাখনদার চুলও সব সময় বিন্যস্ত—সব সায়েবী নিপুণতা, কোথাও দিশীলোকদের মতো খুঁত নেই।

মাখনদার আরও গুণ ছিল। তিনি ইংলিশ স্টেটসম্যান ছাড়া কোনো অখাদ্য কাগজ পড়তেন না—ফরেন থেকে বিমান ডাকে তাঁর নামে আরও কী সব ম্যাগাজিন আসতো, তাতে কী সুন্দর-সুন্দর মেমসায়েবদের ছবি থাকতো ! মনে হবে, মেমসায়েব ঠিক যেন আমার দিকেই প্লিজড হয়ে স্পেশাল কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

মাখনদা কোনোদিন ভুলেও হাওড়ার সিনেমায় ঢোকেন নি—তাঁর নিয়মিত গন্তব্য কলকাতার মেট্রো, লাইট-হাউস, এলিট। মাখনদা রেডিও খুলতেন শুধু দুপুরের বিশেষ এক সময়, যখন মনে হয় খোদ বিলেত থেকে সায়েব-মেমদের গান ভেসে আসছে। মাখনদা খাবার ব্যাপারেও ছিলেন পাকা সায়েব। কখনও নগেন পালের কচুরি, হরিধন মোদকের জিলিপি, নানকু সাউয়ের হালুয়া, ক্ষেত্তরের ঘুগনি, হরিদাসের বুলবুলভাজা খেয়ে শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেননি।

মাখনদা বলতেন, "এই পাঁচ আঙুলে ডাল-ঝোল মেখে সাপটে খাওয়া খুবই আন-সায়েন্টিফিক।"

"খাওয়া ইজ খাওয়া। এর সঙ্গে আবার বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক রে বাবা?" আমরা একটু অবাক হয়ে যেতাম।

"বুঝবে একদিন! যখন আজীবন পেটের অসুখে ভুগবে," সাবধান করে দিতেন মাখনদা।

"ওরে বাবা! পেটের ওসুখটা আবার অসুখ নাকি? পেটের অসুখটা তো বলতে গেলে প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্মগত অধিকার! এতে লজ্জার কী, লুকোবারই বা কী?"

মাখনদা বলেছিলেন, "হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারতে আমেরিকা হলে। স্মল পক্সের মতো পেটের অসুখটাও নোটিফায়েবল ডিজিজ—কেউ বারকয়েক বাথরুম করেছে শুনলেই জনস্বাস্থ্য বিভাগে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। কেন এমন হলো? কী খেয়েছিলে, কোথায় খেয়েছিলে? কোন দোকান থেকে খাবার কিনেছিলে? এসবের ফিরিস্তি দিতে-দিতে নাড়ি ছেড়ে দেবার দাখিল হতো।"

এসব কারণেই মাখনদা কাঁটাচামচ ব্যবহার করতেন—কোনো সভ্য দেশেই নাকি আজকাল ডান হাতের ব্যবহার নেই। মাখনদা সেজেগুজে ডিনার টেবিলে বসতেন, পায়ে চটি থাকতো এবং সামনে চীনে মাটির ডিশ সাজানো থাকতো। মাখনদা ভুলেও কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতেন না, তাঁর কোলের ওপর থাকতো দুধের মতো সাদা ন্যাপকিন।

মাখনদার আরও এক সায়েবীআনা ছিল। ডিনারের পরেই টুথব্রাশ ও পেস্ট নিয়ে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়তেন। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, "সকালে উঠে দাঁত-মাজাটা নিতান্তই ভুল—ফরেনে কেউ তা করে না। আর দাঁতে বুরুশ অথবা নিম দাঁতন ঘষতে-ঘষতে পাড়া বেড়িয়ে আসার থেকে বর্বরতা সভ্যসমাজে অকল্পনীয়! দাঁত মাজাটা একটা প্রাইভেট অ্যাফেয়ার—পাবলিককে দেখিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই অপকর্মের অসভ্যতা কবে যে বন্ধ হবে!" মাখনদা নিজের দুঃখ চেপে রাখতে পারতেন না।

মাখনদা যে জেনুইন্ সায়েব এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ইন্ডিয়ায় জন্ম নিয়েছেন এমন সন্দেহ আমার বন্ধুমহলে প্রায়ই প্রকাশ করতাম।

এই মাখনদা যে শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়া ছেড়ে দেবেন তা আমরা আন্দাজ করেছিলাম। মাখনদা যখন সত্যিই কী একটা কাজ নিয়ে দমদম থেকে হাওয়াই জাহাজে উধাও হলেন, তখন কেউ-কেউ মন্তব্য করেছিলেন—ফরেনের জিনিস তো ফরেনে ফিরে যাবেই!

মাখনদার একটা ব্যাপারে আমাদের একটু স্পেশাল উদ্বেগ ছিল। সেটাও ওঁর নাম নিয়ে। পৃথিবীতে সব লোকেরই পোষাকী নামটা ভাল হয় এবং ডাক নামটা একটু নিরেস হয়। মাখনদার ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো, ভাল নাম

মাখনলাল পাঁজা, ডাক নাম সুপ্রতীক। ব্যাপারটার পিছনে ভুল বোঝাবুঝি আছে। মাখনদাকে ইস্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁর মায়ের বাবা সুধাসিন্ধু সামন্ত। সুধাসিন্ধুবাবু ভুল করে আদরের নাতির ডাক-নামটাই ইস্কুলের ফর্মে লিখে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বিপত্তি। যখন ভুলটা জানাজানি হলো তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। কড়া ইস্কুল, নামের রেকর্ড পালটাতে চাইলে না—বললে এফিডেভিট করতে হবে। সে-সব শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠেনি, তাই মিষ্টি নামটাই রয়ে গেলো।

ফরেনে মাখন নামটা কেমনভাবে নেওয়া হবে এ-বিষয়ে আমাদের মনে কিছু উদ্বেগও ছিল। কিন্তু একজন ফচকে ছোকরা বলেছিল, "অত ভাবিস না—বাটারের সঙ্গে ফরেন ব্রেডের চমৎকার মিল হবে।"

এই মাখনদার সঙ্গে যে অনেক বছর পরে বিদেশে আবার দেখা হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারি নি! চান্স পেয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমেরিকায় এসে পড়েছি। ওয়াশিংটনের প্রাথমিক পর্ব চুকিয়ে আমি ছোট এক মার্কিনী শহরের হোটেলে উপস্থিত হয়েছি। মালপত্তর গুছিয়ে সবে একটু বিছানায় ফ্ল্যাট হয়েছি, এমন সময় টেলিফোনে ক্রিং ক্রিং।

"হ্যালো মিস্টার শংকর? স্পিক হিয়ার টু মিস্টার পান্‌জা।"

এ আবার কোন সায়েব? আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম।

ওমা! সায়েব নয়। "হ্যালো শংকর, আমি মাখন বলছি। ভেবেছিলি, লুকিয়ে-লুকিয়ে এই দেশ দেখে চলে যাবি। হলো না তো?"

মাখনদা একটু পরেই হোটেলে এসে হাজির হলেন। বললেন, "লন্ডনে পটলের কাছে টেলিফোনে খবর পেলাম।" পটলদা আমাদের ইস্কুলের আর-এক ছাত্র।

"পটলের সঙ্গে টেলিফোনে মাঝে-মাঝে আড্ডা মারি।" মাখনদা বললেন।

"অ্যাঁ! আটলান্টিকের দু'পাশ থেকে আড্ডা!"

"অনেকেই আড্ডা মারে—ডাইরেকট ডায়ালিং তো! টেলিফোন তুলে পটলের সঙ্গে কথা বললেই হলো। পালং শাকের ঘন্টোর রেসিপিটা জানা ছিল না, তাই লন্ডনে পটলকে ফোন করতে গেলাম। তখনই শুনলাম, তুই লন্ডনে পটলের সঙ্গে দেখা করেছিস এবং এখানে আসছিস।"

সামান্য পালং শাকের ঘন্টোর মশলা জানবার জন্যে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে দূরপাল্লার টেলিফোন! ভাবা যায় না।

আমি ভেবেছিলাম, সায়েব হবার যেটুকু বাকি ছিল তা এদেশে পূরণ করে নিয়েছেন মাখনদা। কিন্তু তিনি কী সুন্দর বাংলায় কথা বললেন। সবচেয়ে

আশ্চর্য, মাখনদার বাংলায় বিশেষ ইংরিজি খাঁদ নেই।

মাখনদা আমাকে হোটেল থেকে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলেন। বললেন, "আমি গোলাপীকে বলে এসেছি। ও তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। গোলাপী তোর বউদি।"

খুব লজ্জা করতে লাগলো। মাখনদার কোনো খোঁজ-খবরই রাখিনি আমি। এর মধ্যে তিনি কতবার দেশে ঘুরে গিয়েছেন, কবে গোলাপীকে বিয়ে করে এনেছেন তা-ও আমার জানা নেই।

নিজের পারিবারিক খবরাখবর জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোন ইয়ারে বিয়ে করলেন মাখনদা?"

মাথা চুলকে তিনি বললেন,"তা ন' বছর হয়ে গেলো। সময় কী ভাবে উড়ে চলে! তুই আমার দুই মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করবি। তোর মেয়ের নাম কী?"

আমি বললাম "জুলি। জুলিয়েট কুরী থেকে অনুপ্রেরণা।"

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। মাখনদা বললেন, "আমার বড়টির নাম কুসুমকুমারী আর ছোটটি বিপত্তারিণী।"

"এ্যাঁ! এই ইউ-এস-এ-তে বসে মেয়ের নাম বিপত্তারিণী! মাখনদা করেছেন কী?"

"কেন? এদেশে কী বিপদ নেই যে বিপত্তারিণীর প্রয়োজন হবে না।" সরল মনে পাল্টা প্রশ্ন করলেন মাখনদা। তারপর বললেন, "তা হলে ওঠা যাক এবার।"

হঠাৎ হোটেলের পাট চুকিয়ে কারও বাড়িতে চলে যাবার অসুবিধে আছে আমার। হোটেল ঠিক করে দিয়েছেন আমার নিমন্ত্রণকর্তা।

"ওদের কাছে কিছু দাসখত লিখে দিসনি যে মাখনদার বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবি না," আমার মনে শক্তি যোগাবার চেষ্টা করলেন তিনি।

দাসখত নেই, কিন্তু অসুবিধা আছে। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কোনো-কোনো শহরে স্থানীয় হোস্টের ব্যবস্থা আছে। মিস্টার মানকেলো এখানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন--তিনিই এখানকার উদ্যোক্তা, তিনি হয়তো কারো সঙ্গে এই হোটেলে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন, সে-সব বানচাল হয়ে যাবে।

"সে-সব দেখা-সাক্ষাৎ আমার বাড়ি থেকেও হতে পারে—আমরা তো পর্দাপ্রথা পালন করি না।" মাখনদা তর্কের পয়েন্ট তুললেন।

অগত্যা সত্যি কথাটা বললাম। "মাখনদা হোটেল ছেড়ে চলে গেলে ইন্ডিয়ার প্রেস্টিজ নষ্ট হয়ে যায়। হোটেল খরচ যাঁরা দিচ্ছেন কোনো বাড়িতে আশ্রয় নিলে তাঁরা ভাবতে পারেন যে দুটো ডলার বাঁচাবার জন্যে ইন্ডিয়ানরা অতিমাত্রায় লালায়িত।"

এবার মন্ত্রবৎ কাজ হলো। দেশের মান-সম্মানের কথা উঠতেই মাখনদা বললেন, "আলবৎ, ভারতবর্ষের মাথা নিচু হয় এমন কোনো কাজ অবশ্যই করবে না। আমি তো ইন্ডিয়া-ইন্ডিয়া করে পাগল হয়ে গেলাম। ইন্ডিয়ার গায়ে হাওয়া লাগলে আমার দেহটা সিরসির করে ওঠে। কত বড় দেশের সন্তান আমরা, আমাদের মূল্য এরা বুঝতে পারছে না আমরা গরীব বলে।"

মাখনদার পরিবর্তন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেশের সমালোচনায় যিনি সব সময় মুখর হয়ে থাকতেন তিনিই এই বিদেশে কট্টর স্বদেশীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

মাখনদা বললেন, "তোকে তো দেশের কথাই বলতে এসেছি। কাজেকর্মে কথাবার্তায় এখানে এমন দাগ রেখে যা যে ওরা যেন বুঝতে পারে ইন্ডিয়াকে কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। এমন কিছু করিস না যাতে ভারতবর্ষ ছোট হয়ে যায়। তোকে ছোট্ট একটা কথা বলে দিই, যদি কারও বাড়ি বাথরুম ব্যবহার করিস বাথটবটা মুছে খটখটে করে তবে বেরিয়ে আসবি। এর যেন কখনও অন্যথা না হয়।"

"কলঘর, সে তো ভিজে থাকবেই, মাখনদা!" আমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়ি।

"সে আমাদের দেশের কলঘর। এখানে কলঘর মানে শুকনো খটখটে! যদি কারও গাড়িতে বেড়াতে বেরোস তাহলে গাড়ির পার্কিং ফি-টা তুই অফার করিস। আর ট্যাকসিওয়ালাদের খুব লিবারেলি বকশিশ দিবি। বকশিশ না পেলেই ব্যাটারা ইন্ডিয়ার নামে যা-তা রিমার্ক পাশ করে।"

মাখনদার দিকে আমি সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। এ কী সেই মাখনদা একসময় যিনি ইন্ডিয়ার কোনো কিছুই দেখতে পারতেন না?

মাখনদা বললেন, "আর একটা কথা, এখানকার কিছু লোকের বড় দম্ভ। গরীব দেশগুলো সম্বন্ধে বেশ নাক উঁচু ভাব। তাঁদের কখনও ছাড়িস না। লম্বা নাক দেখলেই নাকে একটা থাবড়া দিয়ে দিবি। কিছু হাফ-পচা গম ধারে বিক্রি করে শালারা ভেবেছে একটা প্রাচীন মহান দেশের মাথা কিনে নিয়েছে।"

মাখনদার মুখে আনডিপ্লোম্যাটিক শালা কথাটি শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। কিন্তু সে-রাত্রে ডিনার খেতে ওঁর বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম প্রত্যেক আমেরিকানকে শ্যালক সম্বোধনের অধিকার তিনি আইনগতভাবেই অর্জন করেছেন।

মাখনদার ওয়াইফ দরজা খুলে দিলেন। "মিট ইওর গোলাপী বউদি," মাখনদা দিশী কায়দায় বললেন।

গোলাপী নাম, কিন্তু এ তো পুরো মার্কিনী তনয়া! ভাঙা-ভাঙা বাংলায় গোলাপী বউদি বললেন,"আপনি খুব আদরের দেবর, আসুন, আসুন।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে মাখনদা একেবারে দিশী স্টাইলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে লিভিং রুমে হাজির হলেন। মাখনদা বললেন, "তোর বউদির অরিজিন্যাল নাম ছিল রোজী—আমি করে দিলাম গোলাপী। ও অবশ্য খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছে জিনিসটা। আমাদের বড় মেয়ে যখন হলো তখন নামকরণের কোনো অসুবিধা হলো না! গোলাপীর মেয়ে কুসুমকুমারী ছাড়া আর কী?"

ফুটফুটে বালিকা কুসুমকুমারী ইতিমধ্যে ঘরে এসে বসলো। কেমন সুন্দর ভারতীয় প্রথায় কুসুমকুমারী আমাদের প্রণাম করলো! মাখনদা জানালেন, "ওকে আমি দেশের সব ম্যানারস্ শেখাচ্ছি। এয়ারমেলে বাংলা বইয়ের অর্ডারও দিয়েছি।"

গোলাপী বউদি চায়ের সঙ্গে এবার যা এগিয়ে দিলেন তা আমার অকল্পনীয়। খোদ মার্কিন মুলুকে বসে মুড়ি খাচ্ছি!

মাখনদা বললেন, "খা, খা। অনেকে এক্সপেরিমেন্ট করে, বেশ কয়েকশ ডলারের সরঞ্জাম কিনে তোর অনারে এই মুড়ি ভাজার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। পটলকেও লং ডিস্ট্যান্সে দু'বার কনসাল্ট করতে হয়েছে—ওর মাসীমা যে খুব ভালো মুড়ি ভাজতেন!"

আমি মুড়ি চিবোবো কি! আমার মনে পড়ে গেলো, দেশে মাখনদা চিড়েমুড়ি স্পর্শ করতেন না। টোস্ট এবং এগ ছাড়া সকালে অন্য কিছুই খেতেন না।

গোলাপী বউদি এবার নিজেই কাঁসার গেলাসে জল এনে দিলেন। বললেন, 'ইওর দাদার ফেভারিট বেলমেটাল—ইণ্ডিয়া থেকে বাই এয়ারে কয়েক হাজার ডলার খরচ করে পুরো সেট আনিয়েছেন।"

'ইনক্লুডিং ওয়ান পিতলের ঘড়া। এই দেখ না ওয়াটার কুলারের ওপর বসিয়ে রেখেছি। খুব কদর হয়েছে এখানে, কত মেমসায়েব যে দেখতে আসে তুই ভাবতে পারবি না!"

গোলাপী বউদি এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভার্জিন ব্রাটার ড্রয়িং ডিজাইন এবং সিক্রেট ভার্সগুলি তোমার জানা আছে নিশ্চয়?"

আমার তো ধাত ছেড়ে যাবার অবস্থা! "হোয়াট ইজ ব্রাটা?" সে আবার কী জিনিস রে বাবা!

"ব্রত রে। কুমারী ব্রত। কুসুমকুমারীকে দিয়ে ব্রতটা করাবো ঠিক করেছি। ওদের ইস্কুল থেকেও খুব উৎসাহ দেখিয়েছে—অবসকিওর রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস সম্বন্ধে ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখবে। আমি অবশ্য বলেছি রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস, তবে অবসকিওর নয়। ইণ্ডিয়াতে লক্ষ-লক্ষ কুমারী মেয়ে প্রতি বছর নিষ্ঠার সঙ্গে এসব পালন করছে। পটলকে লং ডিস্ট্যান্সে ফোন করলাম, কিন্তু ও হতচ্ছাড়াও কিছু জানে না।"

ড্রয়িং ডিজাইন কিছুই জানা না থাকায় আমি খুব লজ্জা বোধ করলাম।

গোলাপী বউদি বললেন, "আমাদের ছোট মেয়ের নাম বিপ্‌ট্যারিণী।"

"বিপত্তারিণী নামটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারে না, বুঝলি," দুঃখ করলেন মাখনদা। "সবাই ট্যারিনী বলে ডাকে, ভাবে ইটালিয়ান নাম। তুই সাহিত্যিক লোক, এই বিপত্তারিণী ব্যাপারটা ভাল করে ব্যাখ্যা কর তো।"

বিদেশে এ কী বিপদে ফেললে বিপত্তারিণী মা আমার ! তাঁকে স্মরণ করে দুঃসাধ্য কাজটা শুরু করে দিলাম। গোলাপী বউদির সঙ্গে মাখনদাও খুব মন দিয়ে শুনলেন আমার লেকচার। তারপর নিজেই বললেন, "এক কথায় বিপত্তারিণী হলেন কমবাইনড লাইফফায়ার-মেরিন অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্স পলিসি।" আমার দিকে তাকিয়ে এবার মাখনদা বললেন, "তোর বউদির পক্ষে এইটা বোঝা সহজ—ও প্রুডেনসিয়াল ইনসিওরেন্সে কাজ করতো।"

ওয়াণ্ডারফুল ! বিপত্তারিণীর ব্যাখ্যা শুনে মাখনদার স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা খুশী হলেন।

রাতের খাবার সময় আবার বিস্ময়। টেবিল চেয়ারের ধারে-কাছে গেলেন না মাখনদা। মেঝেতে তালপাতার চাটাই বিছিয়ে দিলেন গোলাপী বউদি। বললেন, "আমাদের একটা ডাইনিং টেবিল আছে পাশের ঘরে, 'মাকান' ওটা পছন্দ করে না।"

খাবার আসতেই খালি হাতেই শুরু করলেন মাখনদা। কে বলবে, এই মানুষটাই কাঁটা চামচের গুণগানে আমাদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ করেছিলেন !

"নিজের আঙুল নিজের মুখে পুরে দিলে খাওয়ার টেস্টই পাল্টে যায় ! কিন্তু আমার অফিসে ও-কর্মটি করবার উপায় নেই।" দুঃখ করলেন মাখনদা।

আমি দেখলাম, গোলাপী বউদি ও মেয়ে খাবার থালায় ডান হাত বাঁ হাত দুই লাগিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না। গোলাপী বউদি বললেন, "তোমরা প্রত্যেকটি ইণ্ডিয়ান এক-একটি ম্যাজিশিয়ান। কী করে একটি হাতের পাঁচটি আঙুলে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের হেল্প না নিয়ে তোমরা মাছের কাঁটা ম্যানেজ করো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।"

"জানিস, ব্যাপারটা হাতে-কলমে দেখাবার জন্যে এখানকার টি-ভি সেন্টার আমাকে প্রোগ্রাম দিয়েছিল। আমি বললাম, এর পিছনে পাঁচ হাজার বছরের দক্ষতা এবং জ্ঞান কাজ করছে ! খুব হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছিল প্রোগ্রামটা, বুঝলি, শংকর !" মাখনদা মনের আনন্দে হাত চাটতে-চাটতে বললেন।

রাতে মাখনদা আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে এসে বললেন, "একটাই আমার দুঃখ থেকে গেলো—তোকে পান খাওয়াতে পারলাম না। পান এই শহরে দুষ্প্রাপ্য। দোক্তা আনবার উপায় নেই—কাস্টমসে নারকোটিক বলে

সন্দেহ করে।"

বিছানায় যাবার আগে আমার মনে পড়লো এই মাখনদাই বলেছিলেন, "গভরমেন্টের উচিত আইন করে পান খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। তাতে শুধু দাঁতের এনামেলের নয়, দেশেরও বারোটা বাজছে।"

ভোরবেলায় মাখনদা টেলিফোনে আবার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোর লোকাল গার্জেন কখন আসছেন?"

বললুম, "মিস্টার মানকেলো সাড়ে-আটটা নাগাদ আমাকে তুলে নেবেন।"

"যা ওঁর সঙ্গে কিছুটা ঘুরে আয়। বিকেলে আবার ফোন করবো'খন। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবেই। দেখি তেমন দরকার হলে ওই মানকেলোর পারমিশন নিয়ে নেবো'খন।"

এই পর্যন্ত বেশ ভালই চলেছিল। কিন্তু তারপরেই গণ্ডগোলের শুরু হয়েছিল। গোলমালের পাণ্ডা যে ডেভিড মানকেলো সে কথা বলাই বাহুল্য।

বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা আটান্ন বছরের মিস্টার ডেভিড মানকেলোর। শরীরের কাঠামোখানা দেখবার মতোই, এবং লম্বায় অন্তত ছ' ফুট।

ওই চেহারার সঙ্গে করমর্দন করবার সময়ে একটু সপ্রশংস দৃষ্টিতে মানুষটিকে আর একবার দেখেছি। তখনই মানকেলো সায়েব হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই। স্রেফ প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম। পাঁচ জেনারেশন প্রোটিন না খেতে পারলে এরকম কাঠামো হয় না।"

কথাগুলোর মধ্যে একটু ধাক্কা ছিল। মনে হলো মানকেলো সায়েব আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, "তোমাদের দেশে তোমার বাবা, তোমার ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা কেউ প্রোটিন খেতে পায়নি।"

মানকেলো সায়েব ধরেই নিয়েছেন ইণ্ডিয়ান সব লোক রোগা-রোগা এবং তাদের হাড়গোড়গুলো পাটকাঠির মতো। মানকেলো বললেন, "টি-ভিতে আমি ইণ্ডিয়ান চাষীদের ছবি দেখেছি, আহা ভেরি সিকলি। ওইরকম লিকলিকে চেহারায় তারা গুরুতর পরিশ্রম করবে কী করে? যদি কোনো ইণ্ডিয়ান কাজে ফাঁকি দেয়, চুপচাপ বসে থাকে, তাকে দোষ দিও না। দোষ দিও তার ঠাকুর্দার বাবাকে—প্রোটিন অভাবে চেইন রি-এ্যাকশন!"

মানকেলো সায়েবের মহড়া নিতে পারে এমন তাগড়াই ইণ্ডিয়ান যে হাজার-হাজার আছে একথা বলবার আগেই ভদ্রলোক মুখ খুললেন। "তুমি তো সিটি অফ ক্যালকাটা থেকে আসছো, তুমি তো এই রোগা হাড়ের ব্যাপারটা স্পেশালি জানবে।"

কেন রে বাবা! কলকাতা থেকে এসেছি বলে, ভগ্নস্বাস্থ্য শীর্ণ ভারতীয়দের

সম্বন্ধে আমার বাড়তি জ্ঞান থাকবে কেন ?

মানকেলো হেসে বললেন, "এই যে আমাদের আমেরিকান নেশন এতো বড়ো কেন ?"

মাথা চুলকে উত্তর দিতে গেলাম, "প্রচুর জমিজায়গা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তোমাদের, সেই তুলনায় লোকজন অনেক কম, তাই ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েদেয়েও তোমরা বড়ো হচ্ছো।"

"ওয়ার্লডের বেশীর ভাগ নন-আমেরিকানের এই ধারণা। কিন্তু সেন্ট-পারসেন্ট ভুল। আশা করি, নিজের চোখে তুমি কিছুটা দেখে যাবে।"

আমেরিকার গ্রেটনেসের কারণটা এবার ব্যাখ্যা করলেন কট্টর স্বদেশী মিস্টার ডেভিড মানকেলো। তিনি বললেন, "আমরা বৈজ্ঞানিক পন্থায় চলি। আমরা মতামতে বিশ্বাস করি না, আমরা নির্ভর করি তথ্যের ওপর। কোনো-কোনো দেশ স্রেফ থিওরির ওপর নির্ভর করে পিছিয়ে যাচ্ছে শুনেছি।"

মিস্টার মানকেলো অগাধ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "এই যে রোগারোগা হাড়ের কথা বললাম, এটা মনগড়া মতামত নয় ! তুমিও তো বুঝতে পারছো, আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি না। আমার এক বন্ধুর বায়োলজিক্যাল দোকান আছে—তার কাছেই শুনলাম, তোমাদের ক্যালকাটা খুব বড় এক্সপোর্টার। পৃথিবীর যেখানে যত নরকঙ্কাল দরকার হয় সব ওখান থেকে একচেটিয়া সরবরাহ হয়। বছরে কয়েক শ নরকঙ্কাল নাড়াচাড়া করতে হয় আমার ফ্রেন্ডকে, কিন্তু সব কাঠির মতো রোগা-রোগা ! কলকাতার নাগরিক হিসেবে তুমি তো এ ব্যাপারে আমার থেকে অনেক ভাল জানবে।"

মানকেলো সায়েব আরও বললেন, "যখন টি-ভিতে দেখি কিংবা খবরের কাগজে পড়ি আমাদের দেশ সম্বন্ধে বাইরের লোকেরা বিশেষ কিছু জানে না তখন খুব দুঃখ হয়। শেষ পর্যন্ত এই স্বেচ্ছাসেবার কাজ নিয়েছি। বিদেশ থেকে আসা লোকদের হাত-ধরে আমাদের উন্নতিটা দেখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো কেন ইউ-এস-এ সবদেশের আগে রয়েছে।"

বুঝলাম, এই জন্যেই মিস্টার মানকেলো স্বেচ্ছায় আমার সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সংবাদে আরও বিচলিত হলাম। সায়েব বললেন, "তুমিই প্রথম ভারতীয় যার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হলো। যদিও সত্যি কথা বলতে কি তুমিই প্রথম ভারতীয় নয় যার সঙ্গে আমার দেখা হলো।"

ব্যাপারটা আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। মিস্টার মানকেলো বললেন, "ওই যে কঙ্কাল—আমার ফ্রেন্ডের দোকানে একটা ইন্ডিয়ান স্কেলিটন আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। কলকাতা থেকে জাহাজে পাঠানো।"

আমার সঙ্গে দোকানে কফি পান করে সায়েব নিজেই দাম মেটালেন।

আমাকে কিছুতেই পয়সা বের করবার সুযোগ দিলেন না। বললেন, "আমি তোমাদের দেশের বিদেশীমুদ্রা সমস্যা সম্বন্ধে পড়েছি। প্রতিটি ডলার সযত্নে রক্ষা করা তোমাদের উচিত।"

আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। সায়েব আমাদের দেশ সম্বন্ধে আরও কি কি পড়েছেন তা ভগবান জানেন ! আমি সে-সব কল্পনা করে শিউরে উঠছি।

মানকেলো সায়েব আমাকে বিরাট মোটর গাড়িখানা দেখালেন। বললেন, "আমরা বিগ নেশন, বিগ পিপল, আমাদের মনও বিরাট। তাই বড় মোটর গাড়ি ছাড়া আমাদের চলে না।"

সায়েব আমাকে প্রায় জোর করে গাড়ির পিছনের সীটে ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন, "এর বিশেষত্বটা লক্ষ্য করছো ? শুয়ে পড়ো।"

শুয়ে পড়ে, সায়েবের নির্দেশে পা ছড়িয়ে দিলাম। "এবার বুঝতে পারছো নিশ্চয় !" সায়েবের মুখে একগাল হাসি। "পা ছড়িয়ে দিয়েও জায়গা রয়েছে। এর নাম আমেরিকান অটো ! নিজের গাড়িটাও নিজের বাড়ি, তুমি কেন পা গুটিয়ে শোবে ? হাজার হোক পা তো তোমারই !"

এই বড় গাড়ি সম্বন্ধে আমি একটা গুজব শুনেছিলাম। আমেরিকান মহিলাদের চুলের ক্ষতি হয় বলে হুড-খোলা গাড়ি উঠে গেলো এবং ঘরের বাইরে যুবক-যুবতীদের একান্ত শয্যা-সুখের প্রয়োজন মনে রেখেই বড় গাড়ি সৃষ্টি হলো। কিন্তু মিস্টার মানকেলো আমাকে সে প্রশ্ন তুলবার সময়ই দিলেন না।

পরবর্তী প্রশ্নে তিনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন। "ইণ্ডিয়াতে তুমি কি এখনও বলুক কার্টেই যাতায়াত করো ?"

"গোরুর গাড়িতে ? আমরা !" আমার কান লাল হয়ে উঠলো।

মানকেলো আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। বললেন, "তোমাদের দেশে দেড় কোটির বেশী গোরুর গাড়ি আছে পড়লাম। মজুর খাটবার জন্যে কোটি-কোটি বলদ আছে।" আমার আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করবার জন্যেই মিস্টার মানকেলো এবার অভিনন্দন জানালেন "কনগ্রাচুলেশন। খেটে-খাওয়া বলদের সংখ্যায় তোমরা যে ওয়ার্লডের ফাস্ট তা আমার আগে জানা ছিল না।"

"ছাগলেও তোমরা ফার্স্ট। একসঙ্গে এতো ছাগল-পপুলেশন পৃথিবীতে কোথাও নেই। " মিস্টার মানকেলো এক-একটি খবর ছাড়ছেন, আর আমার স্বদেশী মেজাজ খাট্টা হয়ে উঠছে।

"বাঁদরেও তোমরা ওয়ার্লড লিডার।" শুনিয়ে দিলেন মিস্টার মানকেলো।

সায়েবকে সহজে ছাড়বো না। ওই গোরুর গাড়ির ব্যাপারটা আমাকে

ফয়সালা করতেই হবে।

সায়েবকে বলেই ফেললাম, "আপনার জেনে রাখা ভাল আমি রোজ মোটর গাড়ি চড়ে আপিসে যাই এবং সেই গাড়ি আমার শ্বশুরবাড়ির টাউনে তৈরি হয়।"

বার-বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন মিস্টার মানকেলো। "তুমি বিদেশিনী বিয়ে করেছো তা আমাকে কেউ বলেনি। তোমার ওয়াইফ ইংলিশ, ইটালিয়ান, জার্মান, সুইডিস, জাপানিজ না আমেরিকান?"

কোন দুঃখে আমার ওয়াইফ বেজাত হতে যাবে! "শী ইজ ভারতীয় এবং আমাদের হিন্দুস্থান মোটর গাড়ির মতোই শতকরা একশ ভাগ স্বদেশী। উভয়েই মেড ইন কোন্নগর, ডিসট্রিকট হুগলী, ওয়েস্টবেঙ্গল, ইণ্ডিয়া।"

মানকেলো সায়েব খুব লজ্জা পেলেন। বার-বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। "এই জন্যেই পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা হওয়া প্রয়োজন। আমাকে পীস কোরের এক ছোকরা বললো, পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে তোমাদের গোরুর গাড়ির কোনো ডিজাইন চেঞ্জ হয়নি।" এবার কোনো রিস্ক নিলেন না মিস্টার মানকেলো, জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা—তোমার মোটর গাড়ির মডেল ক'হাজার বছরের পুরনো?"

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। বললাম "মিস্টার মানকেলো, হাওয়া-ভরা টায়ার এবং হাওয়া-গাড়ি তো এই সেদিন আবিস্কার হলো। এইট্টিন নাইনটি ফোর না নাইনটি ফাইভে প্রথম মোটর গাড়ি আপনাদের দেশ থেকে আমাদের দেশে গেলো।"

"আর বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি", অপরাধ স্বীকার করে নিলেন মিস্টার মানকেলো।

আমি ঝুঁকি নিলাম না। জানতে চাইলাম, "কী বুঝলেন?"

"সোজা অঙ্ক—তোমাদের মোটর গাড়ি এইট্টিন নাইনটি ফাইভ মডেল থেকে ব্যাকডেটেড হতে পারে না।" সায়েব আবার আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিলাম, প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করবার মতো ক্ষমতা আমার নেই।

গাড়ি চালাতে-চালাতে মানকেলো সায়েব বললেন, "আমাদের দেশে যখন এসেছো তখন দেখে রাখো এই সব আধুনিক জিনিস। এই যে আমি গাড়ি চালাচ্ছি হাতে ঠেলে-ঠেলে গিয়ার চেঞ্জ করতে হয় না। অটোমেটিক গিয়ার চেঞ্জার। গাড়ি উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম কোন দিকে যাচ্ছে তা এই যন্ত্রটার দিকে তাকালে বুঝতে পারবে।"

আমার এসব উন্নতির কথা জানা ছিল না, তাই আগ্রহের সঙ্গে দেখলাম। কিন্তু সায়েব তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "সব নোট করে রাখো,

ইণ্ডিয়াতে ফিরে সবাইকে গল্প শোনাতে পারবে।"

মসৃণ কংক্রিটের রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে—রাস্তা তো নয় যেন শোবার ঘরের চকচকে মেঝে। তারিফ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মানকেলো মেজাজ খারাপ করে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের ক্যালকাটার রাস্তার অবস্থা কী রকম ?"

আমি প্রশ্নটা না শোনার ভান করলাম—যেন দুপাশের দৃশ্য দেখতে-দেখতে আমি বুঁদ হয়ে আছি। সায়েব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "রাস্তায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি এনেছো নাকি তুমি ? আমার কয়েকজন বন্ধু সম্প্রতি স্পেনের বুল ফাইট দেখে এসেছে, তারা শুনেছে ক্যালকাটায় স্ট্রীট-বুল ফাইটিং নাকি আরও উত্তেজনাপূর্ণ। আরও বিপজ্জনক !"

ভাগ্যে দেশ থেকে কোনো ছবি আনিনি। আনলে কী অবস্থা হতো আমার !

মানকেলো সায়েব এক দোকানের সামনে গিয়ে গাড়ি থামালেন। বললেন, "এটাও দেখে নাও, দেশে ফিরে গিয়ে গপ্পো করতে পারবে। আলিবাবার স্টোরিতে চিচিং ফাঁকের কথা শুনেছো এবার আমেরিকায় ব্যাপারটা দেখে যাও।"

সত্যি তাজ্জব ব্যাপার। দোকানের কাঁচের গেটের সামনে দাঁড়াতেই দরজা আপনা থেকে খুলে গেলো। মানকেলো সায়েব আমার মতো দেহাতিকে এই সব জিনিস দেখিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছেন।

আমার বিস্ময় বৃদ্ধির জন্য তিনি বললেন, "ভাবছো কোথাও কোনো গেটম্যান লুকিয়ে আছে এবং আমাদের দেখেই দরজা খুলে দিচ্ছে ! মোটেই তা নয়—এসব সায়েন্সের ব্যাপার এবং নিশ্চয় শুনে থাকবে বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যায় আমরা ওয়ার্লডের সবার থেকে অনেক এগিয়ে আছি।"

মানকেলো সায়েবের এই দাবি আমি অনেক আগেই মেনে নিয়েছি। কিন্তু তবু সায়েব ছাড়বেন না। ওজন-মেসিনের মতো একটা যন্তর দেখিয়ে বললেন, "ওর ওপর পা তুলে দাও।" নির্দেশ মান্য করলাম। সায়েব তখন একটা পঞ্চাশ সেন্ট মুদ্রা দিলেন যন্তরকে। অমনি কোত্থেকে একটা বৈদ্যুতিক বুরুশ এসে আমার জুতো ঝেড়ে দিলো। আমি নেমে পড়ছিলাম, কিন্তু সায়েব ইঙ্গিতে বারণ করলেন। এবার যন্ত্রটা কালি বার করলো এবং আমার জুতোকে ঝকঝকে করে দিলো।

গর্বের হাসি হাসলেন মানকেলো সায়েব। বললেন, "কোন্ দেশে বেড়াতে এসেছো বুঝতে পারছো ?"

হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি আমি ! আমেরিকার এই মফঃস্বলেই যদি এমন

কাণ্ড হয় তাহলে বড়-বড় শহরে কী চলে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার অবস্থা !

ইলেকট্রিক লিফ্টের কাছে গিয়ে সায়েব বললেন, "এর নাম লিফ্ট।"

আমার একটু দুঃখ লাগলো। সায়েব ভেবেছেন কী ? আমি লিফ্টও দেখিনি !

মানকেলো সায়েব এবার বড়দা-স্টাইলে ভরসা দিলেন, "মন খারাপ কোরো না, এসব জিনিস একদিন পৃথিবীর সব দেশেই যাবে—শুধু একশ দেড়শ বছর সময়ের প্রশ্ন।"

সমস্ত দিনই এইভাবে চললো। বলবার কিছুই নেই—পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে !

সন্ধ্যেবেলায় মাখনদা টেলিফোনে খবর করলেন। সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "মনে রাখিস নিজের দেশকে তুলে ধরার চেয়ে বড় কাজ তোর এখানে নেই। কখনও কোনো অন্যায় সহ্য করবি না—মুখের ওপর ফটাফট উত্তর দিয়ে দিবি।"

টেলিফোনেই দু'একটা নমুনা শুনতে চাইলেন মাখনদা। ব্যাপারটা তিনি মোটেই হাল্কাভাবে নিচ্ছেন না।

আমি বললাম, "মাখনদা, মানকেলো সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দেশে এতো প্রোটিনের অভাব, ওয়ার্লডের সেকেণ্ড হায়েস্ট নাম্বার গোরুবাছুর তোমাদের রয়েছে, অথচ বীফ খাও না কেন ?"

"তুই নিশ্চয় মুখ বুজে আক্রমণটা হজম করে নিয়েছিস," টেলিফোনে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন মাখনদা। "তোর প্রথমেই বলা উচিত ছিল, আমাদের দেশের ঋষিরা লিখেছেন, আপরুচি খানা।"

"মাখনদা, ওটা বোধহয় কোনো মোগল-রসিকের উক্তি—কৌপিনধারী উপবাসী ঋষিরা কি খানাপিনা বা পরনা নিয়ে ওই ধরনের পাবলিক বিবৃতি দিতেন ?"

"আলবৎ ঋষি। জ্ঞানী-গুণী ঋষিরা মোগলদের থেকে কম যেতেন না," মাখনদা আমাকে সাহস যোগালেন।

"হ্যাঁ শংকর, তোকে যা বলছিলাম, সায়েবের কাছে প্রথম জবাব, আমরা শালা কী খাই-না-খাই, তাতে তোমাদের কি ? নাম্বার টু, আমরা তো জিজ্ঞেস করছি না, তোমরা কুকুর খাও না কেন ? নাম্বার থ্রি, ইণ্ডিয়ানদের একটা বিরাট অংশ গোরু কেন, মাছ মাংস ডিম কিছুই খায় না। নাম্বার ফোর, ইণ্ডিয়াতে

বিরাট এক পাবলিক গোরু খায়, তারা মুসলমান খৃষ্টান পার্শী এটসেটেরা ! নাম্বার ফাইভ, সবাই বীফ্ খেতে আরম্ভ করলে, দেশের চাষ উঠে যাবে—হাল টানবার মতো বলদ, দুধ দেবার মতো গোরু আর একটিও থাকবে না। ছ নম্বর..."

আমার এবার ভয় হয়ে গেলো। "মাখনদা, এতোক্ষণ টেলিফোন এনগেজড থাকলে লাইনে গোলমাল হবে না ? ক্রস কানেকশন হবার ভয় থাকবে না ?"

"সে আবার কী ? ক্রস কানেকশন, নো ডায়াল টোন, ঘড় ঘড় আওয়াজ হওয়া, ডায়াল করলে খট খট খটাং এসব টেলিফোন-রোগের কথা এদেশের কেউ জানে না। খুব সাবধান, ইণ্ডিয়ান টেলিফোনের এই সব কথা ভুলেও এখানে তুলিস না।"

মাখনদা আমার অবস্থা আন্দাজ করে টেলিফোন ছেড়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে হোটেলে হাজির হলেন। স্বদেশের জন্যে এমন ভালবাসা দেশের মধ্যে আজকাল নজরেই পড়ে না। দেশকে ঠিক মতো ভালবাসতে হলে প্রত্যেকেরই একবার বোধহয় বিদেশে যাওয়া দরকার।

মাখনদার যে অনেক কাজ, তাঁর সময়ের যে অনেক দাম, তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদেরও যে তাঁর সময়ের ওপর দাবি আছে, এসব আমার অজানা নয়। কিন্তু তিনি সব কিছু নো-তোয়াক্কা করে দেশের লোকের কাছে চলে এসেছেন।

মাখনদা জানতে চাইলেন আমার সারদিনের কর্মবৃত্তান্ত। বললাম, "একটা ইস্কুলে গিয়েছিলাম, খুব আদরযত্ন করলো। তবে ছোট-ছোট ছেলেরা সব রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো ড্রেশ করে এসেছিল। আমাকে দেখে তারা একটু হতাশ হলো, জিজ্ঞেস করতে লাগলো কেন আমি জাতীয় পোশাকে আসিনি। খুব ভুল হয়ে গেলো মাখনদা, ডজন-খানেক ধুতি পাঞ্জাবি সঙ্গে আনা উচিত ছিল।"

মাখনদা আমার চোখ খুলে দিলেন। "ওরা তোর ধুতি পাঞ্জাবি দেখতে ব্যগ্র নয়—ওরা ভেবেছে, তুই একটা জ্যান্ত রেড ইণ্ডিয়ান ! তোকে যে ওয়ার ডান্সিং-এ নামিয়ে দেয়নি তাই ভাল।"

পরবর্তী অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করলাম। "মেয়েদের এক হাই ইস্কুলে গিয়েছিলাম। তেরো-চোদ্দ বছরের টিন-এজ গার্লদের ভিড়ে হল বোঝাই—তিল ধারণের জায়গা নেই। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভাবখানা এমন, যেন আমি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছি।"

মাখনদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, "প্রথমে ভাবলাম, বাংলা সাহিত্যের কিছু খবরাখবর তাহলে এখানেও পৌঁছে গিয়েছে।"

ইস্কুলের দিদিমণিও স্বীকার করলেন, "এবারে রেকর্ড গ্যাদারিং—সভায় এরকম ভিড় অনেকদিন হয়নি। আগের মাসে ফাদার জনসন এসেছিলেন, সেবার মাত্র পাঁচটি মেয়ে উপস্থিত ছিল।"

মিস্টার মানকেলো আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি আমাকে কানে-কানে বললেন, "আমি কোনো ঝুঁকি নিইনি। যাতে হাউস-ফুল হয় তার আগাম ওষুধ হেড মিস্ট্রেসকে দিয়ে দিয়েছি।"

"তোর সম্বন্ধে সায়েব কী বললো রে বাবা!" চিন্তিত হয়ে উঠলেন মাখনদা। "বোধহয় বলেছে রবিশঙ্করের ব্রাদার, তোরও শংকর নামটা রয়েছে তো।"

"শেষ পর্যন্ত শুনুন মাখনদা," আমি কাতরভাবে নিবেদন করলাম।

হেড মিস্ট্রেস মিসেস এলিশন এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "মেয়েরা, আজকের এই মিটিংয়ের ব্যাপারে তোমরা যা আগ্রহ দেখিয়েছ তার অর্ধেক আগ্রহ যদি প্রতিদিনের পড়াশোনায় দেখাও তা হলে তোমরা অনেক এগিয়ে যাবে।"

খিলখিল, কিশোরী-হাসির বন্যা বইলো।

"মেয়েরা", আবার আরম্ভ করলেন মিসেস এলিশন। "তোমরা সবাই দশ-এগারো বছর বয়স থেকে বয়ফ্রেণ্ড এবং ডেটিং নিয়ে ব্যস্ত। তোমাদের ধারণা, সমস্ত পৃথিবীটাই এইভাবে চলছে। তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয় এই ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখো। ইনি এবং এঁর স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বিয়ের রাতে। তার পরে মেনি ইয়ারস কেটে গিয়েছে।"

"কত বছর?" মেয়েরা তারস্বরে জানতে চাইলো।

"অনেক বছর," উত্তর দিলেন মিসেস এলিশন। "তবু এখনও এঁদের ডাইভোর্স হয়নি। এঁরা হ্যাপিলি ম্যারেড।"

"মাখনদা, প্রত্যেকটি মেয়ে আমাকে এমনভাবে দেখতে লাগলো যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে নতুন কোনো নিদর্শন এসেছে।"

"হুম্", বিরক্ত হয়ে উঠলেন মাখনদা। "ইণ্ডিয়ান সোসাইটির বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে তোর কিছু বলা উচিত ছিল। আমাদের মেয়েরা যে এখনও কত নিষ্পাপ, কত পলিউশন-ফ্রি তা তোর ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল।"

"ব্যাখ্যা করবো কী মাখনদা? একটা মেয়ে তো তখন আমার বউয়ের জন্যে খুব দুঃখ করছে—পুত্তর মিসেস শংকর। ভদ্রমহিলা জানতেই পারলেন না লাইফটা কী!"

এমন সময় মানকেলো সায়েবের টেলিফোন এসে গেলো। "হাই! শংকর, কী হলো, এখনও তুমি এলে না? আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"খুবই দুঃখিত মিস্টার মানকেলো। আমার বহুদিনের হারানো এক ইণ্ডিয়ান বন্ধু এসে গিয়েছেন।" এরপর মাখনদার বিবরণ দিলাম। মানকেলো সায়েব বললেন, "তোমার বন্ধুকে ফোনটা দাও।"

ভালই হলো, মাখনদাও আমার সঙ্গে চললেন। মানকেলো সায়েব ওঁকেও

সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মাখনদাকে বাড়িতে ফোন করে ক্ষমা চাইতে হলো। আগামী কাল ভোরে ওঁর অফিস। তবু তিনি আমার সঙ্গী হলেন। কারণ আমাকে একলা পেয়ে ইণ্ডিয়ার আর-এক দফা ক্ষতি হোক তা মাখনদা কিছুতেই সহ্য করবেন না।

গাড়িতে যেতে-যেতে আমি মিস্টার মানকেলোর কথা ভাবছি। মাখনদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "সাদা সায়েবের নাম কেলো হলো কী করে?"

"পয়সাকড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তি হলে এদেশে সাদা-কালো সবারই সমান দেমাক হয়।" মাখনদা আমাকে সাবধান করে দিলেন। তাঁর চিন্তা তখন স্বদেশ সম্পর্কে। বললেন, "মানকেলো যদি বাড়াবাড়ি করেন তাহলে আজ যোগ্য শিক্ষা দিতে হবে।" মাখনদা তো ইণ্ডিয়াতে নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর গলায় যেন সন্ত্রাসবাদীর সুর।

তিনি বললেন, "আজ কিন্তু ইণ্ডিয়াকে ওপরে তুলতেই হবে। যে-করে হোক বুঝিয়ে দিতে হবে সব ব্যাপারেই সায়েবরা এগিয়ে নেই।"

"সেটা কী করে হবে?" আমার চিন্তা বেড়ে যায়। "একমাত্র জনসংখ্যা ছাড়া সেরকম আর কোনো বিষয় আছে?"

"সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে", মাখনদা নিজের কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিচ্ছেন। "ওদের মুখে চুনকালি দেবার মতো বিষয় নিশ্চয় আমাদের আছে। শোন্ তেমন প্রয়োজন হলে, তুই চুপ করে যাবি, তোর নাম করে আমিই মুখ খুলবো। জন্মভূমির নুন তো আমাকে একদিন শোধ করতেই হবে।"

দরজার কলিংবেল টিপতেই মানকেলো সায়েবের ভৌতিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। "হ্যালো, শংকর?"

আমার উত্তর পাবার কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেলো অথচ কেউ নেই। অনেক দূরে মিস্টার মানকেলো দাঁড়িয়ে আছেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "এখানে সব অটোমেটিক ব্যাপার। বোতাম টিপে দরজা খুলে দিলাম।"

"যদি আমি না হয়ে অন্য কেউ হতো তা হলে তো বিপদে পড়ে যেতেন!"

"মোটেই নয়," মানকেলো আমাকে বোঝালেন। "তার কারণ, এইখানে সি-সি-টি-ভিতে তোমার ছবি আমি দেখে নিয়েছি। ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন!"

"অ্যাঁ! এ যে ময়দানবের পুরী!"

মিস্টার মানকেলো বললেন, "এই যে তোমার সঙ্গে গল্প করছি এই ছবিও কলঘর থেকে আমার স্ত্রী দেখতে পাচ্ছেন। এখনই তিনি নেমে আসবেন।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে মানকেলো বললেন, "বুঝতেই পারছো, বার বার ছোটাছুটি করে দরজা খুলবার হাঙ্গামা আমাদের নেই। তোমাদের নিশ্চয় এসব যন্ত্রপাতির অভাবে খুব ভুগতে হয়।"

মাখনদা গোড়া থেকেই রেগে আছেন। বাংলায় ফিসফিস করলেন, "বল না, আমাদের অন্য যন্ত্ররপাতি আছে। অন্ততঃ এখনকার মতো মান রক্ষে হোক।"

আমার মুখ খুললো না। ভরসন্ধ্যেবেলায় কাঁচা মিথ্যে কথা বলি কী করে?

মিস্টার মানকেলো ততক্ষণে তাঁর বাড়ি দেখাতে শুরু করেছেন। "শংকর এর নাম ইলেকট্রিক গ্রাইণ্ডার। বোতাম টিপলেই সব কিছু মশলা গুঁড়ো হয়ে যায়। এই অ্যাটাচমেন্ট জুড়লেই মাংস হয়ে যায় কীমা!"

আমার চক্ষু বিস্ফারিত এবং আমার গাঁইয়া অবস্থা দেখে মাখনদা বেশ বিরক্ত।

সায়েব কিন্তু আমার ছানাবড়া চক্ষু দেখে খুব সন্তুষ্ট। বললেন, "এই ঘরে তেইশ রকম ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আছে! সব অটোমেটিক।" ইলেকট্রিক ছুরি, ইলেকট্রিক হাঁড়ি, ইলেকট্রিক বঁটি আরও কত কী সব! আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা।

আমি বোকার মতো বলে ফেললাম, "ছুরি, বঁটি, দা, শিল-নোড়া হাঁড়ি-কড়া সবই আমাদের আছে—কিন্তু কোনোটাই অটোমেটিক নয়। প্রত্যেকটির পিছনে বড্ড মেহনত করতে হয়।"

এই ধরনের উত্তরই যেন মানকেলো সায়েব প্রত্যাশা করেছিলেন। সগর্বে বললেন, "দেখে যাও সব—ফিরে গিয়ে তোমার ফ্রেণ্ডদের বলতে পারবে। ফাইভ থাউজেণ্ড ইয়ারসে তোমরা তো কিছুই চেঞ্জ করোনি।"

এবার বাথরুমের দিকে নিয়ে গেলেন মিস্টার মানকেলো। ওরে সর্বনাশ! কল ঘরেও কতো রকমের কলকব্জা। সায়েব বললেন, "তোমাদের দেশে দাড়ি কামানোর সরঞ্জামের খুব অসুবিধে বোধ হয়। আমার এক ফ্রেণ্ড ডেল্লির রিপাবলিক-ডে-প্যারেডের ছবি তুলে এনেছিল—দেখলাম সমস্ত সৈন্যদের দাড়ি। সঙ্গে অবশ্য ম্যাচিং হেডগিয়ার রয়েছে যার নাম পুগরি।"

"পুগরি নয়, সাহেব, পাগড়ি।"

"আই অ্যাম সরি, তা তুমি এই মেসিনে অটোমেটিক দাড়ি কামাতে পারো।"

সায়েব এবার যন্ত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু না-বাবা ওইসব ইলেকট্রিক জিনিস গালে ঠেকিয়ে বৈদ্যুতিক শক খেতে রাজী নই। "এদিক-ওদিক একটু-আধটু লিক থাকলেই ইলেকট্রিক শেভার না ইলেকট্রিক ডেস্ট্রয়ার বোঝা যাবে না!"

মানকেলো সায়েব আমার কথায় খুব হাসছেন। "তুমি ইলেকট্রিক শেভারে ভয় পাচ্ছো, আর-এক আফ্রিকান ইয়ংম্যান এসেছিল গত বছরে, সে কিছুতেই ইলেকট্রিক কম্বল গায়ে দেবে না। তাকে নিয়ে রাত্রে আমার রীতিমত সমস্যা, কারণ আমার বাড়িতে ইলেকট্রিক কম্বল ছাড়া কোনো কম্বলই নেই।"

কী সব দেখছি বাবা! হয়তো এখানকার লোটাও ইলেকট্রিক। মাখনদা বাংলায় সাবধান করে দিলেন, "এখানে কেউ লোটা ব্যবহার করে না, তুই আর বাইরের লোকের সামনে আমাদের ইজ্জত ডোবাস না!"

সায়েব এবার দেখালেন, ইলেকট্রিক টুথ-ব্রাশ। পাছে আমি সন্দেহ করি, তাই মেশিনটা চালু অবস্থায় একটু ব্যবহার করে নিলেন।

ইলেকট্রিক-দাঁতন রেখে সায়েব হাত ধুয়ে নিলেন। কিন্তু গামছা বা তোয়ালেতে হাত মুছলেন না। একটা পাইপের সামনে হাতদুটো নাড়তে লাগলেন। আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম, "মিসেস মানকেলো হয়তো ধোয়া তোয়ালে দিতে ভুলে গিয়েছেন!"

"নো নো! এটা হলো অটোমেটিক তোয়ালে—সামনে হাত ধরলেই গরম হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে।"

আরও দু-খানা কল দেখিয়ে দিলেন মিস্টার মানকেলো। একখানা অটোমেটিক ডিশওয়াশার—"এঁটো বাসনপত্র ভিতরে ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দাও। বাকি বাসন মাজার কাজ মেশিনে হবে।" আর একখানা অটোমেটিক কাপড়-ধোলাই কল। ইলেকট্রিক-ধোপা বলা চলতে পারে। এসব জিনিসের কথা কস্মিনকালেও কল্পনা করিনি।

মানকেলো বললেন, "এই মেশিন থাকলে বর্ষাকালেও ডোন্ট কেয়ার। এই মেশিন শুধু কাপড়ই কাচে না, দশ মিনিটে ভিজে কাপড় একেবারে শুকনো খটখটে করে দেয়!" মিষ্টি হাসি দিয়ে সায়েব তাঁর বিজয়-ঔদ্ধত্য চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাচ্ছি—সুন্দরবন থেকে প্রথম কলকাতায় এলেও লোকে বোধহয় এমন ধাক্কা খায় না।

মাখনদা কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছেন না। শুদ্ধ বাংলায় আমাকে বললেন, 'মহাভারত বা রামায়ণে তো অনেক আধুনিক জিনিসের বর্ণনা আছে। ওখানে এই বৈদ্যুতিক-ধোপার মতো কিছু নেই?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "উড়ন্ত পুষ্পকরথের কথা আছে। কিন্তু এইসব আজব যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে রামায়ণ মহাভারত সম্পূর্ণ নীরব। সীতার সংসারে একটা ডানলপিলো বা একটা ফ্রিজিডেয়ার পর্যন্ত ছিল না।"

দুঃখে মাখনদা মাথার চুল টানতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। মিস্টার মানকেলো কিন্তু ছুটে যাবার ব্যস্ততা দেখালেন না। আমি

বললাম, "আপনার টেলিফোন হয়তো কেটে গেলো—কোনো আওয়াজ হচ্ছে না।"

"কোনো চিন্তা নেই।" আশ্বস্ত করলেন মিস্টার মানকেলো। "ওখানেও অটোমেটিক মেশিন আছে—ফোন তুলে মেশিনই জিজ্ঞেস করে নেবে কে কথা বলছেন, তারপর রিকোয়েস্ট করবে, আপনি ধরুন, মিস্টার মানকেলো এখনই আসছেন।"

এ্যাঁ! ভূতকে বাড়িতে মাস-মাইনের চাকরি দিয়েছেন নাকি মিস্টার মানকেলো?

আবার মুচকি হেসে সায়েব রসিকতা করলেন, "এই টেলিফোন অপারেটর-মেশিন তোমাদের দেশে নেই?"

মানকেলো সায়েব এবার টেলিফোন ধরতে চলে গেলেন আর সেই অবসরে মাখনদা রাগের চোটে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন।

নিকটবর্তী ফোম রবার গদিতে বসে পড়লাম আমরা। অপমানে ঘেমে উঠেছেন মাখনদা। মুখ লাল করে তিনি বললেন, "আর সহ্য হয় না। এদের বাড় বড্ড বেড়েছে। কিন্তু অতিদর্পে হত লঙ্কা।"

কিন্তু এটা লঙ্কা নয়—ইউ-এস-এ। যুগটাও বিংশ শতাব্দী, রামায়ণের কাল নয়। এ যুগে অতি দর্পে কিছু হয় না, বরং সম্মান আরও বেড়ে যায়। কিন্তু মাখনদা আজ দর্পহারী ইণ্ডিয়ান মুধুসূদনের ভূমিকা অভিনয় করতে বদ্ধপরিকর।

"ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছি আমি। এবার যা-হয় হবে, আমি সায়েবকে শিক্ষা দেবো, সায়েবকে বুঝিয়ে দেবো ইণ্ডিয়াকে নিয়ে রসরসিকতা চলবে না।" মাখনদার স্বদেশী রক্ত যে টগবগ করে ফুটছে তা বুঝতে পারছি।

মাখনদা বললেন, "শোন। এবার ওই সায়েব তোকে অটোমেটিক ঘড়ি, জুতো, ইলেকট্রনিক চশমা, ফাউন্টেনপেন এটসেটেরা আরও কত কি দেখাবার মতলব ভাঁজছে কে জানে। তুই কিন্তু ঘাবড়ে যাস না।"

"আমার আর ঘাবড়াবার বাকী কি আছে, মাখনদা? ইউ-এস-এ এতো এগিয়ে আছে জানলে আমি এখানে আসতামই না। এতো প্রগতি আমাদের সহ্য হয় না। আমাদের পক্ষে বিলেতই ভাল।"

"তুই ওসব কথা মুখে আনিস না, শংকর। তোর মাখনদা তো এখনও মরেনি। আমার এখনও সেই পুরনো শিখ-পাঞ্জাবী পলিসি—শির দেবো তবু শরম দেবো না!"

"মাখনদা!" আমি কাতরভাবে আবেদন জানালাম, "পরিস্থিতিটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। চলুন আমরা বরং ফিরে যাই। যাবার আগে বলে যাবো,

আমাদের ইণ্ডিয়াতে এতো সব জিনিস নেই কিন্তু বুদ্ধ, অশোক, গান্ধী মায় যীশুখ্রীষ্টও তোমাদের দেশে জন্মায়নি।"

"ওসব বড়-বড় নামে চিঁড়ে ভিজবে না রে।" নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বোধহয় মাখনদা বললেন। "এদের জব্দ করতে হলে আইটেম-বাই-আইটেম অপমান করতে হবে।"

কী যেন ভেবে নিলেন মাখনদা। তারপর বললেন, "শোন, এবারে সায়েব যা দেখাবেন যা বলবেন, তুই সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিবি এর থেকে অনেক ভাল জিনিস ইণ্ডিয়াতে আছে। তারপর আমি দেখছি।"

আমি একটুও সাহস পাচ্ছি না। "বড্ড মেথডিক্যাল জাত এই আমেরিকানরা। যদি পুরো বিবরণ জানতে চায়? তাহলে যে সর্বনাশ হবে মাখনদা।"

"মিস্টার মানকেলো তো ইণ্ডিয়ার সবকিছু মুখস্ত করে বসে নেই।" অভয় দিলেন মাখনদা।

তবু আমার প্রয়োজনীয় সাহস হচ্ছে না। "মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়ে গেলে তার থেকে অপমান নেই। বিশেষ করে এই ফরেন কানট্রিতে।"

"আঃ," চাপা বকুনি লাগালেন মাখনদা। "অ্যামবাসাডর-এর ডেফিনিশন শুনিসনি?"

"শুনেছি বৈকি। ফোর্টিন হর্স পাওয়ার, ফোর সিলিণ্ডার, সেলুন বডি...।"

"ও তোর শ্বশুর বাড়ির টাউনের অ্যামবাসাডর মোটর গাড়ির ডেসক্রিপশন! আমি বলছি রাষ্ট্রদূতের কথা। শোন, অ্যামবাসাডর হচ্ছেন তিনি যিনি বিদেশে যান মিথ্যে কথা বলতে স্বদেশের জন্যে।"

তড়িৎগতিতে আমার মনে পড়ে গেলো আমরা যারাই বিদেশে এসেছি তারাই দেশের বেসরকারী অ্যামবাসাডর। সুতরাং.....।

মাখনদার কথা আবার আমার কানে ঢুকছে। "সায়েব যাই দেখাক, তুই বলবি এর থেকে অনেক ভাল জিনিস তোর হাওড়ার বাড়িতে আছে। কোনো চিন্তা নেই, আমি তো আছি। জয় মা হাজার-হাত কালী, জয় মা ওলা-বিবি। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ক্ষুধিত বাঘের মতো মাখনদা এবার মানকেলো সায়েবের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মিসেস মানকেলো ইতিমধ্যে সুসজ্জিতা ও সুগন্ধিতা হয়ে নিচে নেমে এলেন। আমাকে খুব হাসিমুখেই অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। বললেন, "জনের মুখে তোমার কথা অনেক শুনেছি। তারপর আজ মেয়েদের স্কুলে তোমাকে নিয়ে যে সেনসেশন হয়েছে তার রিপোর্টও আমার এক বান্ধবীর কাছে পেলাম।

গ্রেট ! মেয়েরা এমন পুরুষমানুষ কোনোদিন দেখতে পাবে ভাবেনি। তোমার ওয়াইফ সঙ্গে এলে তো ইস্কুল ভেঙে পড়তো—এমন মেয়ে বিয়ের রাতের আগে স্বামীর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক হয়নি !"

আমি প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছি। কী বলবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

মিসেস মানকেলো এবার সমস্যা আরও পাকিয়ে তুললেন। বললেন, "বিশ্বাস করো, তোমার ওপর শ্রদ্ধা হচ্ছিল আমার। কিন্তু মিস্টার মানকেলোর মুখে একটা কথা শুনে কিছুটা বিব্রত হলাম।"

আবার কী হলো !

"আমি শুনলাম, দেশে ফিরে গিয়েই তুমি ডেটিং শুরু করবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত ! কী সব বলছেন এই ভদ্রমহিলা ?

মাখনদা ইতিমধ্যে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছেন। তিনি গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা করলেন, "মহাশয়া, আপনি ভারতবর্ষের ব্যাপারটা ঠিক বোঝেন নি। আমাদের ওখানে ডেটিং নেই, তবে মেয়ে-দেখা আছে। শংকর দেশে ফিরে গিয়েই মেয়ে-দেখা শুরু করবে তার ভাইয়ের বউ সিলেকশনের জন্য।"

খুব ক্ষমা চাইলেন মিসেস মানকেলো। "কী লজ্জার ব্যাপার ! আমি তো ধারণা করে নিয়েছি, তোমাদের ওখানে ভাইয়ের ফিউচার ওয়াইফের সঙ্গেই ডেটিং করবার নিয়ম !"

"অল্পের জন্যে রক্ষে হয়ে গেলো, মাখনদা। এরা কী সব ভেবে রেখেছে কে জানে !"

মাখনদা বললেন, "তুই চিন্তা করিস না। সব ঠিক করে ফেলবো।"

যথাসময়ে মিস্টার মানকেলো ফিরে এলেন। এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে মিসেস মানকেলো খাবার সাজাবার জন্যে প্যানট্রিতে চলে গেলেন।

ডিনারের জন্য অপেক্ষা করবার আগে মানকেলো সায়েব আমাদের আর-একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "এবার তোমাদের এ-বাড়ির সর্বাধুনিক যন্ত্রটা দেখাবো। একেবারে হালফিল আনা হয়েছে। সম্পূর্ণ অটোমেটিক।" ট্রানজিস্টারাইজড, সলিড স্টেট, হাইব্রিড, হাইফাই আরও কতকগুলো বিচিত্র শব্দ পরের-পর উল্লেখ করে গেলেন মানকেলো সায়েব।

দেখলাম টেবিলের ওপর একটি ছোট্ট কেটলি রয়েছে। মিস্টার মানকেলো বললেন, "একে অর্ডিনারি জিনিস ভেবো না। আমেরিকান সুপার টেকনোলজির সুপার লেটেস্ট অবদান।"

আমি বোকার মতো তাকিয়ে আছি ওঁর দিকে। মিস্টার মানকেলো বললেন, "কেটলির সঙ্গে একটা কোয়ার্টজ ঘড়ি রয়েছে যা বছরে হাফ সেকেণ্ডের বেশি

স্লো-ফাস্ট যায় না। এই ঘড়ির দু-নম্বর কাঁটা ঘুরিয়ে তুমি কেটলিকে নির্দেশ দিতে পারো। চল্লিশটা পর্যন্ত হুকুম এর মিনি কমপিউটারে মজুত রাখা যায়!"

"মানে?"

"মানে কেটলিতে জল ভর্তি করে আমি ঘড়ির কাঁটায় ছ'টা করে দিলাম। ঠিক ভোর ছটার পাঁচ মিনিট আগে অটোমেটিক ইলেকট্রিক হিটার চালু হয়ে যাবে। জল যেমন ফুটতে আরম্ভ করবে অমনি....."

ঠিক এই সময় মাখনদা আমাকে কনুইয়ের ধাক্কা দিলেন। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলাম, "এ-আর কী? এর থেকে বেটার জিনিস আমার বাড়িতে আছে।"

এরকম উত্তরের জন্য সায়েব প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বড়দা স্টাইলে বললেন, "একটু ধৈর্য ধরো, এখনও সবটা বলা হয়নি। জল ফোটা মাত্রই কেটলির ইলেকট্রনিক ঢাকনি অটোমেটিক খুলে যাবে এবং ওপর থেকে অটোমেটিক একটা কিংবা দুটো টী-ব্যাগ জলের মধ্যে নেমে আসবে এবং কেটলির মুখ আবার বন্ধ হয়ে যাবে।"

আমি আবার কনুইয়ের সিগন্যাল পেলাম। এখন আর কোনো উপায় নেই। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাড়ির ব্যবস্থা এর থেকেও বেটার।"

বিরক্তি চেপে রেখে সায়েব বললেন, "এখনও সবটুকু শোনা হয়নি তোমাদের। হাল্কা, কড়া, খুব কড়া—তিনটে বোতাম আছে। যেটা টিপে রাখবে সেই অনুযায়ী চা তৈরি হওয়া মাত্রই কেটলি থেকে টুংটুং হাইফাই ষ্টিরিওফোনিক বাজনা আরম্ভ হবে। তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে কেটলির কাছে চলে এসো। চা রেডি। কেটলি থেকে ঢালো এবং খাও। ওয়াইফকেও এক কাপ দাও।"

সায়েব ভেবেছিলেন এবার আমার মুখ বন্ধ হবে। কিন্তু আবার কনুইয়ের খোঁচা খেয়েছি আমি। সুতরাং বললাম, "আমার বাড়ির সিস্টেম এর থেকে অনেক অটোমেটিক—অনেক হাঙ্গামা কম।"

মানকেলো সায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠলো। "ইণ্ডিয়া যে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে এতো এগিয়ে গিয়েছে তা জানতাম না। জাপানীরাও এই মিনি মারভেলো মেশিনের কথা ভাবতে পারছে না, শংকর।"

এবার আমার সত্যিই বুক ধুকপুক করছে। মানকেলো সায়েব জিজ্ঞেস করলেন বলে, তোমার বাড়ির মেশিনটি কি রকম?

যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হলো। মানকেলো সায়েব প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন। আর আমি একমনে মা হাজার-হাত কালীকে ডাকতে লাগলাম। "মা, এই সায়েবের জিভটাকে আধ ঘন্টার জন্যে অসাড় করে দাও।"

শিবপুরে মায়ের কাছে আমার প্রার্থনা পৌঁছলো কিনা জানি না, কিন্তু

মাখনদা নিজেই এবার যুদ্ধে নেমে পড়লেন। বললেন, "শংকর একটুও বাড়িয়ে বলেনি। এই আমেরিকান কেটলিতে অনেক উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সিটি বাজলেই তোমাকে উঠে আসতে হয়। কিন্তু ইণ্ডিয়ায় যে সিস্টেম রয়েছে তাতে বিছানা ছেড়ে টেবিল পর্যন্ত আসতে হয় না।"

"অ্যাঁ!" মানকেলো সায়েবের চোখ দুটো ছানাবড়া হবার উপক্রম।

আমারও বুকের ধুকপুকুনি বাড়ছে। কী করছেন মাখনদা! এইভাবে কত মিথ্যে বানিয়ে বলবেন!

তিনি বললেন, "শংকরের বাড়িতে যে সিস্টেম আছে তাতে কেটলি থেকে চা কাপে অটোমেটিক ঢালা হয়ে গিয়ে প্রয়োজন মতো দুধ-চিনি মেশানো হয়ে যায়!"

"তাহলে তোমরা ইণ্ডিয়াতে এ ব্যাপারে এক কদম এগিয়ে আছো।" মানকেলো সায়েব বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু মাখনদা বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। "দাঁড়াও। এখনও সমস্তটা বলা হয়নি—এক কদম নয়, বহু কদম এগিয়ে রয়েছে ইণ্ডিয়া।"

বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন মিস্টার মানকেলো। আমিও তখন বোকা বনে গিয়েছি।

মাখনদা বললেন, "আমাদের বন্ধুটি লাজুক, তাই এইসব মেশিনের কথা উল্লেখই করছে না। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।"

আবার আক্রমণ করলেন মাখনদা। "চা তো কাপে অটোমেটিক তৈরি হলো। তারপর সেই কাপ সোজা মুভ করতে লাগলো বিছানার দিকে।"

"অ্যাঁ! রিমোট কনট্রোল? ফ্লাইং কাপ-ডিস!" মানকেলো সায়েব এবার মোক্ষম ঘা খেয়েছেন।

"ফ্লাইং সসারের একটা মিনি সংস্করণ বলতে পারো। তবে এখনও সবটা বলা হয়নি।"

মানকেলো সায়েব হাঁ করে তাকিয়ে আছেন।

মাখনদা বললেন, "ইণ্ডিয়ার প্রধান সমস্যা হলো মশা। তোমাদের আবিষ্কৃত ডি-ডি-টি ছড়িয়ে এইসব মশার কিছুই করা যায়নি। ফলে এনসেন্ট মসকিটো নেট ছাড়া বিছানা হয় না। কিন্তু এই মেজর প্রবলেম সত্ত্বেও ফ্লাইং কাপডিসের কিছু অসুবিধে হয় না।"

"মশারির নেট কেটেই কাপ-ডিস ভিতরে ঢুকে পড়ে!" সায়েবের গলা ঘড়-ঘড় করছে।

"পুওর কানট্রি, প্রত্যেক দিন মশারির নেট ছিঁড়লে চলবে কি করে? স্পেশাল প্রসেসে মশারির মধ্যে কাপ-ডিস ঢোকে কিন্তু নেটের কোনো ক্ষতি

হয় না, সেইটাই এই ট্রিপল-সুপার হায়েস্ট-ফায়ডিলিটি করোনেশন কোয়ালিটি ম্যাগনা-সিস্টেমের সিক্রেট বিউটি! ঘুমের ঘোরে চা খাবার পরে এঁটো কাপ-ডিস আবার রিটার্ন জার্নি শুরু করে—যেমন চাঁদের মহাকাশযান চাঁদ থেকে ঠিক সময়ে আবার ফিরে চলে পৃথিবীর দিকে।"

মানকেলো সায়েব এবার সম্পূর্ণ ধরাশায়ী। করুণকণ্ঠে জানতে চাইলেন, "এরকম যন্ত্র কত আছে ইন্ডিয়ায়?"

অসংখ্য। বলতে গেলে প্রত্যেক বাড়িতেই এই যন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।"

"কতগুলো বোতাম টিপতে হয়? চলে কিসে? ইলেকট্রিক না ব্যাটারিতে, না নিউক্লিয়ার পাওয়ারে?" নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আগে মানকেলো করুণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

চোখ বুজে বিজয়ী জেনারেল ম্যাকআর্থারের স্টাইলে মাখনদা বললেন, "বোতাম টিপতে হলে তো সেকেলে টেকনলজি হয়ে গেলো মিস্টার মানকেলো।"

"তাহলে কী 'লেজার অ্যাকটিভেটেড' কাজকর্ম হয়ে যায়?"

"ইন্ডিয়া এখনও অনেক এগিয়ে রয়েছে, মিস্টার মানকেলো। টেকনলজিটা খুবই জটিল—একটা সাউন্ড কোড থাকে—যেটা বিভিন্ন মেসিনের পক্ষে বিভিন্ন। সেই সাউন্ড কোড রিপিট হলেই ভয়েস একটিভেটেড চেন রি-এ্যাকশন শুরু হয়ে যায়। খুবই জটিল পদ্ধতি—অ্যাটম ভাঙার মতো। কিন্তু পদ্ধতি যতই শক্ত হোক, চায়ের কাপ বালিশের পাশে চলে আসে। কুইকলি।"

"ইলেকট্রো মেকানিক্যাল প্রসেস?" জানতে চাইলেন মানকেলো।

"ইলেকট্রো মেকানিক্যাল, না ফিজিও-কেমিক্যাল সে-সব বলা বারণ, মিস্টার মানকেলো। বুঝতেই পারছেন, ইন্ডিয়ার ন্যাশানাল সিক্রেট।" মাখনদার কথায় চাপা ঔদ্ধত্য ফুটে উঠলো।

সায়েব একেবারে ধরাশায়ী। "সামান্য একটা কোড সাউন্ড থেকে এমন ম্যাজিক অ্যাকশন এখনও অকল্পনীয়। এবং বিভিন্ন মেশিনের জন্যে বিভিন্ন সাউন্ড কোড!"

কাতরভাবে সায়েব জানতে চাইলেন, "এই মেশিনের দাম কতো?"

"এসব মেশিন কখনও সোজাসুজি বিক্রি হয় না, মিস্টার মানকেলো। অনলি ভাড়া সিস্টেম—যেমন তোমাদের আই-বি-এম কমপিউটার মেশিন লিজ পাওয়া যায়।"

সাউন্ড কোডের ব্যাপারটা সায়েবের মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। মাখনদা বললেন, "প্রয়োজন হলেই সাউন্ড কোড চেঞ্জ করা যায়। অনেক বাড়িতে প্রায়ই চেঞ্জ হয় আজকাল। সমস্ত কথা বলা যায় না। তুমি হাওড়া

কাসুন্দিতে এসো, শংকর তোমাকেও এই সুপার সিস্টেমে চা খাওয়াবে। এমন মেশিন থাকলে তোমার এই যে ডজন-ডজন অটোমেটিক মেশিন রয়েছে তার কোনোটাই আর লাগবে না। সব কাজই এই সাউন্ড অ্যাকটিভেটেড টোটাল সিস্টেমে চলবে।"

"সত্যি কথা বলতে, ডিনারের পর এঁটো বাসন মেশিনে পুরতে আমাদের খুব খারাপ লাগে। আর সকালে ওই অটোমেটিক মেশিনে হুইস্‌ল যখন দেয় তখন বিছানা ছাড়তে ইচ্ছেই করে না। তোমাদের এখানে ওই মেশিন অন্তত একটা এক্সপোর্ট করো।" ডিনারের পর আমাদের বিদায় দেবার সময় কাতর অনুনয় করেছিলেন মিস্টার ও মিসেস মানকেলো। কিন্তু মাখনদা পাথরের মতো অটল।

"স্যরি, এই মুহূর্তে কোনো চান্স নেই," এই বলে মাখনদা আমাকে নিয়ে সায়েবের বাড়ি থেকে বীরদর্পে বেরিয়ে এসেছিলেন।

গর্বিত সায়েবের পতনে খুশী হলেও মাখনদার পদ্ধতিটা আমার ভালো লাগছিল না। "জাতীয় সম্মান রক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলে মিথ্যার আশ্রয় !"

আমার মন্তব্য শুনে একটুও বিচলিত হলেন না মাখনদা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললেন, "একটি কথাও মিথ্যে বলিনি। সব হানড্রেড টেন পারসেন্ট সত্যি।"

গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে মাখনদা বললেন,"বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মদন, জগু, কেষ্ট এই রকম কোনো নাম ধরে ডাকলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ির কাজের লোক তোদের মশারির মধ্যে চা এনে দেয় না ? এই মেশিনই তো উনুনে আঁচ দেয়, বাসন মাজে, বাটনা বাটে, জল তোলে, কাপড় কাচে, দরজা খুলে দেয়, এঁটো কাপ-ডিস বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং হাজার রকম কাজ করে। এরকম আশ্চর্য ভয়েস অ্যাকটিভেটেড অটোমেটিক মেশিন এ-শালারা পাবে কোথায় ?"এই বলে মাখনদা মনের আনন্দে বাংলা গান গাইতে শুরু করলেন, "সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে।"

ক্লিভল্যান্ডের বাড়িতে বসে লেখাটা শোনবার পরে দিব্যেন্দুবাবু বলেছিলেন, "এবারে আপনার মাখনদার সঙ্গে দেখা হলে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। বলবেন, আমাদের অনেকের মনের দুঃখটা আগাম বুঝে নিয়ে উনি চমৎকার চালিয়ে যাচ্ছেন।"

এখন আমি আচমকা কানাডায়! অনুপ্রাসের দিকে দুর্বলতা থাকলে এই অধ্যায়কে বলা চলতে পারে 'টরন্টোয় টানাটানি'!

দৈবের বশে, ইউ-এস-এ থেকে সাময়িকভাবে কানাডায় সরে যাওয়ার পিছনেও রয়েছে মিছরিদার প্রভাব। হঠাৎ সকালে নিউ ইয়র্ক থেকে ক্লিভল্যান্ডে ফোন। 'ট্রাঙ্ক কল' বলে খুব বকুনি খেলাম মিছরিদার কাছে—আটলান্টিক মহাসাগর পেরোতেই ওটা নাকি হয়ে যায় 'লং ডিস্ট্যান্স কল'। মিছরিদার সংক্ষিপ্ত ঘোষণা, "আমি যাচ্ছি। তুই আয় টরন্টোয়!"

লং ডিস্ট্যান্স মিটার কমাবার সৎ উদ্দেশ্যে মিছরিদা টেলিগ্রাফিক স্টাইলে যা বললেন, "ওখানে টেরুদার ছোট ছেলে রয়েছে। ফোনেই আমার হাতে-পায়ে ধরলো, 'কাকু একবার চলে এসো'। না বলতে পারলাম না! তুই টরেন্টোতে পৌঁছে মিস্টার মুন ব্যানকে ফোন করবি।"

কে এই মিস্টর মুন ব্যান জিজ্ঞেস করাতে খুব বিরক্ত হলেন মিছরিদা। "আমাদের চাঁদু ব্যানার্জি—ওইটাই আদি নাম ছিল টেরুদার ছোট ছেলের। এখন হয়েছে সায়েব। কিন্তু ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী। আমি 'হ্যাং-আপ' করছি।" আমেরিকায় কেউ টেলিফোন নামিয়ে রাখে না—'হ্যাং আপ' করে।

মিছরিদার পরামর্শে কানাডায় এসে আমি যার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি তার নাম নীলাদ্রি চাকী।

"ডায়মন্ড পার্টিকল, অর্থাৎ হীরের টুকরো ছেলে এই নীলাদ্রি," জানিয়েছিলেন মিছরিদা। "আর যদি মণি-কাঞ্চন সংযোগ দেখতে ইচ্ছে থাকে তাহলে দেখিস ওর বউ রাণুকে—স্রেফ ট্যারা হয়ে যাবি, ফরেনে এই রকম হানড্রেড পার্সেন্ট বাঙালী কিভাবে তৈরি হয়।"

বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মঞ্জুশ্রী চাকীসরকারের ভাই নীলাদ্রি ও তার স্ত্রী রাণুই আমাকে মোটর গাড়ি চড়িয়ে ইউ-এস-এ থেকে টরন্টোতে হাজির করেছেন। ওঁরা বাঙালী সম্মেলনে যোগ দিতে ক্লিভল্যান্ড এসেছিলেন এবং আমাকে আবার নিরাপদে শ্যামচাচার দেশে পৌঁছে দেবেন, রণজিৎ দত্তকে এই ব্যক্তিগত মুচলেকা দিয়ে নিজেদের গাড়িতে তুললেন।

চলমান গাড়িতেই আমি ওঁদের কাছে খবর পেয়েছি বাঙালীদের পক্ষে

কানাডায় তিনটি অবশ্যদ্রষ্টব্য জিনিস আছে—দত্ত, মোহান্ত ও নায়াগ্রা জলপ্রপাত। আমি বলেছি, "মারো গোলি নায়াগ্রাকে—বইতে সুন্দর-সুন্দর ছবি দেখে নেওয়া যাবে নায়াগ্রার। দর্শনের ব্যাপারে বাঙালী সমাজের চিরস্থায়ী গার্জেন ওড়িশার মোহান্ত ও তাঁর প্রাণের বন্ধু বিহারের দত্তকে টপ প্রেফারেন্স দিতে চাই!"

জানা দেশ কানাডায় দত্ত-মোহান্তর অজানা কান্ডকারখানা সম্পর্কে খবরাখবর আপনাদের যথাসময়ে জানাতেই হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে টরন্টো শহরের ইউনিয়নভিল অঞ্চল থেকে আমাদের গাড়ি চলেছে একশ ছিয়ানব্বই নম্বর রয়াল ইয়র্ক রোডের দিকে। গাড়ির চালক বিখ্যাত ডাক্তার প্রশান্তকুমার বসু—টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অপথালমোলজির অধ্যাপক। পৃথিবীর সেরা পাঁচজন কর্নিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে একসময় তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিদানের ব্যাপারে টরন্টোর স্থান পৃথিবীতে এক নম্বর, আবার সেখানকার এক নম্বর আমাদের কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র প্রশান্ত বসু। কলকাতায় কোনো হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত থাকলে এতোদিনে নিশ্চয় অনেক গালাগালি খেতেন, মন্ত্রীমশাইরাও নিশ্চয় বলতেন, এইসব ডাক্তারের জন্যেই সরকারী হাসপাতাল উচ্ছন্নে যাচ্ছে। কিন্তু বহু বছর আগে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে কানাডা পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত বসু বেঁচে গিয়েছেন—বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পেয়েছেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্য।

সাতসকালে একশ ছিয়ানব্বই রয়াল পার্ক রোডে যাবার পিছনে যিনি রয়েছেন তাঁর নাম সিতাংশু চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী রীনা। এদেশে পি-এইচ-ডি করে সিতাংশু এখন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত—বহু বই-এর খোঁজখবর রাখেন। তাঁর স্ত্রী রীনা শিক্ষিকা, যা এদেশে খুবই সম্মানিত বৃত্তি।

ভারী শান্ত স্বভাবের মানুষ এই সিতাংশু। আমাদের ছাত্রাবস্থায় এঁর পিতৃদেব দুঃখহরণ চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পদে আসীন ছিলেন। হঠাৎ আলাপ হয়ে গেলো। কথায়-কথায় সিতাংশু বললেন, "বাঙালী জাহাজ-খালাসী, বাঙালী ডাক্তার এবং বাঙালী ধর্মপ্রচারক আমাদের ঘরকুনো অপবাদ মুছে দিতে পারতো যদি আপনারা লেখক হিসেবে এদের পরিব্রাজক জীবন সম্বন্ধে আরও একটু সজাগ হতেন।"

নিউ ইয়র্ক ইউনাইটেড নেশনস-এ আমি শ্রীচিন্ময়ের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী দেখেছি। এখানেও কেউ আছেন নাকি? শুনলাম টরন্টোতেও একজন অসাধারণ বাঙালী আছেন, যদিও বাঙালী অথবা ইন্ডিয়ান সমাজের সঙ্গে তাঁর ততটা যোগাযোগ নেই।

ডাক্তার প্রশান্ত বসুও এই অধ্যাত্মবাদীর নাম শোনেননি বা তাঁকে দেখার সুযোগ পাননি।

সিতাংশুর কাছ থেকে যা জানা গেলো—এই মানুষটিকে যাঁরা এদেশে অনেক সাধ্যসাধনা করে নিয়ে এসেছেন এবং মাথায় করে রেখেছেন তাঁরা হলেন ব্রিটিশ-গায়নার প্রাক্তন অধিবাসী, সংক্ষেপে এখন যাদের গাইনিজ বলা হয়।

ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে। এক ভেতো বাঙালী কলকাতা থেকে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত করলেন ১৬০০০ মাইল দূরের দক্ষিণ আমেরিকায়। তারপর সেখানে মানুষের হৃদয়ে এমন গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করলেন যে, সেইসব মানুষ যখন আবার দেশত্যাগী হয়ে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লো তখন তারা প্রথম সুযোগেই এই বাঙালীটিকে প্রায় মহাপুরুষের সম্মান দিয়ে নিয়ে চললেন নতুন সেই দেশে। তাঁদের সবিনয় নিবেদন, "আপনি ছাড়া আমাদের কে আছে? আপনাকে ছাড়া আমরা বেঁচে থাকবো কী করে?"

এই মানুষটি দক্ষিণ আমেরিকায়, গায়নার রাজধানী জর্জ টাউনের কাছে 'কোভ অ্যান্ড জন' নামক জায়গায় একটি ইস্কুলের প্রধান ছিলেন। তারপর ইতিহাসের পাকেচক্রে এই টরন্টো শহরের এক কোণে একটি হিন্দু মন্দিরের রক্ষক এবং কয়েক সহস্র ছিন্নমূল গাইনিজ পরিবারের অধ্যাত্ম-গুরু হয়েছেন। এই মানুষটির আশীর্বাদ ছাড়া কানাডাপ্রবাসী গায়নিজরা কোনো কাজ করেন না। কোটিপতি গায়নিজও এখানে এসে এঁটো বাসন মাজতে বসে যান এবং তাঁর স্ত্রী এই মানুষটির জামাকাপড় কাচেন।

সিতাংশু বাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলেন আমি বিশেষ উৎসাহিত ও কৌতূহল বোধ করছি। বাঙালীর বিশ্বজয়ের ইতিহাস কবে লেখা হবে গো? কবে? অক্ষম আমি দুর্বল কলম নিয়ে এই পঞ্চাশোর্ধ পর্বে গভীর দুঃখ বোধ করছি, কেন যৌবনে বেপরোয়া হয়ে নিজেই এই কাজে নেমে পড়িনি? সমস্ত জীবন ধরে করবার মতন একটা কাজ হতো। অবশ্য আমার তো আর্থিক স্বাধীনতা ছিল না, প্রতিদিনের অন্ন-বস্ত্রের জন্য সারাজীবন অন্য এক বৃত্তির শৃঙ্খলে বন্দী থাকতে হয়েছে।

সিতাংশুবাবু আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করলেন না। ইচ্ছে থাকলে কী না হয়? যাঁরা এই গত অর্ধশতাব্দীতে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন করলেন তাঁরাও ছিলেন কপর্দকশূন্য।

"শুনুন শংকরবাবু, একজনের কথা—তিনি কলকাতার বউবাজারে যেখানে থাকতেন সেখানে শৌচাগার ছিল না—রাত তিনটের সময় চীনাপট্টির পাবলিক টয়লেটে লাইন দিতে হতো। লক্ষ্যস্থলে প্রবেশের পরমুহূর্তেই 'পানি গিড়াও, পানি গিড়াও' চিৎকার শুনতে হতো এবং নাহি গিড়াইলে দরজায় ধাক্কা।"

"আপনি বঙ্কিম সেনগুপ্তর নাম শুনেছেন ? পিতা হরকুমার, পৈতৃক বাটি ফরিদপুর জেলার 'নগর' গ্রামে।"

আমি শুনিনি। "শুনবেন কেন ? বাঙালীর মতন ইতিহাস অসচেতন জাত পৃথিবীতে কখনও হয়নি শংকরবাবু।"

তারপর সিতাংশুবাবু যা বললেন তাতে আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। "মাত্র চার মাস আগে হিন্দুধর্মের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে বাষট্টি বছরের কর্মময় জীবনের ইতি টেনে একাশি বছর বয়সে ১৯৮৬-র মে মাসে কলকাতায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কলকাতায় আপনারা অকাজে বড় ব্যস্ত। বাঙালীর ফুটো খুঁজতে-খুঁজতেই বড়-বড় সংবাদপত্রের সর্বশক্তি নিঃশেষ হয়। আপনারা কেমন করে অনুসন্ধান করবেন সেইসব মানুষের কীর্তিকাহিনী যাঁরা আমাদের চোখের সামনেই ভারত-সংস্কৃতির প্রচার করলেন বিশ্বময় এবং এক শতাব্দীর ব্যবধানে দিশেহারা এক মানব সমাজকে আবার সনাতন হিন্দুধর্মের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনলেন। এঁরা কাজ করেছেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং গায়নায়।"

আমি ক্রমশই তাজ্জব বনে যাচ্ছি। আমি অবশ্যই গত শতাব্দীর শেষপ্রান্তে সিমুলিয়ার নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ইদানিংকালে হুগলির এ সি ভক্তিবেদান্তর কীর্তিকাহিনী শ্রবণ করেছি। কিন্তু বঙ্কিম সেনগুপ্ত আমার সম্পূর্ণ অজানা। এপ্রিল ১৯৮৬- তে আমি কলকাতায় ছিলাম—তাঁর তিরোধানে তো কোনো হৈ-চৈ হয়নি !

সিতাংশুবাবু বললেন, "শুনুন, বিবেকানন্দ ও ভক্তিবেদান্তর মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচারে মস্ত বড় কাজ করেছে আর এক সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ যার নাম গয়ায় পূর্বপুরুষের পিন্ডি দেওয়ার সময়ে এবং বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরেই আপনাদের মনে পড়ে—আমি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কথা বলছি।"

পরপর তিনটি নাম আমি লিখে নিলাম। "যশোরের ভেরচ্চি গ্রাম এবং দৌলতপুর একাডেমির (খুলনা) প্রাক্তন ছাত্র রাজেন্দ্র যিনি সন্ন্যাস জীবনে স্বামী অদ্বৈতানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন, স্বামী পূর্ণানন্দ (বঙ্কিম সেনগুপ্ত) এবং টরন্টোতে আপনি যাঁকে দেখতে যাবেন সেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ যাঁর পূর্বাশ্রম নামটি হল শান্তিরঞ্জন দাস।"

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে যদি আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকতো তা হলে অদ্বৈতানন্দ, পূর্ণানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এতোদিনে সাধারণ বাঙালীর হৃদয়সিংহাসনে স্থান পেতেন। অনেকদিন আগেই কোনও এক বিখ্যাত বাঙালী গভীর দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন, "হায় আমরা সকলে রণজির নাম জানি, কিন্তু

রামমোহনকে ভুলিতে বসিয়াছি!" আজও আমরা পৃথিবীর কোন্ মাঠে কে কতবার একটি চর্মগোলককে লগুড়াঘাত করেছে তা কণ্ঠস্থ রেখেছি, কিন্তু বর্হিভারতের যে কয়েক কোটি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ আছেন তাদের জীবনে কে নতুনভাবে ভারতচিন্তার দীপশিখা জ্বালালো তা জানতে আগ্রহী হলাম না।

যতদূর জানা যায়, ব্যাপারটার সূত্রপাত ১৯২৮ সালে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ অনুমান করেন, প্রায় এক কোটি ভারতীয় দেশের বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি-শিল্প ইত্যাদিতে লিপ্ত। ভারত মহাসাগর অঞ্চলেই ভারতীয়ের সংখ্যা বেশি—সেখানকার ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীর তিন-চতুর্থাংশ ভারতীয়। পুরুষানুক্রমে ঐসব ভারতীয়ের বিদেশে বসবাসের ফলে তাদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে এবং তারা ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছে। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক দূতরা একসময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের মর্মবাণী প্রচার করতেন। এশিয়া ছাড়াও অন্যান্য মহাদেশেও ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্য ইত্যাদির বিস্তার ঘটেছিল। গত শতাব্দীর প্রথমভাগে সাংস্কৃতিক দূতের পরিবর্তে হাজার-হাজার ভারতবাসী শ্রমিকরূপে বিদেশে প্রেরিত হয়। পুরুষানুক্রমে বিদেশে বসবাসকারী এই ভারতীয়রা ক্রমশঃ পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য-আদর্শ ভুলতে আরম্ভ করে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দর জীবনও আমাদের এক গৌববময় কাহিনী। পূর্বাশ্রমে এঁর নাম ছিল বিনোদ ভূঁইয়া। পিতা বিষ্ণুচরণ—জন্ম ফরিদপুরের বাজিতপুরে ১৮৯৬ খ্রীঃ। ১৯১৩ খ্রীঃ গোরক্ষপুরে যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় একবার গ্রেপ্তার হন এবং পরে মুক্তি পান। ১৯২১ খ্রীঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুরোধে দুর্ভিক্ষ পীড়িত সুন্দরবনে একটি অস্থায়ী সেবাশ্রম খুলে সেবাকার্যে ব্রতী হন। ১৯২৩ খ্রীঃ এই সেবাশ্রম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নামে পরিচিত হয়। স্বামী প্রণবানন্দ ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ খ্রীঃ দেহরক্ষা করেন।

প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচারের জন্যে স্বামী প্রণবানন্দ ১৯২৯ খ্রীঃ বিদেশে দূত প্রেরণ করেন। প্রথম যাত্রার আগের দিন স্বামী অদ্বৈতানন্দ সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর শুভেচ্ছা গ্রহণ করে একাধিকবার ব্রহ্ম, মালয়, শ্যামদেশের সীমান্তে প্রচারকার্য চালান। তারপর কিছুদিন এ-কাজ বন্ধ থাকে।

১৯৪৮ খ্রীঃ দশজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়া, জাঞ্জিবার ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় যেসব

ভারতীয় পুরুষানুক্রমে বসবাস করছেন তাঁদের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ১৯৫০ খ্রীঃ দশ নভেম্বর কলকাতা ত্যাগ করেন। একবছর অপ্রতিহত গতিতে প্রচার কার্য চালিয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ব্রিটিশ গায়নায় অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সমর্থ হয় এই সাংস্কৃতিক মিশন।

আরতি, পূজা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে বিরাট শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটলো সনাতন ধর্মবিস্মৃত ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান নামধারী মানুষগুলির মধ্যে। প্রতিকূল পরিবেশে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে যাঁরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরও অনেকে পরম শ্রদ্ধা সহকারে সঙ্ঘসন্ন্যাসীদের চারপাশে জড়ো হলেন।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রচারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে অদ্বৈতানন্দ তাঁর দলের অপর সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দকে ওদেশে রেখেই কলকাতায় ফিরে এলেন।

দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ থেকে দূরে বসবাস করায় ভারত সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে গায়নার মানুষ অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ভারতীয় বেশভূষা তো বহুদিন লুপ্ত, ভাষা, রীতি রেওয়াজও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে পশ্চিমী চালচলন ও পোষাক-আশাকে সবাই অভ্যস্ত। পূর্ণানন্দ বৈদিক মন্ত্র ইত্যাদি রোমান লিপিতে লিখে মাইকের মাধ্যমে হাজার-হাজার মানুষকে মন্ত্রোচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। সন্ধ্যা সমাগমে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে ভজন, কীর্তন ও সন্ধ্যাবন্দনায় মুখর হয়ে উঠলো ত্রিনিদাদ, জর্জ টাউন ইত্যাদি অঞ্চল। শতাধিক বছর ধরে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন এই সব মানুষের মধ্যে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতির প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ গড়ে উঠলো।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের ধারণা, উপমহাদেশের বাইরে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় তিন কোটি ভারতীয় পুরুষানুক্রমে বসবাস করছেন এবং মাতৃসংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের গভীর যোগাযোগ বিশেষ প্রয়োজন।

সিতাংশুবাবুর সঙ্গে ঠিক হয়েছিল, ডাক্তার বসু আমাকে সোজা হিন্দু মন্দিরে নিয়ে যাবেন।

মন্দিরটি খুঁজে বের করতে কষ্ট হলো না। অনেকক্ষণ বেল টেপার পর যিনি অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে দোতলা থেকে নেমে এসে আমাদের দরজা খুলে দিলেন তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজীর যে কিছুদিন আগেই গুরুতর ব্রেন সার্জারি হয়েছে এবং তিনি একাই এই বিশাল বাড়িতে বসবাস করেন তা আমার জানা ছিল না।

খাঁটি বরিশালী উচ্চারণে পরম স্নেহে স্বামীজী আমাদের সাদর আহ্বান জানালেন। আমরা প্রথমে গেলাম পূজাকক্ষে। একটি বড় হলঘর, সেখানে কোনো দেবমূর্তি নেই, কিন্তু রামসীতা থেকে শুরু করে হনুমান, লক্ষ্মীনারায়ণ, শিব ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর ফ্রেমে বাঁধানো রঙিন ছবি।

"মূর্তি এরা কোথায় পাবে? এই সবই অতি কষ্টে জোগাড় করে এনে সাজিয়েছে," বললেন স্বামীজী। গুরুতর শল্য চিকিৎসার পর তাঁর কথা একটু জড়িয়ে যায়। কথা প্রসঙ্গে বললেন, "গায়নিজরা মন্দিরকেও চার্চ বলে। হিন্দু চার্চ, মুসলিম চার্চ, খ্রীষ্টান চার্চ।"

শনি-রবিবারের সকালে এলে আমি যে পূজাপার্বণ, আরাধনা, যজ্ঞ ইত্যাদি দেখতে পেতাম তা অতি সহজেই আন্দাজ করতে পারছি। উইক-এন্ডে ভক্তরা সকালেই চলে আসেন, অনেকে এখানেই প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারপর বাড়ি ফিরে যান।

সিতাংশুবাবু ইতিমধ্যেই সস্ত্রীক এসে গিয়েছেন। চুপিচুপি বললেন, "স্বামীজীকে এঁরা দেবতার মতন শ্রদ্ধা করেন।"

ইতিমধ্যে আড়ালে আরও একটু সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়েছি, যা পরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কলকাতা সদর দপ্তরে দিলীপ মহারাজের কাছ থেকে মিলিয়ে নিয়েছি। পূর্বাশ্রমের কথা বলতে সন্ন্যাসীরা কখনই আগ্রহী নন, কিন্তু মানুষের উৎস সন্ধান আমার এক প্রিয় বিষয়।

সংসারাশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম ছিল শান্তিরঞ্জন, পিতা মনোরঞ্জন দাস। আদি দেশ যে বরিশাল তা বলাই বাহুল্য। শান্তিরঞ্জন কলকাতায় ইন্ডিয়ান সেনট্রাল জুট কমিটির টেকনিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক সহকারীর কাজ করতেন। বৈরাগ্যের সূচনা বোধহয় একটু দেরিতেই, ১৯৬০ সালের শেষ দিকে ছত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কলকাতায়।

গায়নায় পূর্ণানন্দের প্রচারকার্য তখন মধ্যগগনে। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি স্থায়ী আশ্রম—ব্রিটিশ গায়না সেবাশ্রম সঙ্ঘ—প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। রেজাউল মারাজ অ্যান্ড কোং লিমিটেড-এর শ্রীমতী মেঘবরণ মারাজ জর্জটাউন থেকে আঠারো মাইল পূর্বে জন অ্যান্ড কোভ, ইস্টকোস্ট ডামারারো নামক পল্লীতে কুড়ি একর জমি দান করেছেন। এখানেই একটি মন্দির, একটি আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমে ইতিমধ্যে আটজন ত্যাগব্রতী কর্মীও শিক্ষা পাচ্ছেন, যাঁদের পরবর্তী কালে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরণ করা হবে।

পূর্ণানন্দজী তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে কুড়িটির বেশি কেন্দ্র স্থাপন করে ফেলেছেন এবং প্রতিমাসে হাজার-হাজার মাইল ভ্রমণ করে প্রায় প্রতিদিন একটি

করে ধর্মসভায় বক্তৃতা করেছেন। গায়নাতে পূর্ণানন্দকে সাহায্যের জন্য যে তরুণ সন্ন্যাসীকে প্রথম প্রেরণ করা হয় তাঁর নাম স্বামী দিব্যানন্দ। ১৯৫৮ সালে তিনি ব্রিটিশ গায়নায় উপস্থিত হন।

সিতাংশুবাবু চুপিচুপি বললেন, "আপনি এক আশ্চর্য দেশে এসেছেন। এখানে মানুষের জীবনে মজা আছে আনন্দ নেই, সুখ আছে স্বস্তি নেই। মানুষ এখানে বড় একা। যাঁরা জানতে চায় কেমন করে একা থাকতে হয়, স্বামীজী তাদের বলেন, ধ্যান করতে শেখো, পুজো করো।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইতিমধ্যে আদর করে আমাদের নিয়ে দোতলায় একটি ঘরে বসিয়েছেন। এমন স্নেহপ্রবণ মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। রামকৃষ্ণ মিশন বলুন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বলুন, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে বরাবর এমন স্নেহের প্রাবল্য দেখেছি যে আমি বুঝতে পারি না এঁরা কেমন করে সংসারের আপনজনদের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বৈরাগ্য ও স্নেহের এই আশ্চর্য সমন্বয়ই বোধহয় মানুষকে মহত্ত্বের উচ্চশিখরে পৌঁছে দেয়। পূর্ণানন্দের কথাই ধরুন। ইনি ছিলেন বিধবার একমাত্র সন্তান। (১৯২৪ খ্রীঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।) সমস্ত জীবন ধরে তিনি দেশে ও বিদেশে আর্তের সেবা করেছেন, তাদের দুঃখে দুঃখী হয়েছেন। তিনি শেষ জীবনে তাঁর এক সন্ন্যাসীভ্রাতাকে চিঠিতে প্রণবানন্দের মৃত্যু চিন্তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেনঃ "জীবন অতি ক্ষণভঙ্গুর, পিতা-মাতা আত্মীয়-পরিজনের স্নেহবন্ধন দুদিনের, সংসার অনিত্য, আত্মতত্ত্বোপলব্ধিই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য, এই লক্ষ্য সাধনেই প্রযত্ন করতে হয়।" তারপরই তিনি লিখেছেন, "মৃত্যুচিন্তা উপদেশের কী অতুলনীয় প্রভাব। পাঁচ ছয়মাস পূর্বেও যে-বিধবা গর্ভধারিণীকে মা, পায়খানায় যাই বলে পায়খানায় যেতাম, তাঁর একমাত্র মাতৃগতপ্রাণ পুত্রসন্তান আমি, সেই ক্রন্দনরতা, নিঃসম্বলা জননীকে মা মাতামহের সঙ্গে গয়াতে দেখা হয়েছে এই একলাইন লিখতেও অস্বীকার করি। মাতামহ হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকেন, আর একখানা দা আমার হাতে দিয়ে তাঁর মাথায় কোপ দিতে বলেন। প্রতিপালক মাতামহের প্রতি আপাতনিষ্ঠুর ব্যবহার বটে। কিন্তু অবিচলিত থাকি। অঙ্গীকার করেছি যে, আর ফিরে যাবো না।"

সুরসিক পূর্ণানন্দের রসিক মনের দুটি পরিচয় এইখানে দিয়ে রাখার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ১৯৮৬ খ্রীঃ মৃত্যুর আগে তাঁকে বেদানার রস খেতে দেওয়া হয়। জিজ্ঞেস করলেন, কত দাম ? দাম একটু বেশি শুনে খুব বিচলিত হয়ে উঠে বারণ করে দিলেন আর যেন ওই ফল না-আনা হয়। বললেন, "এ তো বেদানা নয়, এ হল বেদনা।"

নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশে ধর্মপ্রচারে বেরিয়ে কোনো সপ্তাহে কেবল ভাত,

কোনো সপ্তাহে কেবল রুটি, কখনো উপবাস চলেছে। অগ্নাশয়ে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ। তার বহিঃপ্রকাশ জন্ডিসে—সর্বাঙ্গ হরিদ্রাভ, কিন্তু কোনো দুর্ভাবনা নেই পূর্ণানন্দর। সঙ্গীর সঙ্গে পূর্ণানন্দ রসিকতা করলেন, "দেখ, আমি হলুদানন্দ হয়ে গেছি।"

টরেন্টো মিশনের দোতলার ঘরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইঙ্গিতে সিতাংশু গৃহিণী রীনা এবার কিছু ফল ও মিষ্টি নিয়ে এলেন আমাদের জন্যে। মহারাজ বললেন, "কত দূর সেই কলকাতা থেকে এসেছেন, খেতে হবে। আমার শরীর ঠিক থাকলে নিজেই রেঁধে খাওয়াতাম।"

আমি এবার অন্য জিনিস জানতে চাই। মহারাজ শান্তভাবে কয়েকমুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর অতীতচারণ শুরু করলেন।

ইয়র্ক রোডের হিন্দু মন্দিরের দোতলায় বসে বাষট্টি বছরের স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন, "গায়নাতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই স্বামী পূর্ণানন্দের। উনি ১৯৬৭-তে আমাকে কলকাতা থেকে জর্জটাউনে নিয়ে গেলেন।"

জর্জটাউনের আঠারো মাইল দূরে প্রাকৃতিক সুষমামন্ডিত তপোবনের শুদ্ধ পরিবেশে তখন হিন্দু কলেজটি গড়ে উঠেছে। মহারাজের কানাডিয়ান ভিজিটিং কার্ডেও লেখা হয়েছে 'প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল, হিন্দু কলেজ অ্যান্ড আশ্রম, কোভ অ্যান্ড জন, গায়না'।

নাম কলেজ হলেও, আসলে ইস্কুল। এই গুরুকুল বিদ্যালয়ে ইংরিজি, ফরাসী, ল্যাটিন ছাড়াও হিন্দি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ আমেরিকার ভারতীয় সমাজে হিন্দি ভাষার পুনঃপ্রর্বতন ও প্রচারের অসামান্য কৃতিত্ব এই পূর্ণানন্দর। তাছাড়া অন্য বিষয় হলো ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ইত্যাদি ও সেই সঙ্গে অবশ্যই অধ্যাত্মশিক্ষা।

পূর্ণানন্দ নিজেই ইস্কুল সম্বন্ধে লিখেছেন, "প্রাচীন গুরুকুলের মহান আদর্শে তরুণগণ ভারতীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। মন্দিরে কাঁসরঘন্টার নিক্কণ, পীতবাস পরিহিত আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারিগণের মধুর কণ্ঠে সমবেত প্রার্থনা-গীত, সদ্যস্নাত এবং প্রার্থনা-পবিত্র হৃদয়ে আশ্রমবালকগণের কুসুম চয়ন, প্রতিদিনের যোগাভ্যাস, সন্ন্যাসীগণের নির্জন তপস্যা, অপরাহ্নে গীতা-উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন-পাঠন, পূজা-আরতি, ভজন-কীর্তন, রামায়ণ গান, পরস্পর ভারতীয় ভাষা হিন্দীতে প্রাণখোলা মধুর আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি নিত্তনৈমিত্তিক কর্মচঞ্চলাতার ভিতর আশ্রমটিকে শুভ্রশির ঋষির পবিত্র তপোবনের উজ্জ্বল মহিমায় উদ্ভাসিত করিবে।"

দীর্ঘদিন এই বিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। আর পূর্ণানন্দ, তাঁর কথা

তো শেষ হতে চায় না। গায়নার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের তিনি নতুন সাংস্কৃতিক অনন্যতা দিয়েছিলেন ধর্মীয় আইডেনটিটির মাধ্যমে। উনিই স্থানীয় সরকারকে বোঝালেন, হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার স্বাধীনতা দিতে হবে। যেমন মৃতদেহের সৎকার। এর আগে শবদাহ সম্পর্কে কড়া বিধিনিষেধ ছিল। পিতৃ ও মাতৃদায়ের পর হিন্দুদের মস্তক মুণ্ডনের স্বাধীনতা ছিল না। এমনকি পুজো করলে চাকরি হতো না।

সিতাংশুবাবু বললেন, "গায়নার এই নতুন ধর্মীয় অনন্যতা কিন্তু কোনো লড়াকু মনোবৃত্তির জন্ম দেয়নি। যীশুখ্রীস্টকে পর্যন্ত পরম শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হয়েছে।"

যারা দেড়শ বছর ধরে দেশের নাড়ি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তারা সামান্য ক'বছরে নাটকীয়ভাবে বদলে গেলো। ভাগলপুরের অধ্যাপক ভোলানাথ মুখার্জী গায়নায় হাজির হয়ে তো অবাক। যে-বাড়িতেই যান সেখানেই হিন্দু উপাসনা সম্পর্কে একখানা ইংরিজি বই প্রায় বাইবেলের মতন যত্ন পাচ্ছে। সংকলয়িতা স্বয়ং স্বামী পূর্ণানন্দ।

স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে পূর্ণানন্দ যখন প্রথম ব্রিটিশ গায়নায় গেলেন তখন সর্বপ্রথম যাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এঁর নাম ডাক্তার জঙ্গ বাহাদুর সিং। এঁর বাবা নেপাল থেকে মজুর হয়ে ওদেশে গিয়েছিলেন। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল, ছেলে লেখাপড়া শিখুক। অতি কষ্টে স্থানীয় ইস্কুলে তিনি ছেলেকে ভর্তি করে দেন।

এই যৎসামান্য বিদ্যা ভরসা করে জঙ্গ বাহাদুর স্থানীয় এক জাহাজ কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে কয়েক বছর দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করেন। এই সূত্রে ভারতে এসে তাঁর ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে হয় এবং কোনোক্রমে কলকাতার কারমাইকেল মেডিকেলে ভর্তি হন। ডাক্তারি তকমা নিয়ে ব্রিটিশ গায়নায় ফিরে তিনি বিরাট প্র্যাকটিশ গড়ে তোলেন। দীনদুঃখীদের চিকিৎসায় তিনি পয়সাকড়ি পর্যন্ত নিতেন না। এই জঙ্গ বাহাদুরই অদ্বৈতানন্দ ও পূর্ণানন্দকে পরম আদরে কাছে টেনে নেন এবং এঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন।

ব্রিটিশ গায়নায় স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও পূর্ণানন্দের বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন দুই শিক্ষিতা নার্স। বক্তৃতা শুনে বিমোহিত হয়ে তাঁরা আলাদা আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তারপর হঠাৎ নিঃসংকোচে অদ্বৈতানন্দকে বললেন, "আচ্ছা স্বামীজী, আপনার বিবাহ করতে এতো নারাজ কেন ? আপনি না হয় বয়স্ক ও আচার্যস্থানীয়। কিন্তু আপনারা সঙ্গে যে তরুণটি রয়েছেন তাঁর চেহারা কেমন সুন্দর। আমাদের একজনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে আপনার আপত্তি কী ?" সংসারত্যাগী মহারাজদের তখন অবস্থা কী তা সহজেই আন্দাজ করতে

পারবেন। বয়োজ্যেষ্ঠ মহারাজ ভাবলেন কুশিক্ষার প্রভাবে এদেশের মেয়েরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে!

কানাডা আশ্রমে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন মনে করিয়ে দিলেন, আমেরিকা মহাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে স্বামী পূর্ণানন্দর দান অবিস্মরণীয় এই কারণে যে ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক গত শতকে চুক্তিবদ্ধ প্রথায় শ্রমিক আমদানির মাধ্যমেই প্রথম শুরু হয়নি। এই ভদ্রলোক মনে করিয়ে দিলেন, ইতিহাসের আদিকালে বৃহত্তর ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সেন্ট্রাল আমেরিকাতে বিস্তৃত হয়েছিল। সেন্ট্রাল আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারের প্রধান-প্রধান কেন্দ্র ছিল মেক্সিকো, পেরু, গুয়াতেমালা, হন্দুরাস, কলম্বিয়া, ইকোয়াদর ও বলিভিয়া।

সে-যুগে মেক্সিকোর দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল মায়াভূমি বলে খ্যাত ছিল। বহু বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাসিক পত্রিকায় এ-বিষয়ে চমৎকার এক ধারাবাহিক রচনা লিখেছিলেন শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার। কারুর-কারুর ধারণা শুধু মধ্য আমেরিকা কেন সমগ্র আমেরিকা মহাদেশেই ভারতসন্তানদের পাদস্পর্শ হয়েছিল। এঁরা স্থলপথে সাইবেরিয়া পর্যন্ত গিয়ে বেরিং প্রণালী পার হয়ে আমেরিকা মহাদেশে উপস্থিত হন।

আমি শুনলাম, মেক্সিকোতে আদিবাসীদের মধ্যে চড়কপুজা হয়—ঠিক বাংলাদেশের মতোই বাঁশের আগায় আঁকড়ার সঙ্গে ভক্তরা নিজেদের বেঁধে ঘোরাতে থাকে। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা নাকি এখনও প্রতি বৎসর রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব স্মরণে 'দশহরা' পালন করে থাকে। প্রাচীন মেক্সিকানরা নিরামিষাশী ছিল এবং অনেকে এখনও তাই। মেক্সিকানরা আজও হিন্দুদের মতো পৃথিবীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে। মেক্সিকান্ নারীদের পোষাক হিন্দু নারীদের মতন। কয়েক স্থানে নারীদের ঘোমটা দিতে ও সিঁদুর পরতেও দেখা যায়।

মেক্সিকোতে নাকি অনেক জায়গায় সংস্কৃত নাম ছিল। কয়েকটি নাম এখনও সেই পুরনো সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। যেমন মেক্সে (মঞ্চ), পালেনকে (পালঙ্ক), করোজাল (করজাল)। বিশ্বাস করুন চাই না করুন, মেক্সিকোর বিখ্যাত দুটি হ্রদের নাম, 'চপলা'।

আমরা আবার গায়না প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। স্বামীজী স্মৃতিচারণা করলেন, গায়নার রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ খারাপ হয়ে উঠলো—বেধে গেলো তথাকথিত কালা ও ভারতীয়দের মধ্যে উত্তেজনা। অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এই অবস্থায় সত্তর দশকের গোড়ায় অনেক ভারতীয় গায়নিজ আবার নতুন করে ভাগ্যসন্ধানের জন্যে বেরিয়ে পড়লেন মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অন্যান্য দেশে।

নিজের পায়ে একটু দাঁড়িয়েই এঁরা পূর্ণানন্দের প্রভাবে যা শুরু করেন তা হলো হিন্দধর্ম সাধনা। এঁরা ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠা করেছেন হিন্দু মিলন মন্দির। নিউ ইয়র্কেও মন্দিরের কথা ভাবা হচ্ছে।

টরন্টোতে নিজের পায়ে একটু দাঁড়িয়েই গায়নিজরা জর্জটাউন গিয়ে ব্রহ্মানন্দকে বললেন, "গুরুজী, আপনি আসুন আমাদের নতুন দেশে। আপনাকে আমাদের বড্ড প্রয়োজন।" উনি এলেন এবং গায়নিজরা তাঁকে মাথায় করে রেখেছে।

তত্ত্বদর্শী সিতাংশুবাবু বললেন, "বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস হলেই নিজের পরিচয়-সংকট হয়, যাকে সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন আইডেনটিটি ক্রাইসিস। বিরোধী আবহাওয়ায় এসে ছিন্নমূল গায়নিজরা নিজেদের ধর্মকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইলো।"

ছিন্নমূল গায়নিজরা খেটেখাওয়া মানুষ। স্বামীজীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করেন—ওঁরা জানেন স্বামীজী ঠকাবার মানুষ নন। তাই ওঁরা নিজেদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন ওঁর কাছে। কোনো রবিবার যদি ওঁরা মন্দিরে আসতে না পারেন তাহলে ফোন করবেন।

এঁরা কৃষ্ণ, রাম, হনুমান ও শিবের ভক্ত। স্বামীজী বলেন, "সবাইকে শ্রদ্ধা করবে, কিন্তু ইষ্টদেবতার পুজা করবে।"

স্বামীজী হচ্ছেন সমগ্র গায়নিজ সমাজের স্পিরিচুয়াল ফাদার। ব্রহ্মানন্দ বললেন, "দেশে ভিক্ষা করেছি, এখানে কারও কাছে আমি কিছু চাই না।"

মন্ত্র বোঝাবার জন্যে মাঝ-মাঝে সংস্কৃত শিক্ষার ক্লাশ হয়। রবিবারে যজ্ঞ হয় সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণে।

সিতাংশু বললেন, "একজন ভক্ত আছেন, মিস্টার মোহন—গোটা পঞ্চাশেক অ্যাপার্টমেন্টের মালিক। তাঁর স্ত্রী বলেন, 'গুরুজী' 'আমি আপনার মেয়ের মতন।' তিনি অসুস্থ স্বামীজীর জামাকাপড় কেচে দেন।"

ইংরিজিতে প্রকাশিত হয়েছে প্রার্থনা পুস্তক। প্রতি গায়নিজ ঘরে এই বই পাবেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কানাডায় এলেন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। শ'পাঁচেক পরিবার এখানে তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সনাতন হিন্দধর্মকে এঁরাই এখানে রক্ষা করছেন।

১৯৮১ সালে আশ্রম স্থাপনের জন্যে টরন্টোতে সম্পত্তি কেনা হলো। ১৯৮২-তে মন্দির উদ্বোধন হলো। স্বামীজী বললেন, "কারও কাছে এক পয়সা চাইনি। ওরাই নব্বুই হাজার ডলার দিয়ে সম্পত্তি কিনলো। ১৯৮৪ সালের মধ্যে সমস্ত দেনা শোধ করে দিয়েছে গায়নিজ ভক্তরা।"

গায়নিজ ভক্তরা বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা করতে আগ্রহী, কিন্তু এঁরা ভারতীয় ভাষা জানেন না। তাই সম্প্রতি সত্যনারায়ণের পাঁচালি ইংরিজিতে অনুবাদ করানো হয়েছে।

যোগ, তপস্যা এখন আর অজানা শব্দ নয়। কানাডিয়ানরা এখন হিন্দুধর্মের কথা শুনতে চায়, তাই টেলিভিশন প্রোগ্রামে স্বামীজীর ডাক পড়ে। একজন সায়েব বললেন, "আমরা ভোগের তুঙ্গে উঠেছিলাম, কিন্তু দেখছি তাতে আনন্দ নেই। তোমরা কী করে ওসব ত্যাগ করতে পারো?"

বহু সংস্কৃতির মিলনতীর্থ এই কানাডা। সব সংস্কৃতিরই এখানে যথেষ্ট সম্মান।

একজন হিন্দু হয়তো হঠাৎ মারা গেলেন। কাছাকাছি কোনো হিন্দু নেই—তখন অন্য কেউ যাতে পারলৌকিক কাজ সেরে দিতে পারেন তার জন্যে হ্যাণ্ডবুক তৈরি হচ্ছে।

সিতাংশু বললেন, "স্বামীজীর শরীর ভাল নয়। একদিন ফোন করতে গিয়ে লাইন এনগেজড্ পাচ্ছি—এ তো আর কলকাতার টেলিফোন নয়। চিন্তা হলো, হয় ফোনটা ঠিক মতো বসানো হয়নি, কিংবা ফোন করতে গিয়েই স্বামীজী পড়ে গিয়েছেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি যখন ছুটে এলাম মন্দিরে, তখন দেখলাম আমি ছাড়াও আরও পাঁচজন গায়নিজ গাড়ি চালিয়ে এসে গিয়েছেন, টেলিফোনে স্বামীজীকে না পেয়ে। সৌভাগ্যবশত দেখা গেলো, স্বামীজী ভাল আছেন, টেলিফোনটাই ঠিক মতন বসানো হয়নি।"

স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই। কোথায় বরিশাল, কোথায় কলকাতার সরকারী গবেষণাগার, কোথায় ব্রিটিশ গায়নার জন্য অ্যাণ্ড কোভ এবং কোথায় এই টরেন্টো। ভাগ্যের বিচিত্র স্রোতে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী কোন্ অজানা ভূখণ্ডে দুঃখী মানুষের সঙ্গী হয়েছেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছেন! অথচ এইসব মানুষের নাম পর্যন্ত আমরা জানি না।

স্বামীজীর সঙ্গে সেদিন অনেক বিষয়েই কথা হলো। বিশেষ করে যে-সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সঙ্গে তিনি জড়িত তার সম্বন্ধে।

বললেন, ছত্রিশ বছর বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের অবিরাম প্রচার করে পূর্ণানন্দ ১৯৮৬ তেই কলকাতায় ফিরেছিলেন। তার আগে দীর্ঘদিন ধরে তিনি লণ্ডনে একটি সঙ্ঘশাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতায় ফিরবার আগে তিনি টরন্টোতেও এসেছিলেন।

মার্চ মাসে ব্রহ্মানন্দও কলকাতায় গিয়েছিলেন। ফরিদপুরের বঙ্কিম সেনগুপ্ত ও বরিশালের শান্তিরঞ্জন দাসের শেষ দেখা হলো আমাদের এই কলকাতায়।

অবিশ্বাস্য মনোবল, গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস ও আজীবন সাধনায় এঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন ভারত-ভূখণ্ড থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরের এই জনপদে। ফরিদপুরের বঙ্কিমের নিত্যসঙ্গী এক কপি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—যা তিনি ১৯৪২ সালে ব্রহ্মচর্য জীবনের প্রারম্ভে উপহার পেয়েছিলেন। এর কয়েকদিন পরেই ১১ এপ্রিল ১৯৮৬, পূর্ণানন্দ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

না, সংসারবিরাগী ব্রহ্মানন্দও মৃত্যু সম্পর্কে বেশি আলোচনা করে পরিবেশ ভারাক্রান্ত করতে দিলেন না। আমি বললাম, "আপনার সাফল্যের খবর কিছু সংগ্রহ করেছি। একটা কিছু অসুবিধের কথা বলুন।"

প্রবীণ সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, "বিদেশে মাঝে-মাঝে বেশ বিপদে পড়ে যাই। কেউ-কেউ ডাক দেন, দেশে আমার বাবা মারা গিয়েছেন, পিতৃদায় উদ্ধার করুন। কিংবা ওই ধরনের কিছু। আমি বলি, আপনার প্রয়োজন পুরোহিতের, আমি হচ্ছি সন্ন্যাসী।" সন্ন্যাসী ও পুরোহিতের পার্থক্যটা এতো দূরে মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু বড্ড ছোট সমাজ, সব সময় পুরোহিত যোগাড় করাও সম্ভব হয় না, ফলে আটকে গেলে স্বামীজী দায়িত্ব নেন, তবে কোনো দক্ষিণা গ্রহণ করেন না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন, "বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক স্রোত আপনার কোনো বইয়ের পটভূমি হতে পারে। ঘুরে-ঘুরে দেখুন, অনেক অজানা খবর পাবেন যা আপনার ভাল লাগবে।"

আমিও আমার সঙ্গী ডাক্তার প্রশান্ত বসু হিন্দু মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসেছি। আমার মতোই ডাক্তার বসুও অভিভূত। এদেশে আসবার আগে তিনি বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

গাড়ি চালাতে-চালাতে তিনি বললেন, "একটা জিনিস লক্ষ্য করে মনোবল পাই। গত দুশো বছর ধরে বিদেশে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক দূতের তালিকাটা বাঙালীরা প্রায় একচেটিয়া করে রেখেছে। আমাদের ধারণা ছিল, রামমোহন থেকে শুরু করে বিবেকানন্দতে এসে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মন দিয়ে যদি খোঁজখবর করা যায় তাহলে দেখা যাবে, প্রচারব্রতে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে বাঙালীরা এখনও তুলনাহীন।" *

---

* ১৯৮৭ সালে এই লেখাটি সংবাদপত্র ধারাবাহিক প্রকাশকালে টরন্টোতে স্বামী ব্রহ্মানন্দর মৃত্যুসংবাদ পাই।

মিস্টার মুন ব্যান-এর ওখান থেকে টরণ্টো নীলাদ্রি-নিবাসে মিছরিদার টেলিফোন এলো।

মিছরিদার কণ্ঠে উদ্বেগ, "তোর সম্বন্ধে খুব খারাপ রিপোর্ট পাচ্ছি! বিদেশে এসে অধঃপতন ফর এ কাসুন্দিয়ান বয়—আমার পক্ষে এটা মেনে নেওয়া খুউব শক্ত!"

"মিছরিদা! আমি কাসুন্দিয়ান, কিন্তু বয় নই। আমার ফিফটি টু নট আউট চলেছে—এই ডিসেম্বরে তিপান্ন, যদি ভগবান একটু উদার মনোভাব দেখান।"

"দ্যাখ, যারা বয়সে জুনিয়র তারা চিরকালই আমার কাছে 'বয়' থেকে যাবে, এমনকি সেঞ্চুরি করলেও! আর অধঃপতন! এই ফিফটি-প্লাস বয়সটাই' ডেনজারাস যে-কোনো স্খলনের পক্ষে—মানুষ এই সময় 'গিয়ার' পাল্টাবার জন্য ছটফট করে। তুই চলে আয় টরণ্টো ডাউন টাউনে, সাক্ষাতে সব আলোচনা হবে।"

'ডাউন' বলতে আমাদের দেশে অধঃপতিত এবং পরাজিত এমন একটা ছবি ভেসে ওঠে, আর উত্তর আমেরিকা মহাদেশে ডাউন টাউন মানেই একনম্বর জায়গা, ব্যবসা-বাণিজ্য আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রভূমি। মিছরিদা আমেরিকান কথাগুলো খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করেছেন।

ইউনিয়নভিল থেকে ছুটলাম ডাউন টাউনে। মিছরিদার নির্দেশ অমান্য করার মতন দুঃসাহস এখনও আমার হয়নি। নীলাদ্রির স্ত্রী রাণুকে বললাম, "তোমরা অনাবাসী ভারতীয়রা তো দু'সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ আমাকে রক্ষে করবে, আদরযত্ন করবে, তারপর আমি তো ব্যাক টু বাজে শিবপুর, শিবপুর অ্যান্ড কাসুন্দিয়া। ওখানকার বাসিন্দারা শরৎ চাটুজ্যেকে পর্যন্ত মাথায় তোলেননি, আমি তো কোন্ ছার। তখন এই মিছরিদা, পটলদা, ছেঁচোদাই তো আমার একমাত্র ভরসা।"

নীলাদ্রি তার গাড়িতে আমাকে যথাস্থানে ছেড়ে দিয়ে গেলো। নির্ধারিত সময়ে আবার তুলে নেবে। আমি দূর থেকে মিছরিদাকে আবিষ্কার করলাম, তিনি একমনে টরণ্টোর জনস্রোত দেখে চলেছেন।

মিছরিদাও কবিতা আওড়াচ্ছেন: "কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা!"

মিছরিদা জানতে চাইলেন, "হ্যাঁরে, রবিঠাকুর এই লাইনগুলো কী কানাডা ভ্রমণের পরে লিখেছিলেন?"

"কী যা তা মন্তব্য করছেন, মিছরিদা! এগুলো ভারততীর্থ কবিতার লাইন—ইস্কুলে ঠিক মতন ব্যাখ্যা না করতে পেরে একবার মৃগেনবাবুর বকুনি খেয়েছিলাম!"

মিছরিদা ঠোঁট উল্টোলেন। "আমি তোকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ভারতবর্ষের অতীতে এইসব কাণ্ডফাণ্ড ঘটেছিল হয়তো। কিন্তু লাস্ট থ্রি হানড্রেড ইয়ার্স হাজার কয়েক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাড়া কিছুই তো ভারতবর্ষের নতুন অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। বরং ভারততীর্থের জল উপচে আফ্রিকায়, ইউরোপে, আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাকিয়ে দ্যাখ, এই কানাডা দেশের দিকে, কোথা থেকে মানুষ এখানে জড়ো হয়নি? তুই স্রেফ এই টরন্টো শহরেই একটা জীবন কাটিয়ে পৃথিবীর সব জাতের মানুষের বৈচিত্র্য সম্পর্কে উপাদান সংগ্রহ করতে পারিস। এমন কি ইন্ডিয়া সম্বন্ধেও।"

"প্লিজ, মিছরিদা, আড়াইখানা কলকাতায় যত লোক আছে সমস্ত কানাডা দেশটায় তত লোক নেই। সুতরাং ইন্ডিয়ার ব্যাপারটা এখানে তুলবেন না।"

"আলবৎ তুলবো।" জেদ ধরলেন মিছরিদা, "তুই একটা কমন পরিবেশে গুজরাতী, তামিল, পাঞ্জাবী, বাঙালী এটসেটেরা, কিংবা হিন্দু, মুসলমান, শিখ এটসেটেরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করতে চাস, তা হলে এই টরন্টোই হলো তোর মহাতীর্থ—নট্ ইওর ক্যালকাটা, বোম্বাই অর ম্যাড্রাস। তারপর, তুই গোটা ইন্ডিয়ান জাতটার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য জাতগুলোর বিচার-বিবেচনা করতে চাস, তা হলেও টরন্টো হলো তোর সোনার খনি। ওরে কতবার তোদের বলবো, কূপমণ্ডুকতা ছেড়ে বাঙালী লেখকরা একটু দৃষ্টি প্রসারিত করুক! তখন তো এরোপ্লেনের এতো রমরমা ছিল না। তবু রবিঠাকুর চান্স পেলেই ফুড়ুক করে বেরিয়ে পড়তেন সাগরপারের মানুষদের দেখতে।"

মিছরিদা এই ক'সপ্তাহে দোর্দণ্ড বিশ্বপ্রেমিক এবং বিশ্বভ্রমণকারী হয়ে উঠেছেন। আরও ফাইভ হানড্রেড ডলার প্রণামী পেয়েছেন গোটা চারেক ছেলের গলায় পৈতে ঝুলিয়ে। "বলতে গেলে, আমিও হিন্দুধর্মের প্রচারকার্য চালাচ্ছি এখানে! পয়সার অভাব নেই। চল্ একটু কফি পান করা যাক। গোমাংসখাদকদের দেশের এক সিকিআনিও আমি কাসুন্দেতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না।"

কফিশপে বসে মিছরিদা বললেন, "এক নম্বর পয়েন্ট, তুই যদি একটা জাত স্থানচ্যুত হয়েও কীভাবে ঝটপট দাঁড়িয়ে পড়তে পারে তা নিজের চোখে দেখতে চাস তাহলে এই টরন্টোতে সপ্তাহ তিনেক থেকে চাইনীজদের সম্বন্ধে একখানা বই লিখে ফেল। এরা এই মুহূর্তে আসছে হংকং থেকে—হংকং-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এদের মনে যথেষ্ট উদ্বেগ। তাই কিছু একটা বিষয়সম্পত্তি বা ব্যবসার জন্যে এরা কানাডার দিকে তাকাচ্ছে। বাড়ির দালালদের এখন মচ্ছব! যে

সম্পত্তির দাম ছিল এক লাখ কানাডিয়ান ডলার, তাই এক বছরে দু'লাখ হচ্ছে। জানাশোনা দু'একটি বঙ্গপুঙ্গবও এ-লাইনে কেনাবেচা করিয়ে টু-পাইস করছে। দালালরা এখানে ক্রেতার কাছে পায় তিন পারসেণ্ট এবং বিক্রেতার কাছ থেকেও তিন পারসেণ্ট। দুটো পার্টিই যদি তোমার হয়, তা হলে সোনায় সোহাগা!"

"তুই কী নিবি? পপ?" মিছরিদা রীতিমতো উত্তর আমেরিকান ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

আমি ভেবেছি পপকর্ণ অথবা ভুট্টার খইয়ের কথা বলছেন মিছরিদা।

"মিছরিদা, ভুট্টার খই খাবার জন্যে হাওড়া-কাসুন্দের ছেলেরা এতো কষ্ট করে ফরেনে আসে না!"

"ওরে হতভাগা, তুই ফিরে গিয়ে এদেশ সম্বন্ধে কী করে লিখবি? এখানকার কোনো জিনিস তো তোর মাথায় ঢুকছে না।"

"ঢুকেছে মিছরিদা, কিন্তু থাকছে না!"

"ওই হলো। শোন্, কোনো হোস্ট যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি পপ নেবে কি না, তার মানে তুমি কোনো সফ্‌ট ড্রিঙ্ক নেবে কি না। মদ খাওয়াবার ইচ্ছে হলে বলবে 'বুজ'। খবরদার! আমাদের বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছেলে তুই, যস্মিন দেশে যদাচার এই ধুয়ো তুলে 'বুজ' করে বসেছিস এখবর যেন আমার কানে না আসে।"

আমি বললাম, "দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি, মিছরিদা। ভয় হয় নিজের স্টিয়ারিং-এর তার ছিঁড়ে গিয়েছে—কিছুতেই নিজেকে ইচ্ছেমতো চালাতে পারছি না অদ্ভুত এই দেশে। গাড়িতে এরা লিখে রেখেছে 'ট্যাক্সি', কিন্তু মুখে বলবে 'ক্যাব'। লেখা আছে 'পুলিস' কিন্তু বলবে 'কপ্‌স'।"

মিছরিদা ডাইরি বের করলেন। "লিখে নে। বই ছাপিয়ে নাম করবি তুই, আর খবর জোগাড় করে মরছি আমি। আমাদের হাওড়ার ছেলে না হলে কোন্ ব্যাটা তোকে দেখতো!"

মিছরিদা বললেন, "এখানে চাবিও উল্টো। খুললে বন্ধ হয়! বন্ধ করলে খোলে! এখানকার ফ্রিজ-এর দরজার হ্যাণ্ডেল ডানদিকে। এখানে আলোর সুইচ জ্বালালে নেভে, নেভালে জ্বলে। এখানে তরল পেট্রোলের বায়বীয় নাম হচ্ছে 'গ্যাস'! এখানে লিফ্‌ট-এর নাম 'এলিভেটর'। পেচ্ছাপের জায়গার নাম 'ওয়াশরুম'। কত চেষ্টা করে শিখে এসেছিলাম, 'ছোট বাইরে' যেতে হলে বলতে হবে 'টয়লেট'—কিন্তু কাজে লাগলো না।"

মিছরিদা মনের আনন্দে বললেন, "এই যে তোকে জিজ্ঞেস করলাম 'পপ' খাবি কি না, তার উত্তর তুই কি দিবি আমার জানা আছে। তুই বলবি, 'পেট চুঁইচুঁই করছে। পপ ছাড়া আর কী খাওয়াবেন?' তোর অবস্থা দেখে মায়া হচ্ছে! পকেটে ক'টা ডলার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিস বিশ্বদর্শনে। এখানে লেখক-

ফেখক ঐ ভেক ছেড়ে পৈতৃক পেশা পুরুতগিরির পরিচয় দে—ভাল পশার জমিয়ে ফেলবি এবং কিছু বাড়তি আয়ও হয়ে যাবে।"

"তা যা বলছিলাম, কোনো সায়েব যদি জিজ্ঞেস করে পপ খাবি কি না, তাহলে তোর উত্তর হবে—আই ডোণ্ট কেয়ার !"

"সর্বনাশ ! তেষ্টায় যখন গলাটা গোবি মরুভূমি হয়ে উঠেছে—সেই সময় 'আমি পরোয়া করি না' বলবার মতন মনোবল আমার কিছুতেই থাকবে না, মিছরিদা।"

"ওরে হতভাগা, ওর মানে তুই পপ খাবি না, তা মোটেই নয়। এটা ভদ্রতা। এর মানে হলো, 'তুমি দিতেও পারো, না-ও-পারো !' ভদ্রতা শেখ একটু—বিদেশে এসেছিস, দুনিয়ার সেরা জিনিসটা আহরণ করে হাওড়া-শিবপুরে ফিরে যা !"

"মিছরিদা, যুগ যুগ জিও !" ভাল সাইজের খাবার অর্ডার দিয়েছেন আমাকে জিজ্ঞেস না করেই।

তারপর বললেন, "খা ভাল করে। অপর্যাপ্ত খাবারের দেশ। দুনিয়ার লোককে খাওয়ানোর মতন গম তৈরি করছে ক'টা মানুষ মিলে। আমার মনটা কিন্তু ভাল নয়, শংকর। মুন ব্যান-এর মেয়েটা 'অ্যানেরোক্সিয়া নার্ভোসা'য় ভুগছে। শরীরটা যা হয়ে গিয়েছে।"

গুরুতর রোগ নিশ্চয়। "ক্যানসার-ট্যানসার এর উত্তর আমেরিকান নাম নাকি ?" আমি অতি সাবধানে প্রশ্ন করি।

"নারে। প্রাচুর্যের দেশে এই রোগ হয়। তুই-আমি ছোটবেলা থেকে খাবো-খাবো করে হ্যাংলামির বদনাম কুড়োই, আর তেরো বছরের মেয়ে এখানে না-খেয়ে না-খেয়ে এই রোগের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে। রোগা হয়ে যাবার প্রচেষ্টায় এবং সিলম থাকার অদম্য ইচ্ছা থেকে এই মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয়—তখন খাবার দেখলেই গা গুলোতে আরম্ভ করে।"

"না আমি কোনো নার্ভোসা রোগের খপ্পরে পড়তে চাই না এই বিদেশে। তাতে দু'তিন সপ্তাহে দু'তিন কেজি গুরুত্ব বৃদ্ধি হয় হবে !"

মিছরিদা বললেন, "কাল থেকে তোর সম্বন্ধে আমার খুব চিন্তা। যতবার ফোন করি ততবার শুনি কোথাকার কোন স্বামীজীর সন্ধানে বেরিয়েছিস।"

"কোথাকার কোন নয়, একেবারে আমাদের নিজেদের লোক, স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এককালে বরিশালে ছিলেন, তারপর স্থায়ী ঠিকানা, কেয়ার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা।"

সন্তুষ্ট হলেন না মিছরিদা। তাঁর তাৎক্ষণিক মন্তব্য, "তোর ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝে উঠতে পারি না। বছর দশেক বিবেকানন্দ ইস্কুলের তাঁবে থেকেও

তোর মধ্যে ভক্তিভাব জাগরিত হলো না। দেশে যখন থাকিস তখন তো বেলুড়মঠে, নরেন্দ্রপুরে, গোলপার্কে, রহড়ায়, রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে যাবার জন্যে কোনো ছটফটানি দেখি না। আর বিদেশে এসে সাধু-সন্তদের পিছনে ছুটে বেড়ানোর কোনো মানে হয়?"

মিছরিদার কিনে দেওয়া মিষ্টি 'পপ' এখনও আমার সামনে রয়েছে। আমার পক্ষে শর্করা-হারামি করা কোনোপ্রকারেই সম্ভব নয়। তাই চুপ করে রইলাম।

মিছরিদা বললেন, "ভোগের এই দেশে সাধুসন্ন্যাসীরা যতই চেষ্টা করুন তেমন সুবিধে করতে পারবেন না। তা ছাড়া প্রভু যীশুর প্র্যাকটিশ এখানে প্রবল—অন্য কেউ দাঁত ফোটাতে চেষ্টা করলে তাঁর দাঁতটাই ভাঙবে।"

আমি বললাম, "সবে পড়ে এসেছি লিলিয়ান স্মার্ট-এর 'মানবজাতির ধর্মীয় অভিজ্ঞতা' নামক ইংরিজি বই। উনি বলছেন, হিন্দুত্বের মধ্যেই সব ধর্মের মিলনসম্ভাবনার স্বীকৃতি রয়েছে—যত মত তত পথ কথাটা সাচ্চা হিন্দুর কাছে নিছক স্লোগান নয়। শত-শত বছর ধরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে এমন এক জীবনযাত্রার সম্ভাবনা হিন্দুত্বের মধ্যে রয়েছে যে সব ধর্মই বিনা সংঘাতে বিকশিত হতে পারে।"

মিছরিদা খুব খুশি হলেন না। বললেন, "বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ভক্তিবেদান্ত থেকে আরম্ভ করে পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত সবাই যে কাজ করতে চেয়েছেন, সেখানে বেদ, উপনিষদ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বাল্মিকী রামায়ণ, মহাভারত তাঁদের শক্তি জোগাবেন। তোর সাহায্য ওঁদের কোনো কাজে লাগবে না। তুই বাছাধন পুজো-আচ্চা সাধন-ভজনে জড়িয়ে না-পড়ে বিত্তসাধক বাঙ্গালীর পায়ের কাছে পুষ্পাঞ্জলি দে। সেটাই হবে এ-যুগের বাঙালীর জন্যে তোর সবচেয়ে বড় কাজ।"

মিছরিদা এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "আমি এখানে এসে যে-বিজনেসম্যানেরই খবর পাই সে হয় গুজরাতী না হয় সিন্ধী, না হয় গাইনিজ। শুনলাম একখানা বাঙালী দোকান আছে, গিয়ে দেখি সে-দোকান উঠে গিয়েছে। তারপর খবর পেলাম, এক বঙ্গসন্তান হাঁস-মুরগী পালন করে টু-পাইস কামাচ্ছে। তাতে আমার মন ভরছিল না। তারপর ভগবানের আশীর্বাদে গোরা আদিত্যর খবর পেয়ে কাল থেকেই তোর জন্যে ছটফট করছি। সব তীর্থ পর্যটন বন্ধ রেখে তুই এখনই গোরাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ কর।"

"তথাস্তু মিছরিদা।"

জয় মিছরিদার জয়! গোরা আদিত্য সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছুটা ওয়াকিবহাল করেছেন। তারপর আমি নিজে অনেক খবরাখবর নিয়েছি এবং সবার শেষে আমি গোরা আদিত্যর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় হাজির হয়ে তাঁকে সপরিবারে দর্শন করেছি।

কানাডায় নাম করবার মতন বাঙালী ব্যবসায়ী বলতে যে গোরা আদিত্যকেই বোঝায় তা সহজেই বলা যায়।

মেড-কেম ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড নামে বিরাট এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের খোদ প্রেসিডেন্টসায়েব এই গোরা আদিত্য—যাঁর অধীনে কয়েক ডজন ডাক্তার ও শ'চারেক কানাডিয়ান সায়েব কাজ করেন। টরন্টোর এজিনকোর্টে ৪৫০০ নম্বর শেপার্ড অ্যাভেনিউতে ৫৫,০০০ স্কোয়ার ফুট জায়গা জুড়ে তাঁর বিরাট পরীক্ষাগারের সদর দপ্তর দেখলে বঙ্গসন্তান হিসেবে চক্ষু চড়কগাছ হতে বাধ্য। এই কেন্দ্রটিতেই যা যন্ত্রপাতি আছে তার দাম অন্তত কুড়ি কোটি টাকা।

আরও একটু বিবরণ প্রয়োজন? তা হলে শুনুন, গোরাবাবুর কোম্পানিতে বাইশখানা শোফার চালিত এয়ারকণ্ডিশন্ড গাড়ি আছে, যার প্রত্যেকটিতে একখানা ফ্রিজ পাবেন। এই গাড়িগুলি দিনে ১০,০০০ মাইল ঘুরে বেড়ায় কোম্পানির কাজে।

বিশাল সদর দপ্তর ছাড়াও টরন্টো শহর জুড়ে গোটা পঞ্চাশেক শাখা আছে মেডকেম ল্যাবরেটরিজ-এর। বায়োকেমিস্ট্র হেমাটোলজি, প্যারাসাইটোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সাইটোলজি, কার্ডিওলজি, রেডিওইমিউনোঅ্যাসে থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইত্যাদি নানা বিভাগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে এই কোম্পানি টরন্টোর এক নম্বর প্রতিষ্ঠান হবার গৌরব অর্জন করেছে। এহেন কেম্পানির বার্ষিক আয় যে পঁচিশ-তিরিশ কোটি টাকা হবে তাতে আশ্চর্যের কী?

গোরাবাবুর কোম্পানির চারশ কর্মীর মধ্যে বেশ কিছু পি-এইচ-ডিও আছেন। যেমন রডনি এলিস, ইনি বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান ও কোম্পানির ভাইস-প্রেসিডেন্ট। আর একজন হলেন স্ট্যান কুপার। ইনি কোম্পানির অপারেশনস্ ম্যানেজার।

বাঘা-বাঘা বিশেষজ্ঞের এই কোম্পানির শিখরে যিনি সগৌরবে শোভা পাচ্ছেন, সেই গোরা আদিত্যর ভিজিটিং কার্ডে যে শিক্ষাগত যোগ্যতাটুকু

ঘোষিত হচ্ছে তা কেবল বি-এসসি। এই ডিগ্রির উৎপত্তি কলকাতার স্কট লেনের বঙ্গবাসী কলেজে, 'বৈঠকখানা বাজার বিদ্যালয়' বলে উন্নত-নাসিকা সারস্বত সমাজে যার সম্বন্ধে রঙ্গরসিকতার শেষ নেই।

নামেও গোরা, গাত্রবর্ণও গোরা। "আদিত্য বরণং বললেও কোনো ভুল হয় না, চুয়াল্লিশ বছর বয়সের এই ভদ্রলোককে। কিন্তু ছেলের গায়ের রং দেখে বাবা এ-নাম রাখেননি, তোকে আমি সাবধান করে দিলাম," বলেছিলেন মিছরিদা।

আমার মুখে সে-কথা শুনে গোরা আদিত্য খুব হাসতে লাগলেন। ওঁর বাড়ির পিছন দিকে সুইমিং পুলের ধারে বসে আমরা গল্পগুজব করছি। অদূরে রয়েছেন গোরা-গৃহিণী।

দুর্জয় প্রাণশক্তি সত্ত্বেও গোরা মানুষটি ভীষণ শান্ত, অত্যন্ত বিনয়ী। কোথায় যেন দূর বাংলা সম্পর্কে গভীর ভালবাসা রয়ে গিয়েছে।

এই হাসির আগে গোরা আদিত্য কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের কথা তুললেন। "ওঁর ছেলে মনসিজ আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমার লেখাপড়া হয়নি, মনসিজের হয়েছে—ও এখন ইংরিজির অধ্যাপক। গড়িয়াহাট ব্রিজের ওখানে থাকে," বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন গোরা আদিত্য। দেখলাম মনটা এখনও ভেতো বাঙালীর মতনই রয়ে গিয়েছে। বললেন, "জানেন, মনসিজ প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হতো আমাদের ইস্কুলে।" মনসিজের সঙ্গে এখনও যে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে তার জন্যে গোরা আদিত্যর বেশ গর্ব।

নামকরণ-রহস্যে কিছুটা আলোকপাত হলো এবার। "গায়ের রং-ফং কিছু নয়। বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) গোরাবাজারে জন্ম, তাই নাম রাখা হয়েছিল গোরা", গোরা আদিত্য তাঁর চৌত্রিশ নম্বর কোব্‌লস্টোন ড্রাইভ থর্নহিলের প্রাসাদে বসেই আমাকে এ কথা বললেন।

এ-বিষয়ে মিছরিদার সঙ্গে পরে আমি আলোচনা করেছি। মিছরিদা বললেন, "একঘেয়ে সাক্ষাৎকারের মধ্যে যাস না। বাঙালী বেঁকে বসলে বা রুখে দাঁড়ালে কী হতে পারে তা তোকে যুব-সমাজের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। সুতরাং ব্যাপারটা তোকে গল্পের স্টাইলে এবং কিছুটা নাটকের ভঙ্গিতে রসিয়ে লিখতে হবে। না হলে বাঙালী জাতের মাথায় ব্যাপারটা ঠিক ঢুকবে না। হাজার জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে বাঙালীর মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে—ওঠো, জাগো, নিজের জায়গা নিজে খুঁজে নাও, এই সামান্য বাণীটাও তার মাথায় ঢোকাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে!"

তা হলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে!

এক যে ছিল দেশ, তার নাম বাংলা। সেই বাংলা যা একদিন সোনার বাংলা

ছিল, এখন পোড়া বাংলা। সেই বাংলায়, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর থেকে মাইল কুড়ি দূরে পাটকেবাড়িতে (সর্বাঙ্গপুর গ্রামে) এক বাঙালী ভদ্রলোকের জন্ম। পুলিশের অতি সামান্য চাকরিতে ঢুকে সুহাসকুমার আদিত্য মহাশয় যথাসময়ে দারোগাবাবু হয়েছিলেন। দারোগাবাবুর স্ত্রীর নাম সুবর্ণপ্রভা। এঁদের সাতটি সন্তান—চারটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। দেশ ভাগ হবার সময় সুহাসবাবুর পোস্টিং ছিল খুলনা বাগেরহাটে মোড়লগঞ্জে। সাতচল্লিশ সালে দারোগাবাবু সংসার বদলি করলেন কলকাতার শখের বাজারে—নিজে ঘুরে বেড়ান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মহকুমায়।

এই দারোগাবাবুর ছেলে মনে করুন ভর্তি হলো বড়িশা হাই ইস্কুলে। পড়াশোনায় মোটেই ভাল নয় এই ছেলেটি। ১৯৫৫ সালে কোনো রকমে স্কুল ফাইনাল পাশ করলো। তারপর বাঙালীর একটাই কাজ থাকে—কলেজে পড়া। প্রথমে বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে। তারপর চারুচন্দ্র কলেজে। অবশেষে বঙ্গবাসী কলেজে। মধ্যিখানে একবার বোধহয় ফেলও করেছিল। তারপর কোনোক্রমে বি-এসসি। গুণের মধ্যে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং সাইকেল চালানোয় দক্ষতা।

এই সময় চাকরি খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু কোথায় চাকরি ? সেই সময় পিতৃদেব বনগ্রামে দারোগাগিরি করছেন। ছেলেটির ছোড়দা একদিন বেকার ভাইয়ের ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে সাফ বলে দিলেন, "গোরা, এখানে থাকতে হলে সংসারে টাকা দিতে হবে—না হলে বেরোও।" এটা ১৯৬১ সালের কথা।

কত বেকার বাঙালী প্রতিদিন সংসারে এই কথা শুনছে, কিন্তু কিছুই ফল হয় না। অভিমানী বাঙালী হলে চোখের জল, না-হয় আত্মহত্যা। কিন্তু ওসব ছেঁদো বিবরণ দেবার জন্যে আমি তো এই কাহিনী লিখতে বসিনি।

তার পরের দৃশ্যটা হচ্ছে এইরকম। গোরা মনে মনে বলছে, দাদা আমার মহা উপকার করেছে। বড়িশার ছোট্ট বাড়ি থেকে বহিষ্কারের নোটিশ দিয়ে 'লিখে দিল বিশ্ব নিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে'!

তখন জার্মানি যাওয়ার রেওয়াজ উঠেছে। বালিগঞ্জে এক ভদ্রলোক জার্মান ভাষায় চাকরির অ্যাপ্লিকেশন লিখতেন। গোটা কয়েক কোম্পানীর ঠিকানা নিয়ে তাঁরই শরণাপন্ন হলো ছেলেটি। ভাগ্যক্রমে জার্মানিতে একটা কেমিক্যাল ওষুধ কোম্পানিতে শিক্ষানবিশীর কাজ জুটে গেলো। কিন্তু কাজ জুটলেও বিদেশে যাবার জাহাজভাড়া প্রয়োজন। এ টাকা কোথা থেকে আসবে। গোরাবাবুর বড় ভাইয়ের তখন সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। নতুন বউদির নাম সন্ধ্যা। অনেকটা শরৎচন্দ্রের আঁকা বউদির মতন। গোপনে দেবরকে বললেন, "আমার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন গয়না নিয়ে কী করবো ? তুমি বরং এক-আধটা বেচে

দিয়ে পথের খরচটা জোগাড় করে নাও।"

ইচ্ছে না থাকলেও গোরা তাই করলো। বউদির গয়না-বেচা টাকা সম্বল করে যাত্রা শুরু হলো অজানা দেশের সন্ধানে। গোরা সেই যে ভাগ্যসন্ধানে বের হলো আর পিছিয়ে-পড়া নেই। শোনা যায়, জার্মান ভাষায় অ্যাপ্লিকেশন-লেখককে গোরাবাবু এখনও নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করেন।

গোরাবাবুর বন্ধু মনসিজ বলেন, "জার্মানিতে গিয়েই ওর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো—জার্মান নিয়মানুবর্তিতা বলতে যা বোঝায়, তাই ঢুকে গেলো ওর রক্তে।"

আর গোরাবাবু বলেন, "ওখানে এমন নেশা ধরে গেলো যে, দিনরাত কাজ করতাম। রাত-কলেজে কেমিস্ট হিসেবেও পড়াশোনা আরম্ভ করলাম।"

চার বছর কাজকর্মের পরে গোরার ইচ্ছে হলো দেশে ফিরে যাবার। "ফিরবার আগে লোভ হলো একবার কানাডা বেড়িয়ে যাই—স্রেফ কয়েকদিনের জন্যে।"

পকেটে মাত্র আশি ডলার এবং স্রেফ একটা ব্রীফ কেস নিয়ে ১৯৬৪ তে কানাডায় আগমন। প্রথমে বরফটরফ দেখে মনের মধ্যে দ্বিধা।

"এখানে এসে খেয়ালের বশে একটা হাসপাতালে ফোন করলাম চাকরির খোঁজে। ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ানের অভিজ্ঞতা আছে জেনে, ওঁরা তখনি আসতে বললেন এবং পরের দিন চাকরি হয়ে গেলো।"

হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল বিভাগে গোরার কাজ তখন টেস্টটিউব ধোয়া, ট্রে সাজানো। এরই মধ্যে বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন গোরাবাবু। চাকরিতেও সামান্য একটু উন্নতি হয়েছে, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম।

এই সময় একদিন ফিলিস গিদিয়ন-এর সঙ্গে আলাপ। এঁর বাবা দিল্লীতে ইস্কুলের মাস্টার। ১৯৬৫তে বিয়ে এবং নতুন সংসারের দায়িত্ব মানতে গিয়ে ডবল শিফটে কাজ। গোরা বললেন, "সমস্ত রাত কাজ করে অনেক সময় হাসপাতালের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়তাম।"

কয়েক বছর পরে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলেন। গর্ভে যমজ সন্তানের ইঙ্গিত রয়েছে। "অনেক টেস্ট করাতে হতো, তার খরচ জোগাতে হাড়ে-হাড়ে কষ্ট পেতাম।"

১৯৬৯-এ একদিন এক ডাক্তারের কাছে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছেন গোরা আদিত্য। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রীকে, 'স্বামী কী করেন ?' স্ত্রী বললেন "গোরা এখন সানিব্রুক হাসপাতালে বায়োকেমিস্টের কাজ করে। বেচারার স্বপ্ন আছে চাকরি না করে নিজে কিছু করার, কিন্তু সুযোগ পায় না। এখন খরচাপাতি বাড়বে, অনেক চিন্তা ওর।"

মতন মানসিকতা আমার আছে। যে-কাজে একবার নেমেছি সেখান থেকে আমি হেরে পালিয়ে আসতে রাজি নই। পেঁচোয়া নোংরা বুদ্ধি না থাকলে ব্যবসায় ভাল করা যায় না, তা আমি বিশ্বাস করি না। সৎভাবে, সোজাসুজি পথে মানুষকে বিশ্বাস করে এখনও পর্যন্ত আমার লোকসান হয়নি।"

স্ত্রী ফিলিস যমজপুত্র পিটার ও পল এবং ন'বছরের কন্যা জেনিফারকে নিয়ে গোরা আদিত্যর সুখের সংসার। গোরাবাবু এখনও বছরে একবার কলকাতায় বেড়াতে আসেন। ওঁর বাড়ির কাছাকাছি ঠাকুরপুকুর ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্রে তিনি পঁচিশ তিরিশ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি দান করছেন, ওখানকার কর্মীদের নিজের খরচে কানাডায় আনিয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষা দিয়েছেন।

গোরাবাবু বললেন, "কলকারখানা তৈরি করতে অনেক টাকা লাগে। কিন্তু নানা ধরনের সার্ভিস ইনডাস্ট্রি আছে যা চালাতে অনেক কম টাকা লাগে। সেই সব দিকে যাওয়াটাই বোধ হয় স্বল্পবিত্ত বাঙালীদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। আমার তো মনে হয় প্রত্যেক মানুষেরই একটা উচ্চাশা থাকা দরকার। সেই স্বপ্ন অনুযায়ী নিজের কর্মধারা ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন এবং তারপরে লেগে থাকো, লেগে থাকো। কারও দয়া ভিক্ষা না-করে খেটে যাও, খেটে যাও। কঠিন পরিশ্রমে শরীরের বা মনের যে কোনো ক্ষতি হয় না তা আমি নিজের জীবন থেকে বলতে পারি।"

জীবনের এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে এমন বিপুল বিক্রমে এগিয়ে যাবার মন্ত্র কোথা থেকে পেয়েছেন জিজ্ঞেস করাতে গোরাবাবু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "যে-সব সাধারণ উপদেশ লোকমুখে নিত্য প্রচারিত হচ্ছে তাই তো যথেষ্ট। যেমন ধরুন, 'যা আজকে করা যায় তা কালকের জন্যে ফেলে রেখো না'। এই উপদেশ আমি প্রতিদিন মেনে চলার চেষ্টা করি। তারপর ধরুন, 'সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়'। যথা সময়ে কাজ করে আমি অনেক ফোঁড় বাঁচাতে পেরেছি। তারপর মনে করুন, 'রোম শহর একদিনে তৈরি হয়নি' বড় কিছু কাজে হাত দিয়ে রাতারাতি কেল্লা ফতের চেষ্টা আমি করি না।"

শেষ সাক্ষাতের পর মেড-কেম ল্যাবরেটরির সদর দপ্তর থেকে বেড়িয়ে গোরা আদিত্য আমাকে যখন গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমাদের দেশ, বিশেষ করে কলকাতায় এমন একটা বিস্ময়কর ল্যাবরেটরি গড়ে তুলবেন না?"

বহরমপুর গোরাবাজারের গোরা আদিত্য এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। ওঁর গলা ভিজে উঠলো। তারপর বললেন, "আমাদের দেশের মানুষ যে কত গরিব তা আমার অজানা নয়, শংকরবাবু। কোনো পরীক্ষা করে তাদের কাছ থেকে

আমি কিছুতেই পয়সা চাইতে পারবো না। আমি বিনা পয়সায় যতটুকু সেবা করতে পারবো ততটুকুই করবো দেশের জন্যে।"

গোরা আদিত্যর জীবনকথা আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা পড়েছে জেনে খুশি হলেন মিছরিদা। তারপর বললেন, "একজন অদ্ভুত সায়েবের খোঁজ পেয়েছি। ওঁকে একটু দেখে যা। না, মুখ বেঁকাস না। তোকে আমি ব্যবসাদার সায়েবের কাছে পাঠাচ্ছি না। এ সায়েব একেবারে অন্য জিনিস।"

মিছরিদা পা নাড়াতে-নাড়াতে বললেন, "একজন রাশিয়ান পন্ডিত সেদিন কলকাতায় খুব ভাল কথা বলেছেন ; বাঙালী দু'রকমের—বাঙালী বাঙ্গালী আর অবাঙালী বাঙ্গালী। এই অবাঙালী-বাঙ্গালীর মধ্যে যেমন শিখ পাঞ্জাবী আছে, মাদ্রাজী আছে, গুজরাতী আছে, সিন্ধী আছে, মাড়ওয়ারী আছে, তেমনি রাশিয়ান আছে, ব্রিটিশ আছে, আমেরিকান আছে, কানাডিয়ান আছে।"

ব্রিটিশ বাঙালী বলতে আমার আর্থার হিউজ আই-সি-এস-এর কথা মনে পড়ে যায়। শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে। গোলপার্কের ইনস্টিউট অফ কালচারেই দেখা হয়েছিল রাশিয়ান বাঙালী দানিয়েলচুক-এর সঙ্গে। শিখ বাঙালী গুরণেক সিং এখন মার্কিন নাগরিক। বসবাস সিরাকিউজে। পেশায় লাইব্রেরিয়ান। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য একদিন নতুন বি-এ ক্লাশে পড়াতে এসে দেখেন একজন পাগড়িপরা যুবক বসে আছে। তিনি ইংরিজিতে বললেন, তুমি ভুল করেছো, এটা বাংলা ক্লাশ। গুরণেক সিং মাথা নিচু করে বলেছিল, "না স্যর, আমি বাংলা পড়তেই এসেছি।" নিজের ভালবাসায় এবং সাধনায় গুরণেক হয়ে উঠেছিল বাংলা ভাষায় বিদ্যের জাহাজ।

নোট বই বের করে মিছরিদা বললেন, "নাম-ঠিকানা অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। লিখে নে।"

সগর্বে যে-নামটি মিছরিদা দিলেন—প্রফেসর জোসেফ টি ওকোনেল এবং তাঁর অর্ধাঙ্গিনী ক্যাথলিন ওরফে ক্যাথি বউদি।

হ্যাঁ, এঁদের তো আমি ইতিমধ্যেই দেখেছি ক্লিভল্যান্ড বাঙালী সম্মেলনে। সায়েব বক্তৃতা করলেন চৈতন্যদেব সম্বন্ধে। কৃতী এবং বিখ্যাত বাঙালী বলতে অবশ্যই চৈতন্যকে বোঝায়—একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালী পাঁচশ বছর ধোপে টিকবেন কিনা তা এই মুহূর্তে বলা শক্ত।

মিছরিদার কথা মতন যোগাযোগ হয়ে গেলো ওকোনেল সায়েবের সঙ্গে।

খুব খুশি হলেন যখন শুনলেন, কৃতী 'প্রবাসী' বাঙালীদের লিষ্টিতে তাঁরও নাম উঠেছে। সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "আমি বাঙালী এবং প্রবাসী—কিন্তু কৃতী নই!" টেলিফোনেই ওকোনেল আমাকে নেমন্তন্ন জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের রেস্তোরাঁয়। বললেন, "তুমি ডাক্তার প্রশান্ত বসুর সঙ্গে মেডিকেল কলেজে চলে এসো। ওখান থেকে আমার বউ ক্যাথি তোমাকে নিয়ে আসবে।"

ক্যাথি বউদি হাসিখুশি মানুষ। কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী লেখকের সৃষ্টিকে ইতিমধ্যেই ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায় আছেন । ক্যাথি বউদি স্থানীয় কমিউনিটি কলেজে ইংরিজির অধ্যাপিকা।

ক্যাথি ওকোনেল ও তাঁর স্বামী দু'জনেই সমবয়সী, ছেচল্লিশ চলছে। পশ্চিমীদের যাঁরা বস্তুতান্ত্রিক ও ভোগসর্বস্ব মনে করেন তাঁদের অবশ্যই এই দম্পতিকে দেখা প্রয়োজন। স্থানীয় বাঙালী সমাজের সবাইকে এঁরা চেনেন এবং তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদের অত্যন্ত বিনীতভাবে জড়িয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ আজ যদি স্থানীয় বাঙালী সমাজের বড় রকমের কোনো সমস্যা দেখা দেয় তবে এঁরা প্রথমেই ওকোনেল দম্পতির কাছে হাজির হবেন। এঁদের এক কন্যা ও দুই পুত্র—দিদি (১৯), মার্ক (১৬) ও ম্যাথু (৪)।

ক্যাথি বউদি বললেন, "কমিউনিটি কলেজে আমি এ-দেশে নবাগতদের ইংরিজি পড়াচ্ছি। খুব ভাল লাগে। বাংলাটা আমার শখ। এখানে 'ইথজ্' বলে একটা সাহিত্য পত্রিকা বেরোয়। প্রত্যেক সংখ্যা একটা বিশেষ দেশ বা ভাষা সম্পর্কে। আমি সবেমাত্র অতিথি সম্পাদক হিসেবে বাংলাসংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যার কাজ শেষ করেছি।"

জোসেফ ওকোনেল যথাসময়ে সেন্ট মাইকেলস্ কলেজ থেকে নির্ধারিত স্থানে হাজির হলেন। তারপর আমাকে বসিয়ে রেখে স্বামী-স্ত্রী অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে কাফেটোরিয়ায় লাইন দিলেন। মার্কিনী হাওয়া একটুও ওঁদের গায়ে লাগেনি। একেবারে ভারতীয় পদ্ধতিতে অতিথি আপ্যায়নে লেগে গেলেন, আমার জল পর্যন্ত নিজেরা নিয়ে এলেন। লোভনীয় খাবারের সঙ্গে 'পপ'। অতি সাত্ত্বিক মানুষ এঁরা, মদ-টদের ব্যাপার নেই।

প্রথমেই একটা ভুল করে বসেছি। ওকোনেল বললেন, "আমি কানাডিয়ান নই। বহু বছর—১৯৬৮ থেকে কানাডায় আছি, কিন্তু পাসপোর্ট এখনও আমেরিকান।"

ওঁর জন্ম বোস্টনে—দেখলে এবং কথাবার্তা শুনলেই মনে হয় নিউ ইংলন্ড সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। আদিপুরুষ যে আইরিশ তা নাম থেকেই বোঝা যায়।

ওকোনেল বললেন, "আমি ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করি

মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর পি-এইচ-ডি জুটেছিল হার্ভার্ড থেকে।"

ওকোনেল সায়েবের সঙ্গে আমার কথাবার্তা যে বাংলায় হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

"এখন আমার চাকরি—সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ রিলিজিয়াস স্টাডিজ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়।"

"তা এই বাঙালী এবং ভারতীয় ব্যাপারে হঠাৎ আগ্রহী হলেন কি করে?" আমার এই প্রশ্নের উত্তরে, ওকোনেল মুচকি হেসে বললেন, "কপাল! আমার তখন পড়াশোনা চলছিল, বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা সম্বন্ধে। আমি বুঝলাম, পশ্চিমী ক্যাথলিক অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জন্যে আমাকে সংস্কৃত ভাষা শিখতেই হবে। সংস্কৃত শিক্ষায় হাতেখড়ি হার্ভার্ডের অধ্যাপক ড্যানিয়েলস্ অ্যানজেলস্-এর কাছে। গবেষণার তাগিদ ছাড়াও আরও একটা টান ছিল—মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা।"

বাংলার ব্যাপারে ওকোনেল সায়েব বললেন, "ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ভাল করে জানবার জন্যে আমাকে বাংলা শিখতে হলো। বাংলা শিখেছি কলকাতায়। আমার গুরু হলেন ভবানীপুরের ডঃ. ভবতোষ দত্ত। ইনিই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিমক সায়েবকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর প্রথম আলাপ হয় সুকুমার সেনের বাড়িতে।"

বাংলা শিখতে সায়েবের মাত্র ছ'মাস লাগলো। "গুরুর আশীর্বাদ আর সংস্কৃতজ্ঞান দুটোই কাজে লাগলো," বললেন ওকোনেল সায়েব। "আমার স্ত্রী ক্যাথিও একসঙ্গে বাংলা শিখে ফেললেন।"

"এরপর আমি ললিতপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর কাছে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করি, শেষ পর্যন্ত এই চৈতন্যর ওপরেই আমার হার্ভার্ডে ডক্টরেট। গৌরীনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করি। তিনিই আমাকে সংস্কৃতে পড়ালেন উজ্জ্বল নীলমণি। অনেক বৈষ্ণবের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় হয়। পরের বছর (১৯৬৬) আমি রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের সঙ্গে কাজ করি। তখন থাকতাম গোলপার্কে, অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের বাড়িতে। এই সময় ক্যাথি সন্তানসম্ভবা হলো।"

কলকাতায় বসবাসকালে বোষ্টম সম্বন্ধে নানা খোঁজ-খবর শুরু করেন খাস মার্কিনী ওকোনেল সায়েব। বললেন "কত বোষ্টমের বাড়িতে গিয়েছি তখন। ১৯৩১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে দেখলাম, পাঁচ লাখ লোক নিজেদের 'জাত বোষ্টম' বলে পরিচয় দিয়েছে, তার থেকেই আগ্রহ হলো।"

বাঁকুড়ার এক হাই স্কুলের প্রধান মহান্তর সঙ্গে ওকোনেলের আলাপ হলো, মহান্তর সঙ্গে জাত বোষ্টমের সন্ধানে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার গ্রাম চষে বেড়ালেন

ওকোনেল সায়েব।

এই সময় হার্ভার্ড থেকে চিঠি এলো, কলেজে না ফিরলে চাকরি যাবে এবার। বাধ্য হয়ে বাংলার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের প্রীতির সম্পর্ক ছেদ করে ১৯৬৭-র গ্রীষ্মের শেষ পর্বে দেশে ফিরে গেলেন ওকোনেল দম্পতি এবং পরের বছর টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

তারপর বাংলায় ফিরবার জন্যে আবার উসখুস করছেন। ১৯৭২-৭৩ এক বছর বিনা মাইনেতে পড়াতে এলেন বরিশালের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে। গায় টুরানু বলে এক কানাডিয়ান মিশনারি ওখানে ছিলেন। তাঁরই মোটর সাইকেলের পিছনে চড়ে বাংলাদেশের কত জায়গা দেখা হয়েছে ওকোনেল সায়েবের। ওই সময় বাংলাদেশের কবিতার এক ইংরিজি সংকলনও তৈরি করেন তিনি।

"বাঙালী মুসলমানের আত্মকথা" এই পর্যায়ে মালমশলা সংগ্রহের জন্যে ১৯৭৫-এ ওকোনেল আবার ভারতবর্ষে এলেন। দু'বছর পরে ছুটি নিয়ে দশ মাসের জন্যে বিশ্বভারতীতে পড়াতে এলেন। এবারের প্রিয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

দশ বছর পরে আবার কলকাতায় আগমন চার মাসের জন্যে। গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে গোবিন্দগোপাল মুখার্জির কাছে জোসেফ ওকোনেল পড়লেন রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। এরপরে চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এবং এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজকর্ম ও বক্তৃতা হলো।

এবার ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "কানাডায় ধর্মীয় প্রভাব কি কমছে?"

একটু ভেবে ওকোনেল উত্তর দিলেন, "চার্চ একেবারে ভেঙে পড়ছে না, তবে প্রভাব নিশ্চয়ই কমছে। কিন্তু মানবপ্রেমী আন্দোলনগুলো বাড়ছে। যেমন অস্ত্র সংবরণ আন্দোলন সম্পর্কে লোকে ক্রমশ আগ্রহী হচ্ছে।"

আরেক প্রশ্নের উত্তরে ওকোনেল বললেন, "ক্যাথলিকের সংখ্যা কমছে না, কিন্তু লোকে চার্চে যাচ্ছে কম। ইহুদিরা কিন্তু খুব ধার্মিক। কানাডায় ইহুদিরা আমেরিকান ইহুদির তুলনায় বেশি শিষ্টাচারী।"

ওকোনেল বললেন, "আমি ধর্মীয় ক্রিয়া কর্মের বিরোধী নই—অনেক সময় ধর্মীয় আচারই সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। এই সব ক্রিয়াকর্মই একটা ছোট্ট সমাজকে অনেক সময় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখে। যেমন ভারতীয়দের পূজা, বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। তবে মূল সাংস্কৃতিক প্রবাহ থেকে অনেক দূরে ছোট সমাজের বহু অসুবিধে—যারা এখানের সমাজে জন্মাচ্ছে এবং বড় হচ্ছে তাদের যদি ধৈর্যচ্যুতি ঘটাও তা হলে সাংস্কৃতিক বন্ধন দ্রুত ছিঁড়ে যাবে। কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে।"

ভারতীয় হিন্দুদের সমন্বয় শক্তির প্রশংসা করলেন ওকোনেল। "এখানে আপনি দেখবেন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়র খালি গায়ে পুরুতের কাজ করছে,

কমপিউটার বিশেষজ্ঞ ঘন্টা নাড়ছে, পুষ্পাঞ্জলির ফুল বিতরণ করছে। মেয়ে এবং পুরুষ উভয়েই কর্মক্ষেত্রে একরকম আবার সংসারে আরেক রকম হতে পারেন অনায়াসে। ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে যাঁরা এ দেশে এসেছেন তাঁরা ঘরে ও বাইরে দু'রকম হতে পারেন না. ফলে অসুবিধেয় পড়ে যান।"

কানাডায় ভারতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওকোনেল বললেন, "দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়রা নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছে না, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অন্যত্র। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্মে হয়তো প্রচন্ড আগ্রহ বাড়বে। দেখবেন, তখন অনেকেই দাদামশাই যে-ভাষায় কথা বলতেন তা শেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে।"

সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে ওকোনেল দুটি কথা বললেন, "প্রবাসী ভারতীয়রা যাতে মাঝে-মাঝে ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে বেড়াতে যান তা দেখতে হবে। এটা খুব প্রয়োজনীয়। আর একটা ব্যাপার—ইমিগ্রেশনের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়াটা সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না। যত কম সংখ্যাতেই হোক, ভারতবর্ষ থেকে মাঝে-মাঝে কিছু লোককে এ দেশে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দেওয়া দরকার—ভারতীয় সংস্কৃতির দীপশিখা তবেই প্রজ্বলিত থাকবে।"

শেষ প্রশ্ন ছিল, "এখানে আর কোনো কানাডিয়ান বাংলা শিখছে?"

ওকোনেল সায়েব বললেন, "হ্যাঁ, শিখছে বৈকি! আপনি ব্রায়ান ম্যাসভিলের সঙ্গে দেখা করেননি?"

ফোন করলেন ওকোনেল সায়েব। কিন্তু তাঁর ছাত্রকে পাওয়া গেলো না। ওকোনেল বললেন, "ব্রায়ান সংস্কৃত ও বাংলা শিখছে। ও এখন কেদারনাথ দত্ত'র ওপর গবেষণা করছে।"

"কেদারনাথ দত্ত'র নাম শোনেননি?" একটু অবাক হয়ে গেলেন ওকোনেল সায়েব। "ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত, ১৮৩৮ খ্রীঃ নদীয়ার বীরনগরে জন্ম—১৮৬৬ খ্রীঃ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অবসর নিয়ে ধর্ম-চর্চায় মনোনিবেশ করেন। বৈষ্ণবসমাজ সম্পর্কে অসংখ্য বই লিখেছিলেন। অসংখ্য ভাষা জানতেন। ১৯১৪ খ্রীঃ দেহরক্ষা করেন।"

আমার এবার অবাক হবার পালা। কলকাতার লোক হয়ে আমি যার খোঁজ রাখি না তাঁকে নিয়েই গবেষণা চলেছে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ওকোনেল আমাকে আবার ডাক্তার প্রশান্ত বসুর হেফাজতে পৌঁছে দিতে-দিতে বললেন, "ব্রায়ান নিশ্চয় কলকাতায় যাবে, তখন অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করবে।"

বেজায় খুশি হলেন মিছরিদা। বললেন, "একটা মানুষের মতন মানুষের সঙ্গে দেখা করেছিস। সেই সঙ্গে ঠোক্করও খেয়েছিস—হাওড়ায় ফিরেই ওই কেদারনাথ দত্ত সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করে নিবি। কিন্তু পড়বি কোথায়? লাইব্রেরি বলে কোনো বস্তু তো পোড়া বাংলায় নেই। ভিডিও পার্লার-টার্লার বসিয়ে বাঙালীরা উচ্ছন্নে যাবে—লেখাপড়ার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"

এরপরেই মিছরিদার সিংহনাদ, "আর একখানা জব্বর সায়েবের খবর জোগাড় করেছি তোর জন্যে।"

মিছরিদা বললেন, "তোর উচিত এবারের বইখানায় আমাকে সহযোগী লেখক বলে ঘোষণা করা। আমার সমস্ত কপিরাইট-মন্তব্য তুই টপাটপ নিজের নোটবইতে লিখে হজম করে নিচ্ছিস। মিছরিদা সঙ্গে না থাকলে এবার বিদেশে তোর ভরাডুবি হতো।"

"আপনাকে কো-অথর করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই আমার। কিন্তু প্রকাশককে রাজি করাতে পারবো না। 'মিছরিদার সহযোগিতায়' এই খটমট নাম থাকলে পাঠকের আকর্ষণ কমে যেতে পারে।"

"ঠিক আছে, একখানা উকিলের চিঠি দেওয়া যাবে তোর প্রকাশককে—বাপ-মায়ের দেওয়া অমন মিষ্টি নামটার হেনস্থা আমি সহ্য করবো না।"

"তা যা বলছিলাম," মিছরিদা আবার শুরু করলেন। "ইণ্ডিয়ানরা বেজায় বড়লোক হলে বিলেতে কিংবা সুইজারল্যাণ্ডে ভিলা বানায়। এবার উল্টো-পুরাণ শুরু হতে চলেছে। সায়েবরা ছুটছে ইণ্ডিয়ায় ঘর-সংসার পাততে। টরন্টোর সেরা জায়গায় থাকেন অথচ ভবানীপুরে একখানা ফ্ল্যাট রেখেছেন এমন এক সায়েবের সন্ধান পেয়েছি। নাম জন মিলনে। তোর জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেডি।"

"এ তো তাজ্জব ব্যাপার, মিছরিদা। আমার তো ধারণা ছিল ভবানীপুরের সব লোক ভিড়ের চাপে অস্থির হয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাবার জন্যে উঁচিয়ে রয়েছে।"

জন মিলনে আমাদের জামাই। ওঁর স্ত্রী ঝরনার বাপের বাড়ি মেদিনীপুরে ঘাটালের কুলিয়াগ্রামে।

ঝরনার সঙ্গে যে হাওড়া শিবপুরের একটা যোগাযোগ আছে তা ওঁদের

বাড়িতে গিয়েই বুঝতে পারলাম। নানা দুঃখ-কষ্টের অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ঝরণা শেষ পর্যন্ত জন মিলনের মতো সদাশিব স্বামী খুঁজে পেয়েছেন।

টরেন্টোর যে-অঞ্চলে মিলনের নিজস্ব বাটী তা শহরের সবচেয়ে দামী অংশ বলাটা অত্যুক্তি হবে না। এই শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকেই মিলনে পরিবার টরন্টোতে সম্পত্তি কিনে বসবাস করছেন।

মিলনে সাহেবের ভক্তি-শ্রদ্ধা বাহাই সম্প্রদায় সম্পর্কে। এই ছোট্ট আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়টি এক সময়ে কোয়েকারদের মতনই মানব সমাজের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করেছে। দিল্লিতে সম্প্রতি এঁরা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন যার স্থাপত্য সমস্ত বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। এঁরা পাঁচগণিতে একটা ইস্কুল চালান যেখানে সমস্ত বিশ্বের বাহাই-বিশ্বাসীরা ছেলেদের পাঠান। শ্রীরামকৃষ্ণের মতন এঁরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী।

আমাদের জামাই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে কয়েক মুহূর্তে আপন করে নিলেন। আমন্ত্রণ করলেন তাঁর অতিথি হতে। বললেন, "আপনি শ্বশুরবাড়ির লোক। আদরযত্ন না করলে বদনাম হবে।"

জন মিলনে মানুষটি যে স্থিতধী তা তাঁর শান্ত আচরণেই বোঝা যায়। এই ধরনের বিদেশীর সঙ্গে পরিচিত হতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। বিশ্ব-নাগরিকত্বের পাশপোর্ট নিয়েই এঁরা পৃথিবীতে এসেছেন।

জন মিলনে বললেন, "পরমতসহিষ্ণুতা পৃথিবী থেকে কমে যাচ্ছে। সম্প্রতি আড়াই হাজার লোককে সমীক্ষকরা জিজ্ঞেস করেন, 'খ্রীস্ট ও ইহুদি ধর্মের বাইরে কোনো ধর্মের কথা জানো?' শুনে আশ্চর্য হবেন, অর্ধেক লোক কোনো উত্তর দিতে পারেনি।"

মিলনে বললেন, "মানবতার ঐশ্বর্যকে আমাদের বার বার আবিষ্কার করতে হবে, না হলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য।"

শ্রীমতী ঝরনা পাশেই সোফাতে বসেছিলেন। টিপিক্যাল বাঙালী বউ, সায়েব বিয়ে করে বিন্দুমাত্র মেমসায়েব বনেননি। লাজুক প্রকৃতির মহিলা, বেশি কথা বলেন না। সেবায়, ভালবাসায়, ত্যাগে তিনি যে মিলনে পরিবারকে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন তা এই বাড়িতে নিশ্বাস গ্রহণ করলেই বোঝা যায়।

জন মিলনে বললেন, "আমার শরীরটা পশ্চিমী, কিন্তু আমার হৃদয়টা প্রাচ্যের।"

মিলনের পূর্ব-পুরুষরাও ছিলেন আইরিশ। চমৎকার সাহিত্য সৌন্দর্যমণ্ডিত ইংরিজি ভাষা ব্যবহার করেন জন। কথায়-কথায় বললেন, "দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমার খুব কষ্ট হয়। এরা না ঘরকা না ঘাটকা। 'নাইদার ফিশ নর ফাউল।' তবে এদের মধ্যে যারা এক-আধবার পিতৃপুরুষের দেশে

গিয়ে কিছুদিন থেকেছে, তারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা টান অনুভব করছে।"

ওঁদের বিয়ের কথা উঠলো। জন বললেন, "একবার পুজোর সময় আমি ঘাটালে গিয়েছিলাম। রাত্রে পুজোর সময় ভাবছি, আমাকে নিশ্চয় ঢুকতে দেবে না। আমার মেয়েকেও সাবধান করে দিলাম, বেশি এগিও না। কিন্তু অবাক কাণ্ড, পরিবারের সবাই, গ্রামের সবাই আমাদের আপন করে নিলেন, কাছে টেনে নিলেন। ভারতীয়দের যারা গোঁড়া বলে তাদের জেনে রাখা ভাল, আমার নাক-উঁচু পরিবারে ঝরনার স্বীকৃতি বরং অত সহজে আসেনি।"

গ্রামবাংলার প্রচণ্ড ভক্ত এই জন মিলনে। ভারতবর্ষে এলেই টো-টো করে ঘুরে বেড়ান গ্রামেগঞ্জে—কখনও গোরুর গাড়িতে কখনও পায়ে হেঁটে। "কিছু মনে কোরো না, বাংলার হৃদয় ও আত্মার সন্ধান করতে হলে কলকাতার বাইরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি কত চাষীর পরিবারে রাত কাটিয়েছি, তাদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে গায়ে-গতরে কাজ করেছি! আমার ঐ একটা জন্মগত উত্তর আমেরিকান দোষ আছে—হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। কিছু একটা কাজ আমাকে করতেই হবে। এই ব্যাপারে অনেক বাঙালী একটু অন্যরকম। কায়িক পরিশ্রমে তাদের অরুচি।"

"নিজের ঘর-দোর ছেড়ে বিশ্বভুবনকে দেখতে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারটা মন্দ নয়, শংকর। আমি খুব আনন্দ পাই। আর প্রত্যেকবারই এ দেশে ফিরবার সময় আমার 'কালচার শক' হয়!"

ভবানীপুরের বাড়ির কথা উঠলো। সায়েব বললেন, "কলকাতায় একটা বাড়ি না থাকলে চলে? তুমিই বলো!"

সেবার ওখানে জনাদশেক মিস্ত্রি ও জনমজুর লাগানো হয়েছে ফ্ল্যাটের পুনঃসংস্কারে। অধৈর্য সায়েব নিজেও একসময় ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করেছেন। "খুব বদনাম হয়ে গেলো। সবাই ছি ছি করতে লাগলো!"

মিলনে সায়েব যাবার সময় বললেন, "পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান তোমরা যত খুশি নাও, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু মহামূল্যবান এক সম্পদে তোমরা অবিশ্বাস্য রকম ধনী। আমি ভারতীয় নারীর কথা বলছি। ঈশ্বরের এই অপরূপ উপহারটুকু মাঝে-মাঝে বিশ্বের অন্য সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে তোমাদের।"

আমি দেখলাম, ঝরনা মিলনের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু আদর্শ বঙ্গললনার মতন অপরের উপস্থিতিতে স্বামীকে কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না।

টরেন্টোর বঙ্গীয়-সমাজের যিনি মুকুটমণি তিনি একজন ওড়িয়া। এঁর নাম সনাতন মোহান্ত। সনাতনের বাঙালী বন্ধু অসিত দত্তরও সুনাম সর্বত্র—এবং দু'জনে মিলে এঁরা ভক্ত মহলে 'দত্ত-মোহান্ত কোম্পানি' বলে পরিচিত।

মিছরিদা দুঃখ করলেন, "বঙ্কিম চাটুজ্যের মতন কোনো ঔপন্যাসিক এই দত্ত-মোহান্তকে দেখলে একখানা অসাধারণ উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারতেন—আজকালের বাঙালী লেখকের সে কব্জির জোর নেই।"

দত্ত-মোহান্ত সত্যিই এক চলমান কিংবদন্তী—লিভিং লিজেণ্ড। ওড়িশার এই সনাতন (বয়স পঞ্চাশ) যদি ইচ্ছে করেন যে কোনো বাঙালীর মুণ্ডু কেটে নিতে পারেন, টরেন্টোর বাঙালীরা তা নতমস্তকে মেনে নেবেন! শরৎচন্দ্রের যুগে বাঙালী যৌথ পরিবারে জ্যেষ্ঠভ্রাতার এমন নিঃশব্দ অথচ দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল।

কানাডার ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে সবচেয়ে বিদগ্ধ মানুষ ঋতেন রায় বললেন, ১৯৬৫ সালে এই শহরে এক ডজনও বাঙালী পরিবার ছিল না। বাড়তে আরম্ভ করলো সত্তরের দশকের শুরুতে এবং এখন অন্তত হাজার পাঁচেক বাঙালী এই শহরে বসবাস করেন। এক কথায় নিউ ইয়র্ক ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কোনো একটি শহরে এতো বাঙালী আছে কিনা সন্দেহ।

মিছরিদা বললেন, "আমাদের দেশে যারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং সভাসমিতিতে লেকচার দিয়ে জাতীয় সংহতি প্রচারের নির্বুদ্ধিতা দেখায় তাদের পাঠিয়ে দে এই সনাতন মোহান্তর কাছে—ওঁর পা ধুয়ে চরণামৃত পান করুক বছর খানেক ধরে, তারপর বুঝবে কিভাবে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়!"

মোহান্ত ও অসিত দত্ত দু'জনেই হরিহর-আত্মা—দিনে টেলিফোনে অন্তত দু'বার বাক্যবিনিময় না-হলে এঁদের ভাত হজম হবে না। কিন্তু বাংলা গল্পের চরিত্রের মতন এঁদের মধ্যে মতান্তরও হয় এবং কখনও-কখনও কথা বন্ধ হয়ে যায়। অসিত হয়তো বললেন, "তুমি ঢেঙ্কানলের গণ্ডগ্রাম থেকে এসেছো—এ ব্যাপারে কী বুঝবে?" মোহান্ত ততোধিক রেগে উত্তর দেন, "আমি এতোদিন বাঙালী চরিয়ে খাচ্ছি আমি বুঝবো না তো তুমি বুঝবে?" পুরো একদিন হয়তো কথা বন্ধ থাকে, তারপর মোহান্তগৃহিণী ফোনে খবর নেন, অসিতের মেয়ের শরীর কেমন আছে। জ্বর বেড়েছে খবর পেয়ে মোহান্ত গাড়ি চালিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে অকুস্থলে আবির্ভূত হয়ে ভীষণ রাগারাগি করেন, "তোমার

এতোখানি আস্পর্ধা কোথা থেকে হয়? মেয়েটার একশ এক জ্বর আর আমি জানতে পারিনি।" প্রয়োজনে মোহান্তর গাড়িতেই মেয়ে চালান হয়ে যাবে মোহান্তভবনে, কারণ অসিতবাবুর স্ত্রী একটি অফিসে কাজ করেন।

সনাতন মোহান্ত সত্যিই একটি ইনস্টিটিউশন। আজকের কানাডার বাঙালীরা প্রায় কেউ সোজাসুজি এদেশে আসেননি। প্রায় সবাই জড়ো হয়েছেন ভায়া জার্মানি। এই বাঙালীরা সাধারণত ইউ-এস বাঙালীদের মতন ডক্টরেটে ভূষিত নয়, বেশির ভাগ তখনকার ইন্টারমিডিয়েট সায়ান্স পাশ করে যুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানির কারিগর অভাব দূর করবার জন্যে ওদেশে হাজির হয়েছিলেন। জার্মানিতে এই শ্রেণীর ভারতীয়রা কিন্তু নিরাপত্তার সন্ধান পাননি।

প্রধানত ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হতো সীমিত এক বছরের জন্যে। পাকাপাকি বসবাসের অনুমতি পাওয়া ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। অতিশয় বুদ্ধিমানরা জার্মান-ললনার পাণিগ্রহণ করে জামাই-নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই প্রথম ওয়ার্ক-পারমিট ও পরবর্তী পারমিটের মধ্যবর্তী সময়ে আইন বাঁচাবার জন্যে কানাডায় এসে অপেক্ষা করতেন।

যাই হোক, ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে জার্মান অর্থনীতির কোনো এক অব্যক্ত কারণে প্রবাসী বাঙালীদের মোহভঙ্গ হতে শুরু হলো এবং তাঁরা অনেকেই আবার নতুন করে ভাগ্য সন্ধানে কানাডার দিকে তাকালেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় কানাডার দ্বার এশীয় কলাকুশলীদের জন্যে খুলছে এবং বহু পরিবার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।

এই প্রজন্মের অনেক বাঙালীই কানাডার কোনো খোঁজখবর রাখতেন না। প্রায় অসহায় অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঝাঁপ দেবার আগে তাঁরা দত্ত-মোহান্তর ঠিকানা সংগ্রহ করতেন এবং সেটাই ছিল যথেষ্ট।

সনাতন মোহান্ত পেশায় একজন ওয়েল্ডার। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে আসবার আগে জানাই, তাঁর বাড়ির বেসমেন্টটি ছিল নবাগত বাঙালী সমাজের প্রথম আশ্রয়স্থল। আমাদের ছোটবেলায় 'হরি ঘোষের গোয়াল' বলে একটি কথা চালু ছিল। বিত্তবান হরি ঘোষ নাকি দাতা ও দয়ালু ছিলেন—এবং স্বল্পবিত্ত ছাত্ররা তাঁর বাড়িতে অবাধে আশ্রয় নিয়ে দুবেলা খাওয়া-দাওয়া করে পড়াশুনা চালাতেন। উত্তর কলকাতার হরি ঘোষ স্ট্রীট বোধ হয় এখনও সেই উদারহৃদয় মানুষটির স্মৃতি বহন করছে। আমরা যদি সারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা নিজেদের কাজে লাগাতাম এবং যার যা পাওনা তা প্রাণ খুলে দিতে শিখতাম তা হলে এই কলকাতায় সনাতন মোহান্তর নাগরিক সম্মানের আয়োজন করতেন।

সনাতন মোহান্তর 'গোয়াল' এক প্রজন্মের ভাগ্যান্বেষী বাঙালীদের সবচেয়ে

দুঃখের সময়ে আশ্রয় দিয়েছে। সনাতনবাবুর বেসমেন্টে গোটা পাঁচ-ছয় রবার কুশনের বেড। গৃহস্বামী তাঁর অতিথিদের জন্যে একটি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন, যেখানে সারাক্ষণ মজুত থাকতো, একশো পাউণ্ড চাল, পঞ্চাশ পাউণ্ড পেঁয়াজ, পঞ্চাশ পাউণ্ড আলু, তিরিশটা ডিম ও দশটা মুরগী। ফ্রিজ আছে, কুকিং রেঞ্জ আছে। জাহাজঘাটা অথবা বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সিতে সোজা সনাতন-আশ্রমে চলে এলেই হলো।

সনাতন মোহান্ত নিজেই ট্যাক্সিবিদায় করবেন। তারপর আশ্বাস দেবেন, "এসে যখন পড়েছেন তখন চিন্তার আর কী আছে ? নিজের খুশিমতন খাওয়া-দাওয়া করুন, যতদিন না মনের মতো চাকরি পাচ্ছেন, যেখানে-ইচ্ছে ঘোরাঘুরি করুন।"

অনেক সময় দত্ত-মোহান্ত ভ্রাতৃত্ব অনেকের জন্যে চাকরির খোঁজখবর এনেছেন এবং ভাগ্য পরিবর্তনের পরে বাড়ি খুঁজে দিয়েছেন, দেশে গিয়ে দিশি মেয়ে বিয়ে করে আনতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং দীর্ঘদিন পরেও এঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে আছেন পরমানন্দে। কিন্তু কোথাও কোনো আত্মপ্রচার নেই। ব্যাপারটা যেন এই রকমই হওয়া উচিত।

শুধু পুরুষ নন, মহিলারাও মোহান্ত-আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছেন। সিতাংশু চক্রবর্তীর স্ত্রী রীণা (যিনি একদা গোখেলে অধ্যাপনা করতেন) যখন ভাগ্যসন্ধানে টরন্টোতে আসবার প্রয়োজন বোধ করলেন, তখন মোহান্তর সেই একই কথা। "চলে আসুন, বউদি। চিন্তার কিছু নেই। নিজের বাড়ি মনে করে থাকবেন, যতদিন খুশি।"

এরপর মোহান্ত তখনকার 'আশ্রমের' বাসিন্দাদের ডেকে বললেন, "খুব সাবধান ! একজন বউদি আসছেন।" বাসিন্দারা আদেশ নতমস্তকে মেনে নিলেন। শুধু অসুবিধা হলো বীয়ার সেবনের। বউদির সামনে যে ঐ কাজটি করা শোভন হবে না তা সনাতনবাবু সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার যদি সুযোগ থাকতো তা হলে এই দত্ত-মোহান্তকে নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ছবি অথবা একটি টি-ভি সিরিয়াল তৈরি করতাম। যৌথ পরিবারের রক্ত ও মানসিকতা নিয়ে প্রবাসেও এঁরা দূরকে নিকট ও পরকে আপন করে চলেছেন।

আমি যখন অসিতবাবুর লুসিফার ড্রাইভ-এর বাড়িতে প্রথম গেলাম তখন দেখলাম বাড়িতে বেশ কয়েকজন বাঙালী গিজগিজ করছে। এবং যে-ই বিদায় নিতে চাইছে তাকেই অসিতবাবু জোর করছেন, "আরে কোথায় যাবে এখন। দুটি খেয়ে যাও।"

এইভাবে কতজন যে অসিতবাবুর ওপেন হাউসে আতিথ্য পাচ্ছেন তার

বোধ হয় ইয়ত্তা নেই। এঁর স্ত্রী আদর্শ সহধর্মিণীর মতন এসব শুধু সহ্য করেন না, প্রশ্রয়ও দেন, যদিও মুখে বলেন, "কী করবো বলুন ? ও কি আমার কথা কখনও শুনেছে ? না শুনবে ?"

বলা বাহুল্য, আমিও আমন্ত্রিত দলে ঢুকে পড়ে এই পরম আনন্দময় অভিজ্ঞতার অংশীদার হলাম। অসিতবাবু তখন পরবর্তী শনিবারে টরন্টোর বাঙালী ও ওড়িয়া শিশুদের নিয়ে পিকনিক পরিকল্পনা করছেন। বাইরে বেরিয়ে সবাইকে নিয়ে হৈ-চৈ করা দত্ত-মোহান্তর আর একটি নেশা। কবে কোথায় যাওয়া হবে তা ডিকটেটরি-স্টাইলে এঁরা দু'জনে হঠাৎ স্থির করেন এবং টরন্টোনিবাসী কোনো বাঙালীর ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে দত্ত-মোহান্তর টেলিফোন নির্দেশ পেয়ে তা অমান্য করবে।

দত্ত-মোহান্ত দু'জনেই রন্ধন-বিদ্যায় সুপটু—এবং বিরাট-বিরাট ডেকচিতে খিচুড়ি, মুরগীর মাংস ইত্যাদি রান্নার দায়িত্ব তাঁদের দু'জনের। এই সব দলে সত্তর আশিজন অংশগ্রহণকারী কিছুই নয়। টরন্টোর প্রবাসীরা বেবি সীটিং-এও কোনো খরচ করেন বলে শুনিনি, নিজেদের সন্তানগুলিকে যখন খুশী এঁদের জিম্মায় জমা রেখে গেলেই হলো। দত্ত-মোহান্তর একটিই শর্ত ঃ "বাড়িতে ফিরে আর রান্নার হাঙ্গামা রাখতে পারবে না। বেবি ফেরত নেবার সময় দুটো খেয়ে দায় উদ্ধার কোরো।"

অসিত দত্তর ভাই নিউ ইয়র্ক প্রবাসী। তিনিও এই কালচারের অংশীদার কিনা জানা নেই। তবে অসিতবাবুর নিজের সম্বন্ধে কথা বলার সময়ই নেই। তিনি সারাক্ষণই অন্যের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত রয়েছেন। শুধু জানতে পারলাম, এক সময় বঙ্গবাসী কলেজ হোস্টেলে থাকতেন এবং জামশেদপুর কর্মসূত্রে সময় কাটিয়েছেন, জার্মানি পাড়ি দেবার আগে।

সনাতনবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন সেই একই কথা। "আপনি আমাদের কাছে অন্তত তিনটে মাস থেকে যান—সব দায়-দায়িত্ব আমাদের। আমার স্ত্রীর খুব দুঃখ হয়েছে, আপনি তিন রাত কাটিয়েছেন টরন্টোয়, অথচ ওঁর হাতের রান্না এখনও খাননি।"

সনাতন মোহান্তর বয়স এখন পঞ্চাশ। বত্রিশ নম্বর এডিনবরা কোর্টে চমৎকার বাড়ি তৈরি করেছেন।

যা জানা গেলো, সনাতনবাবুর বাড়ির ওড়িশার ঢেঙ্কানলে, এক গণ্ডগ্রামে। সেই গ্রামের কোনো লোক কখনও বিদেশ তো দূরের কথা কলকাতা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সনাতন মোহান্ত যখন গ্রামে ফিরলেন তখন সেখানে আনন্দের স্রোত বয়ে গেলো। গ্রামবাসীরা রেল স্টেশন থেকে ব্যাণ্ড বাজিয়ে মালা দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁদের কৃতী সন্তানকে

অভ্যর্থনা জানালেন এবং স্বগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

হাতের কাজে ওড়িশাবাসীরা যে তুলনাহীন তা আমাদেরও অজানা নয়। স্বল্পশিক্ষিত সনাতন কিন্তু ছিলেন সুদক্ষ ওয়েলডার। বিদেশে আসবার আগে টেক্সম্যাকো, ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন ও টাটা ষ্টীলে কাজ করেছেন।

১৯৬১-৬২তে লক্ষ্মীপথীন গ্রামের ছেলের মধ্যে ভাগ্য পরিবর্তনের অস্থিরতা এলো। টাকা দিয়ে জার্মান ভাষায় আটখানা চাকরির আবেদনপত্র পাঠালেন আটটি প্রতিষ্ঠানে। এবং কী আশ্চর্য—ডাকযোগে তিনখানি চাকরি তাঁর পকেটস্থ হলো।

জার্মানিতে তাঁর ওয়েলডিং বিদ্যা প্রায় শিল্পকর্মে উন্নীত হলো। কিন্তু জার্মানির ওয়ার্ক পারমিট ইত্যাদির অসুবিধায় অধৈর্য হয়ে সনাতন মোহান্ত সাতষট্টি সালের মে মাসে কানাডায় হাজির হলেন। সুদক্ষ ওয়েলডার হিসেবে সনাতন মোহান্ত চাকরি ধরেন আর ছাড়েন—পনেরো মাসে চোদ্দটা চাকরি। চাকরি তাঁর পিছনে-পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশেষে বিখ্যাত অনটারিও হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার কমিশনে মোটা মাইনের কাজ পেলেন।

সনাতন মোহান্তর ওয়েল্ডিং কাজ এমনই নিপুণ যে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের সায়েবরা অবাক হয়ে যেতেন। এক্স-রেতে অনেক সময় ধরা পড়ে না যে সনাতন ওয়েল্ড করেছেন।

অসিত দত্তও কানাডাতে প্রায় সমসাময়িক। দুজনে হরিহর আত্মা। আবার ছোটখাট ঝগড়াও লেগে আছে। অসিত বললেন, "একটা খাট কিনতে হবে।"

সনাতন সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, "খাটের অনেক দাম। আমি ওয়েল্ড করে খাট তৈরি করে দিচ্ছি।"

খাট তৈরি হলো। অসিত অসন্তুষ্ট। "তোর কোনো সৌন্দর্য-জ্ঞান নেই।"

সনাতনের উত্তর, "রাখ রাখ। কতগুলো ডলার বাঁচলো তার হিসেবটা কর!"

সনাতন বিয়ে করেন বাল্যবয়সে (বোধ হয় বারো-তেরো বছরে)। বউদি সেই কবে একবার কিছুক্ষণের জন্য জামশেদপুর এসেছিলেন। তারপর সনাতন তাঁর ভাগে লক্ষ্মীকান্ত মারফৎ লিখে পাঠালেন, মামা জার্মানি যাচ্ছে!

জামশেদপুর থেকে বিদেশে যাওয়ার পথে নানা বিপত্তি। প্রথমে ট্রেন মিস হলো। একটা মালগাড়ি চড়ে অদম্যহৃদয় সনাতন মোহান্ত কোনোরকমে কলকাতা পৌঁছলেন।

১৯৬৭-তে মোহান্ত যখন কানাডায় আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত তখন গ্রাম্য বধূ মোহান্ত-বউদিকে কেউ বাজে খবর দিলো, সে কলকাতায় শুনে এসেছে সনাতন মেম বিয়ে করেছে। একই সময়ে আরেকটি দুর্ঘটনা। সনাতনের একটি ছেলে

মারা গেলো। দুঃসংবাদ পেয়ে সনাতন দেশে ফিরলেন অনেকদিন পরে এবং সবাই তখন বললো, এবার বউদিকে নিয়ে এসো।

সনাতন-গৃহিণী প্রথম যখন কানাডায় এলেন তখন মোহান্ত-আশ্রমে অসিত দত্ত ও আরও তিনচারজন বসবাস করছেন। সনাতন বললেন, "তাহলে এবার ওদের অন্য কোথাও চলে যেতে বলি।" সেই কথা শুনে গ্রামের মেয়ে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "সে কি কথা! ওরা দেবররা যে যেমন আছে থাকুক।"

গ্রামের বধূর সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তটি মহৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। কাঠের উনুন ছাড়া যিনি কিছুই দেখেননি তিনিই তিন-চারদিনের মধ্যে বৈদ্যুতিক কুকিং রেঞ্জে সুদক্ষ হয়ে উঠলেন। ভোরবেলায় উঠে সবার জন্যে লুচি করলেন মোহান্ত বউদি।

বাঙালী দেবররা জিজ্ঞেস করতো, "বউদি কি করিছন্তি? লুচি?"

সেই মোহান্ত বউদি একটু-একটু করে ইংরিজি শিখলেন এবং ডাইং-ক্লিনিং-এ চাকরি নিলেন।

কয়েক বছর পরে আত্মীয়দের দেশ থেকে আনানোর ব্যবস্থা হলো। প্রথমে এলেন সনাতনের ভাই ও বউদির বোন। বোনকে নিজের কর্মস্থলে একটা কাজ জোগাড় করে দিলেন বউদি। তারপর যথাসময়ে বোনকে দেশে নিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন কটকের এক বি-এসসি পাশ যুবকের সঙ্গে। এক বছর পরে ইমিগ্রেশনের ঝামেলা কাটিয়ে বোনের স্বামী এদেশে চলে এসেছেন। সুযোগ বুঝে নিজের বাড়ির থেকে চারখানা বাড়ির পরেই একখানা বাড়ি ওদের কিনিয়ে দিয়েছেন।

সনাতন মোহান্তর বড় মেয়ে স্বর্ণলতা (কুনি) এগারো বছর পর্যন্ত গণ্ডগ্রামে কাটিয়েছে। কিন্তু এখানে এসে সে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। ফার্মাসি পাশ করে একটা ওষুধের প্রতিষ্ঠানে ভাল কাজ করছে। মোহান্ত আবার দেশে গিয়ে মেয়ের জন্যে একটি মনের মতন ডাক্তারপাত্র জোগাড় করে ভারতীয় মতে বিয়ে-থা দিয়ে এদেশে আনলেন। জামাইটি অতীব সুদর্শন ও ভদ্র।

আমি টরন্টোতে পৌঁছনোর সময় সবচেয়ে আনন্দ সংবাদ ও আলোচনার বিষয় সনাতন মোহান্তর বাবা-মায়ের কানাডা পরিদর্শন। এঁরা মাস দুয়েকের জন্যে ছেলের কাছে এসেছিলেন। যে-সনাতন স্থানীয় বঙ্গীয় সমাজের অভিভাবক তাঁর বাবা-মাকে সাদর অভ্যর্থনার জন্যে অনেকেই বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। এই বৃদ্ধ দম্পতির পক্ষেও সে-এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ব্যাগ বইতে অসুবিধা হচ্ছে বলে এঁরা ব্যাগ কলকাতায় ফেলে একটি পুঁটলিতে পাসপোর্ট ফরেন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি বেঁধে নিয়েছিলেন। মাথায় পাগড়ি ও কাঁধের ওপর একটা লাঠিতে পুঁটলি বেঁধে এঁরা খালি পায়ে বিপুল সম্মান এ ভালবাসার মধ্যে

বিদেশে পদার্পণ করলেন।

ছেলের সংসার দেখে সনাতন-পিতা ও মাতার আনন্দের অবধি নেই। তাঁদের আদরে নাতনী কুনি ট্রেনারের কাজ নিলো। মাঝে-মাঝে ধৈর্য হারিয়ে কুনি বলেছিল, "আর পারছি না দাদু-দিদিমাকে নিয়ে।"

দিদিমা রেগে বলতেন, "তুই চুপ কর ! তোকে কোলে পিঠে মানুষ করেছি, আর এখন তুই আমাদের শেখাচ্ছিস।"

কুনি দাদুকে ইংরিজি অক্ষর শিখিয়ে দিয়েছে—'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত !

ছেলের বাড়িটা ভালই লেগেছে বাপ-মায়ের। কিন্তু দেশটা ? তাঁদের মন্তব্যঃ "গোরু নেই, ছাগল নেই, পুকুর নেই। এ-কেমন দেশ ?"

সব মিলিয়ে সনাতন মোহান্তর মতন মানুষের সন্ধান পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। মানুষের প্রতি অবাধ ভালবাসা না-থাকলে সনাতন মোহান্ত বা অসিত দত্ত হওয়া যায় না।

এরপরে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথ্রপলজির অধ্যাপক অজিত রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

সত্যরঞ্জন বক্সীর চেলা, নির্মল বসুর ছাত্র ও জে বি এস হ্যালডেনের মন্ত্রশিষ্য অজিতবাবু ইটালীতে শিক্ষা নিয়ে হল্যাণ্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেছিলেন। তারপর এক সময় হাজির হয়েছিলেন কানাডায় ১৯৭০ সালের দিকে।

অজিতবাবু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বললেন, "মানবজাতি ও সভ্যতার বিরাট এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এই টরেন্টো শহরে। বিভিন্ন জাতের মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতি নিয়ে এখানে বসবাস শুরু করেছে—সমাজ ঘন ঘন পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করছে।"

দত্ত-মোহান্তর ভূমিকায় প্রশংসা করলেন অজিত রায়। বললেন, "এঁরা মস্ত এক সামাজিক ভূমিকা পালন করছেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে।"

বাঙালী সংস্কৃতির ওপর নানা চাপ রয়েছে। বললেন, অজিতবাবু। "কেউ নিজের পুরনো সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কেউ অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলতে চাইছে, আবার কেউ সমন্বয়ের পথ খুঁজছে।"

"এই রকম চাপের মধ্যে থাকলে সৃষ্টিশীল কাজকর্মের বারোটা বেজে যায়। আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, এই সমাজ থেকে সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞের জন্ম হচ্ছে না। অথচ দেশের মানুষের তুলনায় এরা অনেক পার্থিব সুখের মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যেও ক্রিয়েটিভিটির এই সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। সবাই পেশাগত ব্যুৎপত্তি অর্জন করে টু-পাইস কামাবার পথটা নিতে

চায়—সেখানে আদর্শের বা প্রেমের কোনো স্থান নেই। আর দুই মূল্যবোধের টানাপোড়েনে অনেক সময় ছোটরা দিশেহারা হয়ে উঠছে।"

তবু ইউ-এস-এ ও কানাডার পার্থক্য কী জানতে চাইলাম। অজিত রায় বললেন, "ইউ-এস-এ-তে এসেছে উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরা—আর কানাডায় পাবেন সাধারণ স্তরের বাঙালীদের! যুক্তরাষ্ট্র হলো অবিশ্বাস্য সুযোগের দেশ—কানাডায় সুযোগ আছে, তবে অতোটা নয়। কানাডাকে বলে সবচেয়ে ধনী অনুন্নত দেশ, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ব্যাপারটা এখনও নগণ্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে মানুষে-মানুষে তীব্র প্রতিযোগিতা। যাকে আমরা 'র‍্যাট রেস' বলি সেই ইঁদুরদৌড় অনেক বেশি। কানাডায় অতো উত্তেজনা নেই—অনেক ধীরেসুস্থে কাজকর্ম হয় এখানে।"

বিদায় নেবার মুহূর্তে অজিতবাবু বললেন, "ভাববেন না। বাঙালীরা অনেক ধৈর্যশক্তি ও কষ্টের অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে এসেছে। তারা একটা পথ খুঁজে পাবেই। হয়তো এমন সময় আসবে, যখন কানাডার বাঙালীদের জন্যে মাতৃভূমির আপনারা প্রকৃতই গৌরব বোধ করবেন।"

জয় মা কালী! কলকাত্তাওয়ালী হিসেবে খাঁড়া হাতে, মুখ ভেঙচে, জিভ বের করে কেবল ঠনঠনে, বউবাজার, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর পশার জমিয়েও তোমার মন ভরলো না। যবন দেশ কানাডার টরন্টো শহরে বসে জবাফুলের পুজো নেওয়া ও পাঁঠা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে তোমার।

অত্যন্ত সুখবর। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাপূরণ হতে আর দেরি নেই। কানাডার বাঙালীরা খোদ টরন্টো শহরেই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। উৎসাহী মাতৃভক্তরা এই অধমের আগমন সংবাদ পেয়ে অনেক কাজ ছেড়ে নীলাদ্রির বাড়িতে এলেন আমাকে কালীবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে।

আমার মনে পড়লো কমবয়সে পড়া যাযাবরের দৃষ্টিপাত-এর কথা—পাঁচজন ইংরেজ একত্রিত হলেই গড়ে তোলে ক্লাব, প্রবাসে পাঁচজন বাঙালী হিন্দু একত্রিত হলেই স্বপ্ন দেখেন কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার। তাই বাংলার বাইরে যেখানেই বাঙালী হিন্দুর পদার্পণ ঘটেছে সেখানেই কালীবাড়ি উঠেছে।

যা এক সময় কেবল লখনউ, এলাহাবাদ, সিমলা, দিল্লীতে ঘটেছিল তা এখন দেশের বাইরেও প্রসারিত হচ্ছে। ভবঘুরে বাঙালীর জন্য রেঙ্গুনের দরজা হয়তো বন্ধ হয়েছে, কিন্তু তার বদলে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন নতুন এক মহাদেশ,

যার নাম উত্তর আমেরিকা। পৃথিবীর দুই সমৃদ্ধতম দেশ কানাডায় ও আমেরিকায় তাঁদের সসম্মান বসবাস। এখন মা কালী ওখানেই প্রবাসী ভক্তদের সেবাসুখ লাভ করবেন।

শ্যামা মায়ের নামে বাঙালী যতই আত্মহারা হোক, অস্বীকার করে লাভ নেই, করালবদনা এই মহিলার ভাবমূর্তি সায়েব-সমাজে তেমন তুঙ্গে নয়। চামুণ্ডা মায়ের কীর্তিকাহিনী সম্পর্কে বঙ্গপ্রবাসিনী ইংরেজ গৃহিণীরা একসময় সন্ত্রস্ত থাকতেন। মায়ের অনার্যসুলভ নানা আচরণ সম্পর্কে গোপনে-গোপনে ইংরেজমহলে যে আলাপ-আলোচনা চলতো তা শুনলে কালীভক্ত বঙ্গসন্তানের চক্ষু অবশ্যই রক্তবর্ণ হবে। কিন্তু সায়েবরা যতই কুৎসা রটান, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাগরপারে পাঁঠাখাগী মায়ের প্রভাব ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

টরন্টোতে বসেই একজন উৎকলবাসী বন্ধু বললেন, "মা কালী প্রসঙ্গটা অনেকদিন ধরেই জটিল। মালপোয়া ও মুণ্ডু, কীর্তন ও পাঁঠাবলির মধ্যে বাঙালী হিন্দু দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে খোল-করতাল নিয়ে গৌরাঙ্গভজনা চলছে, অন্যদিকে শ্যামামায়ের চরণতলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে শাক্ত বাঙালী ছটফট করছে।"

উৎকলবাসী বন্ধু আরও বললেন, "বোস্টম ও কালীসাধকের রেষারেষিতে ওড়িশার মানুষকেও বাঙালীরা একবার জড়িয়ে ফেলেছিল।"

আমি রসিকতা করলাম, "বাঙালীর এইটাই দোষ। ঘরের উত্তেজনা বাইরে ছড়িয়ে দিতে তার যে তুলনা নেই তার প্রমাণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। সাধে কি আর সোনার বাংলা ভাগ করে বাঙালীর হাড়ে দুব্বোঘাস গজিয়ে দেবার জন্যে ইংরেজ অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিল!"

এবার যা জানা গেলো তা এই রকম। "ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের সুর তুলে প্রেমের দেবতা নিমাইয়ের ওড়িশা পরিক্রমার কথা কারও অজানা নয়। যাত্রাপথে ওড়িশার গ্রামে-গ্রামে যে সব আখড়ার পত্তন হয়েছিল তার কথাও বহুজনে শুনেছেন। কিন্তু যা এখনও অজানা তা হলো কালীসাধক বাঙালী কীভাবে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল।"

যেখানে-যেখানে বৈষ্ণবের আখড়া গজিয়ে উঠেছিল, ঠিক তার পাশে-পাশে একটি করে নরমুণ্ডমালিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে একদল দুঃসাহসী কালীসাধক সেই যুগে নিজেদের স্বেচ্ছানির্বাসিত করেছিলেন। কালক্রমে এই সব বঙ্গসন্তান নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে উৎকল সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়েছেন, কিন্তু আজও নীলাচলের পথে ছোট ছোট গ্রামেও চাটুজ্যে, মুখুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যের দেখা পাবেন যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না, কিন্তু এখনও পরমানন্দে বাঙালী টাইটেল বহন করছেন।

যে দুর্জয় দুঃসাহস নিয়ে বাঙালী ডাক্তার, বাঙালী ইনজিনিয়ার, বাঙালী বৈজ্ঞানিক নতুন কর্মের সন্ধানে দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন সেই দুঃসাহসের সামান্য অংশও কিন্তু বাঙালী লেখকরা দেখাতে পারেননি। যে-দিন আমাদের সাহিত্যে সেই মানসিকতা গড়ে উঠবে সেদিন কলকাত্তাওয়ালীর চরণে সব ফুল ছুঁড়ে নিঃস্ব না-হয়ে বাঙালী লেখক ছুটবেন চৈতন্যের চরণচিহ্ন অনুসরণ করে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নে।

টরন্টো কালীবাড়ির উৎসাহী উদ্যোক্তাদের হতাশ করতে হলো—কারণ ঠিক যে সময় ওঁরা আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে চাইলেন তখন অন্য এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আগাম করা ছিল। ফলে মায়ের দর্শন আগামীবারের জন্যে তুলে রাখতে হলো। তার বদলে নীলাদ্রিভবনে বসে ওঁদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হলো।

প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্তর সাধনায় পৃথিবীর দিকে-দিকে এখন কৃষ্ণ-রাধিকার জয়জয়কার—কৃষ্ণনামে এখন নানা ভূখণ্ডের আকাশ-বাতাস মুখরিত। কিন্তু মা কালী কস্মিন কালেও সায়েব-মেমের হৃদয় জয় করেননি। লকলকে জিভ দেখলেই সায়েব-মেমের হাত-পা সিঁধিয়ে যায়, ডাক পড়ে সায়েব পাদ্রির। গির্জা গড়ে, বাইবেল শুনিয়ে কালীভক্তদের বেলাইনে টানো। কালী এখনও বিরাট এক রহস্য হয়ে রয়েছেন পশ্চিমের সাধারণ মানুষের মনে। তাই মা কালীর মাহাত্ম্য প্রচারের পুরো দায়িত্বটাই নিতে হবে বাঙালীকে আরও কিছুদিন—অন্তত যতদিন না ভক্তি-বেদান্তের মতন পাবলিসিটি অফিসার জোটে চামুণ্ডা মায়ের।

উদ্যোক্তরা বললেন, সমস্ত মার্কিন মহাদেশ জুড়ে এখন মন্দির গড়ার ঢেউ উঠেছে। গণেশ, কৃষ্ণ, তিরুপতি ও শিবের পশার জমে উঠেছে দিকে-দিকে। প্রবাসী হিন্দুরা কয়েক'শ বছর মাথা নিচু করে বসে থাকার পর এখন বিপুল উৎসাহে মেতে উঠেছেন মন্দির প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু সেই তুলনায় কালীমন্দিরের ঘাটতি প্রমাণ করছে যে সঙ্ঘশক্তিতে বাঙালী হিন্দুরা অন্যের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন।

আমি আন্দাজ করতে পারছি, বিদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সোজা কাজ নয়। বিপুল ব্যয়, তাছাড়া অপরিচিত পরিবেশে পদে-পদে বাধা। কিন্তু আমি মোটেই চিন্তিত নই। মা কালী যদি ক্ষমা-ঘেন্না করে প্রবাসী বঙ্গসন্তানদের বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে একদিন তারা মায়ের মন্দির গড়বেই। বাঙালী হিন্দু মাইনাস মা কালী ইজ ইকোয়াল টু মোটরগাড়ি উইদাউট পেট্রোল, রসগোল্লা উইদাউট রস, বন্দুক, উইদাউট গুলি!

অতএব আমার সামান্য কয়েক ঘন্টা সময়ে আমি পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী

অনুযায়ী বাঙালী বিশেষজ্ঞ ঋতেন রায়ের সান্নিধ্যে কাটালাম।

ঋতেন রায়ের খবর আমি পেলাম নীলাদ্রি চাকি এবং প্রশান্ত বসু মহাশয়ের কাছে। এঁরা দু'জনেই এই ভদ্রলোকের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, কানাডিয়ান সরকারী অফিসার হিসেবে তিনি প্রবাসী বাঙালী সমাজকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

ঋতেনবাবুর আপিসে যাবার পথে একটি দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালী তরুণের সঙ্গে দেখা হলো। শুনলাম, এঁর পিতৃদেব অধ্যাপক। বেশ ব্রাইট ছেলেটি। আদর্শবানও বলতে পারেন। ভারতবর্ষ এবং এশিয়াবাসীদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের নোংরামির বিরুদ্ধে বেশ সজাগ। শুনলাম সে সাংবাদিক হবার শিক্ষা নিচ্ছে।

ছেলেটি দুঃখ করলো, এদেশের ভারতীয় বংশোদ্ভুতরা এখনও রাজনীতিতে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কিন্তু নিজেদের অধিকার নিরাপদ করতে হলে রাজনৈতিক সচেতনতা নিতান্ত প্রয়োজন। পড়াশোনায় ভাল হয়েও এই তরুণটিই তাই ধর্মঘটে যোগ দেয়, শান্তিমিছিলে অংশ নেয়, প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান্ধী-অস্ত্র অনশনের যথাযথ ব্যবহার করে।

আমার গাইড বললেন, "ছেলেটির অভিযোগ: সাদারা একদিন নিরীহ নিরপরাধ রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশ কেড়ে নিয়েছিল স্রেফ গায়ের জোরে, আর এখন আমরা এশিয়াবাসীরাও নির্লজ্জভাবে সাদাদের সহযোগিতা করছি—এদেশের আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।"

ছেলেটির সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সুযোগ হলো না। তার তখন জরুরী কাজ রয়েছে। কিন্তু সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে-জিনিসটি আমাকে ভাবিয়ে তুললো তা হলো তার সাজসজ্জা। একটা কানে যেন দুল দেখলাম!

আমি কি ভুল দেখলাম? পুরুষ বাঙালীর কানে দুল কেমন করে থাকবে? আর দু'কানেই বা দুল দেখলাম না কেন?

নীলাদ্রির কাছে যথাসময়ে এর উত্তর পেয়েছিলাম। কানাডিয়ান ছেলেরা এখন এক কানে দুল পরছে। দুল পরবার জন্যে তারা কান ফুটোও করছে! এদের জন্যে বেরিয়েছে বিশেষ লিপস্টিক। এদের গলায় মেয়েলি হার। ফিতে দিয়ে চুল বাঁধতেও এদের জুড়ি নেই। এক কথায় বলতে পারেন স্তনবন্ধনী ও স্কার্ট পরিত্যাগ করে শার্ট ও ট্রাউজারের আশ্রয় নিয়ে মেয়েরা হতে চাইছে পুরুষ, আর লিপস্টিক, নেল পালিশ ও নানা অঙ্গরাগে ভূষিত হয়ে পুরুষরা হতে চাইছে নারী।

তবে ভাববার কিছু নেই। প্রাচুর্যের এই দেশে মানুষ বড় অস্থির—এক একটা ঢেউ ওঠে আবার যথা-সময়ে মিলিয়ে যায়। কোনো ভাবনা-চিন্তাই বেশিদিন এদের মোহিত রাখতে পারে না! আজ যে পুরুষ বেণী রাখছে, রুজ মাখছে এবং বৃহন্নলাভাবে বিভোর থাকছে সে-ই হয়তো সামনের বছরে পালোয়ান স্টাইলে চুল ছোট করে কড়া পৌরুষ জাহির করবে। টরন্টোর চিত্রাঙ্গদারাও তখন হয়তো রমণীসাজে লজ্জাবতী হয়ে উঠবেন।

"বাপমায়েরা শাসন করে না?" আমার প্রশ্ন।

শুনলাম, শাসন করা এখানে খুব শক্ত কাজ। "কানাডায় ছোটদেরও গায়ে হাত তোলা যায় না। জানতে পারলে পুলিশ আসবে বাড়িতে এবং ছোটদের অন্য কোথাও চালান করে দেবে। পাশের বাড়ির বৃদ্ধা আমাদের সাবধান করে দেন—খবরদার, রাস্তায় বা দোকানে ছেলের কান মুলে দিও না। ছেলে খুব অবাধ্য হলে বাড়িতে এসে বকাবকি করবে। ইস্কুলেও যেন না জানতে পারে! এতে তোমাদের বিপদ হতে পারে!"

ঋতেন রায় মহাশয়ের বয়স পঞ্চান্ন, কিন্তু মনটি বেমালুম তিরিশ বছরে পড়ে রয়েছে। ছোট্টখাট্ট আড্ডাবাজ মানুষ। চমৎকার বাংলা বলেন। সহজেই আন্দাজ করা যায় যে এক সময় বাংলা লেখার অভ্যাস ছিল। এখানে মিনিসট্রি অফ মালটি-কালচার অ্যাফেয়ার্স-এ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন। কানাডা সরকারের এইটাই বিশেষত্ব। নানা সংস্কৃতির মানুষ এই মানবতীর্থে উপস্থিত হয়েছে—তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখার জন্যে একটি বিরাট বিভাগ চলছে। ফলে, করুন না আপনি রবীন্দ্রচর্চা—কানাডা সরকার আপনাকে নানাভাবে উৎসাহ দেবেন, এমন কি অর্থ সাহায্য পাবেন। ভাবলে বিস্ময় লাগে, ছোটদের জন্য একটি আদর্শ বাংলা বর্ণপরিচয় লেখাবার জন্যে ওঁরা একজন মহিলাকে বেশ কিছু ডলার দিয়ে সাহায্য করছেন। কানাডা সরকার আন্তরিকভাবে চান অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার চর্চাও এদেশে অব্যাহত থাকুক।

নতুন প্রজন্মের বাঙালীদের বিদ্যাসাগরী প্রথম ভাগ অথবা রাবীন্দ্রিক সহজপাঠে মন ভরবে না—'ধ'-এ ধোপা অথবা 'ঢ'-এ ঢাকী বললে সায়েব-বাঙালীরা কিছুই বুঝবে না, তাদের জন্য প্রয়োজন 'ক'-এ কমপিউটার, 'ট'-এ টিভি। এই পথেই বাংলা বই তৈরি করছেন ঋতেনবাবুর উৎসাহে সিতাংশু চক্রবর্তী মহাশয়ের শিক্ষিকা স্ত্রী।

মালটি-কালচার মন্ত্রকের দপ্তর থেকে বের করে এনে ঋতেনবাবুর সঙ্গে আড্ডা জমানো গেলো এক পানশালায়। কানাডার পানশালগুলির পরিবেশ

বেশ শান্ত। যারা মদ খায় না তারাও বেশ সহজে অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করতে পারেন কোকাকোলা অথবা কানাডা-ড্রাই নামক কোমল পানীয় সহযোগে। কলকাতার পানশালার তুলনায় এখানকার পরিবেশ প্রায় উপাসনালয়ের মতন!

কানাডার বহুবিচিত্র সংস্কৃতি সম্পর্কে ঋতেনবাবু জানেন না এমন বিষয় নেই। দীর্ঘদিন ধরে অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে কানাডীয় সংস্কৃতির এই মূল্যবান দিক সম্পর্কে উনি নানা তথ্য সংগ্রহ করে চলেছেন।

ইহুদি, ফরাসী, ইটালিয়ান, আরব আপনি নাম করুন, ঋতেনবাবু আপনাকে ভূরি-ভূরি খবর জুগিয়ে যাবেন চমৎকার বাংলায় যা আজকাল উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশবাসী ছাড়া আর কোথাও শোনা যায় না।

বহুমুখী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের সঙ্গে কর্মসূত্রে বহুবছর ধরে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও ঋতেনবাবুর মনটি এখনও কিন্তু বাঙালী রয়ে গিয়েছে। কানাডীয় শাসকসমাজে বাঙালী সংস্কৃতির বিশ্লেষণে ইনি সিদ্ধহস্ত—তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রবাসী বাঙালী সমাজের বহু দুর্বলতাও সামাজিক শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। ঋতেনবাবুকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না।

কোকাকোলা পান করতে-করতে ঋতেনবাবু মার্কিনী ডিসিপ্লিনে কানাডীয় বঙ্গীয় সমাজের একটা ছোট্ট বর্ণনা দিলেন। তাঁর বক্তব্য : বিদেশে এখন বাঙালী দু'প্রকারের। দুজনেরই ভাষা বাংলা—কিন্তু একদল ভারতীয়, আর একদল নিজেদের বাংলাদেশী বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত।

ভারতীয় বাঙালীদের প্রসঙ্গে ঋতেনবাবু জানালেন, টরন্টো শহরে ১৯৬৭ সালের আগে একশ জন বাঙালী ছিলেন কিনা সন্দেহ। ১৯৬৩ সালে কানাডিয়ান ইমিগ্রেশন আইন শিথিল করে সাদা ও কালোর বৈষম্য তুলে নেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে ইমিগ্রেশন আইনে বিশেষ কোনো দেশের নাগরিককে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে যাদের ঢুকতে দেওয়া হবে, তাদের শিক্ষা এবং বিভিন্ন কোয়ালিফিকেশনের ওপর জোর দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে ইংলণ্ড ও জার্মানির বাঙালী সমাজের এক অংশ কানাডামুখো হবার সুযোগ পেলেন। ১৯৬৭-৭০ এই সময়ে কেবল জার্মানি থেকে শ'চারেক বাঙালী টরন্টো হাজির হলেন। এঁদের অনেকেই তখনও অবিবাহিত—এদেশে এসে কাজকর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অনেকে দেশ থেকে বাঙালী বউ এনেছেন নতুন মহাদেশে নতুন বাংলা সৃষ্টির স্বপ্নে।

বিশ্বভুবনে, বিশেষ করে আমাদের দেশে জার্মানির ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল—তাঁদের সম্বন্ধে ভারতীয়দের সরাসরি জ্ঞান কম থাকলেও শ্রদ্ধা অনেক বেশি। সেই দেশ ছেড়ে কানাডা যাওয়ার মানে কী আমি বুঝতে পারছিলাম

না। প্রবাসী বাঙালীদের কথায় জানতে পেরেছি চিরকালই বোধহয় একটু অকারণেই জার্মানদের সম্বন্ধে আমাদের বেশি শ্রদ্ধা, সেই হিটলারি আমল থেকে। ইংরেজদের আমরা যতই গালিগালাজ করি, আমেরিকানদের আমরা যতই সমালোচনা করি, অনাবাসী ভারতীয়দের স্বদেশে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁরা জার্মানদের থেকে অনেক বেশি উদারতা ও সহনশীলতা দেখিয়েছেন।

ঋতেনবাবু বললেন, "একদল বাঙালী নতুন টেকনলজি শেখার স্বপ্ন নিয়ে এক সময় জার্মানি পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু হাঙ্গামা অনেক। যেমন ধরুন ভাষার হাঙ্গামা—নাগরিকতা সম্পর্কে রীতিমত অনিশ্চয়তা। একবছরের বেশি কাজকর্ম করার পারমিট পাওয়া কোনো সময়েই সহজ ছিল না। তার ওপর যতই কাজকর্ম ভাল করুন, কর্মোন্নতির পথ প্রায় রুদ্ধ, এই সব ভেবেই জার্মানির বাঙালীদের একটা বড় অংশ আবার দেশছাড়া হতে বাধ্য হলেন। এইভাবে যাঁরা কানাডায় আসবার সুযোগ পেলেন তাঁদের শতকরা নব্বুই ভাগ বসতি স্থাপন করলেন বৃহত্তর টরন্টোয়।

আমরা যে-দেশ সম্বন্ধে যত কম জানি সেই দেশকে তত বেশী শ্রদ্ধা করি। তাই কথায়-কথায় আমাদের জার্মান প্রশস্তি। কিন্তু জার্মানিতে প্রবেশ না করেও স্রেফ ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে যাঁরা কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে বিমান বদল করেছেন তথাকথিত জার্মান ঔদ্ধত্য তাঁদের নজরে পড়তে বাধ্য। আমাদের বাল্যকালে যেসব ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বলদর্পী হিটলারের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁরা যে মূর্খের স্বর্গে বসবাস করতেন তা বোধহয় এখন নির্দ্বিধায় বলা চলে।

জার্মানি ছাড়া ভারতীয়দের সঙ্গে বিদেশে কথাবার্তা বলে দেখেছি যে তাঁরা অনেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবহার ছাড়া কিছুই পাননি ঐ দেশে। সে-তুলনায় ইংলণ্ড তো স্বর্গ! কানাডা অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কথা নাই বা তুললাম।

ঋতেনবাবু বললেন, 'টরেন্টো বাঙালী সমাজের সংখ্যা এখন অন্তত হাজার আটেক হবে। ৯৯% বাঙালী মহিলা বিবাহসূত্রেই এদেশে এসেছেন স্বামীর ঘর করতে। প্রবাসী বাঙালীদের গর্ব করার মতন অনেক কিছুই আছে। এঁরা বিদ্যায় সবাই পি-এইচ-ডি না হলেও, কাজকর্ম ভালই করছেন এবং এঁরা অনেকেই সরকারী পুর্নবাসন সাহায্য ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কানাডীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করছেন।"

ঋতেনবাবু আরও আনন্দের খবর দিলেন। শতকরা আশিটি বাঙালী পরিবারই নিজের বাড়িতে বসবাস করেন। বেশির ভাগ পরিবারেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজ করেন। শতকরা দশভাগ বাঙালীকে প্রফেশনাল বলতে পারেন—এঁদের মধ্যে রয়েছেন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, অ্যাকাউনটেন্ট এবং বৈজ্ঞানিক। ব্যবসায়ী প্রায় নেই বললেই চলে। বাঙালী মেয়েরা যেহেতু সোজা

দেশ থেকে এসেছেন সেহেতু বাঙালী মেয়েদের শিক্ষাগতমান বেশ উঁচু—এম-এ অথবা এম-বি প্রায় কিছুই নয়।

সমাজতত্ত্বের ইংরেজী শব্দ উল্লেখ করে ঋতেনবাবু বললেন,—বাঙালীরা রীতিমত 'কিনশিপ নেটওয়ার্ক ওরিয়েনটেড', কারণ তাঁদের মধ্যে বাঙালিপনা বেশি। এঁদের আর একটা সদগুণ—সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ। নিজের সংস্কৃতির রক্ষা ও বিকাশের জন্যে এঁরা সময় ও অর্থ দুটোই ব্যয় করতে উদ্‌গ্রীব। এঁরা বাংলা শেখার ইস্কুল, বাংলা গানের ইস্কুল, নাচের ইস্কুল চালাচ্ছেন, গানের আসর জমাচ্ছেন। এ ছাড়া আছে বাৎসরিক কর্মসূচী—দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী।

নেটওয়ার্ক ওরিয়েন্টেশনের আরও বড় প্রমাণ এঁরা দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরকে সাহায্য করেন। একজন অসুস্থ হলে আরেকজন এসে রান্না করে দিয়ে যান। "স্বদেশের আত্মীয়ের অনুপস্থিতি আমরা অনুভব করি না। দেশে থাকতে আমরা কখনও এমনভাবে অনুভব করিনি যে একা-একা বাঁচা হবে না, শুধু অন্যের দুঃখকে নয় অনেন্য আনন্দকেও ভাগ করে নিতে হবে।"

ঋতেনবাবুকে প্রাক্-প্রবাসজীবনের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

ভদ্রলোক একটু ভাবলেন। "সেসব কথা মনে রেখে আর লাভ কী বলুন? মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ফিলজফি পড়াতাম। ১৯৭২ সালে নিউ ব্রান্সউইক-এ সিম্বলিক লজিক পড়াবার জন্যে এলাম। তিয়াত্তরে দেশে ফিরলাম, কিন্তু খাপ খাওয়াতে পারলাম না। ভাগ্যে স্বদেশবাস নেই!

"চুয়াত্তরের জুন মাসে আবার চলে এলাম। যখন ফিরে এলাম তখন হাতে চাকরিও ছিল না। কোনো রকমে দিন গুজরান। সরকারী চাকরিতে ঢুকলাম ১৯৮০ সালে। এদেশের নাগরিকত্ব নিয়েছি। মধ্যিখানে খুব কষ্ট পেয়েছি।"

"নিজের পায়ে দাঁড়াবার পর্যায়ে যথারীতি দত্ত-মোহান্ত জুটির উদার প্রশ্রয় পেয়েছি। এঁরা আপনার মাথার ওপর ছাতা ধরেই আছেন। আপনার কষ্ট কীভাবে লাঘব হয়, দুটো পয়সার কী করে সাশ্রয় হয় তা দেখবার জন্যে এঁরা উদ্‌গ্রীব। মনে আছে একবার বাড়ি বদলালাম। যাতে আমার খরচ কম হয় সেজন্যে নিজেরাই গাড়ি করে বারবার ওঁরা মাল বয়ে নিয়ে গেলেন। এই হচ্ছে আমাদের অসিত দত্ত ও সনাতন মোহান্ত। এঁদের বুকের ভিতরটা সোনা দিয়ে মোড়া।"

১৯৭৭ ও ১৯৮২ সালে ঋতেনবাবু নিজের জন্মভূমি দেখে গিয়েছেন। "মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে যেতে ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'নিশ্চয় অনেক টাকাকড়ি করেছো।' আমি বললাম, 'অর্থনৈতিক সেনস্-এ দেশে খারাপ ছিলাম না। কিন্তু

কানাডায় আমি আত্মোন্নয়ন করতে পেরেছি, ইংরিজিতে যাকে বলে পার্সোনাল গ্রোথ্। কলকাতায় আমি অনেক আজেবাজে জিনিস পড়াতাম। ওঁরা বললেন, 'তুমি ক'বছর বিদেশে থেকেই দেশ সম্বন্ধে এইরকম কথা বলছো!' যে-দেশে আমি জন্মেছি, সে দেশের প্রতি টান কেন কমবে বলুন তো? ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি। কিন্তু বিদেশ আমার চোখ খুলে দিয়েছে। একজন প্রাক্তন মাস্টারমশাই হিসেবে আমি বলবোই—ছাত্রদের প্রয়োজন সম্পর্কে কলকাতায় কারও তেমন মাথাব্যথা নেই, তাই শিক্ষাব্যবস্থাটা কাজে লাগছে না।"

মনে হলো, ঋতেনবাবু খুব মানসিক কষ্ট পাচ্ছেন। তাই অন্য বিষয়ে আসা গেলো।

তিনি বললেন, "টরেন্টোর লোকসংখ্যা লাখ তিরিশেক। শতকরা দশভাগ ইহুদি। শিখ পাঞ্জাবীর সংখ্যা হাজার পঁচাত্তর, গুজরাতী হাজার ষাটেক, তামিল-তেলেগু হাজার দশেক এবং তার পরেই বাঙালী। শিখরা বহুদিন আছেন—তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত। গুজরাতীরা সবচেয়ে বিত্তশালী। মিলিয়ন ডলারের মালিক বেশ কয়েক ডজন। এঁদের সিনেমা হল্ আছে, হোটেল মোটেল আছে, কমপিউটার বিজনেস আছে। চন্দ্রচূড় বলে এক ভদ্রলোকের তো কুড়ি পঁচিশ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। অর্থের দিক থেকে বাঙালীরা সবচেয়ে দরিদ্র এবং সংস্কৃতির দিক থেকে এখনও সবচেয়ে ধনী।"

সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঋতেনবাবু বললেন, "নবাগত অনাবাসীদের মধ্যে সাধারণতঃ সামাজিক পরিপক্কতার অভাব দেখা যায়।"

সামাজিক পরিপক্কতা নাকি ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সামাজিক সংগঠনে এঁরা তুলনাহীন।

"যে কোনো সংস্কৃতিকে যদি বজায় রাখতে হয়, তা হলে প্রশ্ন এটা নয় কীভাবে সংস্কৃতিকে রক্ষা করবো, প্রশ্নটা হলো কীভাবে তার প্রসারতা বাড়াবো। এদেশে ভারতীয়দের সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে গেলে অন্যের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে অন্যের সংস্কৃতিও মন দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। না হলে আমাদের সামাজিক নির্বাসন ঘটবে। কালো সম্প্রদায় এদেশের মাত্র ৩%। বাকি ৯৭% সাদা। সুতরাং আমাদের সাংস্কৃতিক অনুশীলন নিজেদের মধ্যে সীমিত রাখলে আমরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে একঘরে হয়ে থাকবো। আমাদের সংস্কৃতি শুধু আমাদের প্রয়োজন মেটাবে, কিন্তু মূল প্রবাহে পৌঁছবে না, তা হলে আমরা চিরকাল অবহেলিত হয়ে থাকবো। সুতরাং মূল প্রবাহকে কীভাবে আমাদের সংস্পর্শে আনা যায় তার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে হবে।"

ইহুদিদের কথা উঠলো। ওনটারিও স্টেটের সত্তর লাখ মানুষের মধ্যে ইহুদির সংখ্যা সত্তর হাজার। নিজেদের সামাজিক উপস্থিতি এঁরা সবসময় সোচ্চার রেখেছেন নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এঁরা শুধু নিজের সমাজকেই অর্থ দেন না, বৃহত্তর সমাজকেও দান করেন। এঁরা কানাডীয় সমাজকে টাকা দেন আবার ইজরায়েলেও টাকা পাঠান।

"আপনি আমেরিকান ইহুদি অভিনেতা হেনরি ফণ্ডার কথা ধরুন। মৃত্যুর পরে উইলের বিবরণ বেরলো। নিজের ডাইভোর্সড্ স্ত্রীকে দিয়েছেন এক মিলিয়ন ডলার। মেয়ে জেন নিজেই বিখ্যাত, তার অর্থের প্রয়োজন নেই বলে কিছু দেননি। বাকি কয়েক মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন জেরুজালেমের ইহুদি বিশ্ববিদ্যালয়কে। আপনি লক্ষ্য করবেন, ইহুদিদের সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রচণ্ড—এঁরা অবশ্যই স্বদেশে ও বিদেশে আমাদের আদর্শ হতে পারেন।"

আরও অনেক কথা হলো ঋতেনবাবুর সঙ্গে। বললেন, "সমাজতত্ত্বটা ভারতবর্ষে তেমনভাবে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে না। যদি পারেন ওদিকে একটু নজর রাখবেন, এতে ভারতবর্ষের নতুন প্রজন্মের খুব উপকার হবে।"

আমার শেষ প্রশ্ন ছিল : "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডীয় সমাজের মধ্যে কোনো তফাত আছে কিনা?"

ঋতেনবাবু বললেন, "অবশ্যই আছে। বিদেশ থেকে আগতদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণী হলো : 'আমেরিকায় এসেছেন—সুস্বাগতম্। আসুন, আমাদের একজন হয়ে যান'! আর কানাডা বলে : 'কানাডায় এসেছেন—সুস্বাগতম্। আপনি যা আছেন তাই থাকুন'। বৈচিত্র্যর মধ্যে ঐক্য কথাটা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, জওহরলাল নেহরুও প্রায়ই তার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পৃথিবীর একটি মাত্র যে-দেশ তা স্বেচ্ছায় জাতীয় নীতি হিসেবে বরণ করে নিজের দেশকে বহু সংস্কৃতির মিলন তীর্থরূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে তার নাম কানাডা।"

কানাডায় সুস্বাগতম্—কিন্তু যেমন আছো তেমনি থেকো, নিজেকে হারিয়ো না—শুনতে খুব ভাল, কিন্তু কাজে কতখানি সম্ভব?" এই প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং মিছরিদা।

মিছরিদার মেজাজ বেশ শরিফ। গতকাল আরও দুটি উপনয়ন সংস্কারে পৌরোহিত্য করেছেন।

"যে-হারে এদেশে গোখাদক ব্রাহ্মণ বালকদের পৈতে জড়াচ্ছেন তাতে ভারত

সেবাশ্রম সঙ্ঘের পরেই ইতিহাসে সনাতন ধর্মের প্রচারক হিসেবে আপনার নাম উঠে যাবে।" আমি বোকার মতন বলে বসলাম।

মিছরিদা সদ্য-কেনা পোলারয়েড সানগ্লাসটি নাক থেকে নামিয়ে আমার দিকে বড়-বড় চোখে তাকালেন। "পৃথিবীর সব ধর্মেই যাজকরা বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করছেন শত-শত বছর ধরে একমাত্র এই আমরা ছাড়া। নিজের ধর্মের দুটো লোককে ধর্মীয় সংস্কার শেখাচ্ছি তাতেও তোদের আপত্তি?"

"আপত্তি নয়, মিছরিদা! আমরা আপনাকে ধর্ম-প্রচারকের ভূমিকায় দেখছি!"

"রাখ রাখ। তোদের হাওড়া-কাসুন্দের স্তুতির নামে নিন্দের স্টাইল আমার হাড়ে-হাড়ে জানা আছে। পঞ্চাশ পেরিয়েছিস তবু তুই ও শঙ্করীপ্রসাদ ওই সব ছেলেমানুষি ছাড়লি না। তোদের হবে কী?"

মিছরিদা এবার সস্নেহে বললেন, "তোর ওপর রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারছি না, কারণ তুই বুদ্ধিমানের মতন কাজ করেছিস ওই সনাতন ধর্ম কথাটা ব্যবহার করে। এ-দেশে আমাদের গাঁয়ের লোক যেসব রয়েছে তারা কেউ জানে না যে খাতায় কলমে হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্ম নেই—শাস্ত্রে-পুঁথিতে যে-নামটা পাবি তা হলো সনাতন ধর্ম। কঠোপনিষৎ-এ বলেছে 'উপাখ্যানম্....সনাতনম্'। অভিধানে অর্থ দেখবি—অনাদিভূত, নিত্য, চিরকালীন। যা সর্বদা একরূপ। আর এই একটি শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজনকেই বোঝাচ্ছে, যেমন সনাতনী বলতে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী থ্রি-ইন ওয়ান।"

এবারে মিছরিদার ওপর একটু আক্রমণ। "ব্রাহ্মণ সংখ্যা বাড়াবার উদ্দীপনায় আপনি বিদেশে ভারতীয় সেতার বাদকদের মতন সনাতন নিময়কানুনের খাঁটি দুধে জল ঢালছেন। আমি তো দেশে শুনেছিলাম আট বছর থেকে বার বছরের মধ্যে পৈতে না দিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। অথচ আপনি যাদের গলায় পৈতে জড়িয়েছেন তারা তো দ্বাদশ বর্ষীয় বালক নয়।"

"অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।" মিছরিদা চটছেন।

রবীন্দ্রনাথ নন, অন্য কারুর উক্তি, এই ইঙ্গিত পেয়ে মিছরিদা দমলেন না। "রবীন্দ্রনাথ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তিনিও এমন কথা বলতে পারতেন। শোন্, ওই বুধবার যাকে বাউন করলাম, তার মেমসায়েব মা-ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি খোদ শাস্ত্র থেকে বক্তব্য উদ্ধৃতি দিলাম। গর্ভাষ্টম বা অষ্টবর্ষ থেকে দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নকাল। কোনো কোনো ঋষি বলেছেন, যে-বালকের ব্রহ্মতেজ কামনা করা যায়, তার উপনয়ন পঞ্চম বর্ষেই হবে। দ্বাদশবর্ষ গত হলে 'ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি' হোম করে উপনয়ন দিতে হয়। ষোল বছর হলে ব্রাহ্মণ বালকের ব্রাত্যদোষ ঘটে।"

"আমরা যে শুনেছি ষোল বছরে সাবিত্রী পতিত—আর উপনয়ন হয় না।"

"প্রাচীন ঋষিরা তোদের মতন গোঁয়ারগোবিন্দ ছিলেন না—নিয়মও করেছেন এবং নিয়ম ভাঙবার পথও রেখেছেন। সুতরাং তুই আমার উপনয়ন এবং সমাবর্তনে বাগড়া দিতে পারবি না। ষোলো বছর হলেই দোষ নিবারণের জন্যে 'চান্দ্রায়ণ' ও 'গোমূল্য' দানের ব্যবস্থা করে তবে আমি কাজে নামি।"

সমাবর্তনের পর নবীন ব্রাহ্মণকে আচার্যদেব যেসব নিয়মকানুন গোপনে শিক্ষা দেন তার উল্লেখ করে বললাম, "উপদেশগুলো আমার নোটবইতে লেখা আছে, মিছরিদা—রাত্রিতে স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না, ধাবমান হইবে না, বৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কোনো বিষয় সন্দিগ্ধ হইবে না।"

একহাত নিলেন মিছরিদা। "আরও একটা আইটেম তুই ইচ্ছে করেই বাদ দিচ্ছিস—'নগ্না স্ত্রী দর্শন করিবে না।' আমি বিদেশে পৈতে দিচ্ছি, তাই বলে দিই যস্মিন দেশে যদাচার। ধাবমান না হলে এ দেশে বেঁচে থাকবে কী করে বাপধন ?"

মিছরিদা বললেন, "একজন মেমসায়েব-বউমা আমার সমাবর্তনটা বুঝতে পারলেন না ! তাঁর ডাক্তার স্বামীটিও সেই রকম। বললেন, সমাবর্তন মানে তো 'কনভোকেশন'—এম-বি-বি-এস পাশ করে ইউনিভার্সিটি কনভোকেশনে আমরাও উপস্থিত থেকেছি।"

মিছরিদাকে এরপর ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, "পূর্বকালে ব্রহ্মচারীকে উপনয়নের পর গুরুগৃহে গিয়ে বেদপাঠ করতে হতো। বেদপর্ব শেষ করে স্বগৃহে ফিরে এল সমাবর্তন সংস্কার হতো। এখন কে আর গুরুগৃহে যাচ্ছে ? তাই একই দিনে চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং সমাবর্তন সারা হচ্ছে।"

মিছরিদা আজও পপ-এর ওপর রয়েছেন। পুরো এক টিন কানাডা-ড্রাই নামক নরম পানীয় সেবন করে আর একটি আনিয়ে নিয়েছেন। সমাবর্তন থেকে শিক্ষাব্যবস্থার কথা উঠলো। মিছরিদা বললেন, "সনাতন ধর্মের যতই গুণ গাই, লেখাপড়ায় এরা আমাদের মেরে বেরিয়ে যাবে। তুই গোটা কয়েক ইস্কুল ঘুরে যা—ডক্টর চক্রবর্তীর পুত্রবধূ তোকে সাহায্য করবে।"

মিছরিদাই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। বললেন, "আমাদের সময়ে এবং তোদেরও কম বয়সে যার কিছু জুটতো না সে ইস্কুল মাস্টার হতো। এখানে কিন্তু মাস্টার অথবা মাস্টারনী হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। ঐ যে ডাক্তার প্রশান্ত

বসু, ওঁর ছেলে প্রদীপ। পড়াশোনায় এতো কৃতী, ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সে ডিগ্রি নিয়ে এখন ইস্কুলে মাস্টারি করছে। প্রদীপ একজন চৌকশ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়, কিন্তু তার জীবিকা হলো যাদের আমরা মাথা-মোটা বলি অর্থাৎ যারা শিখতে একটু বেশি সময় নেয় (স্লো লার্নার) তাদের মাস্টারমশাই।"

"মাথা-মোটাদের নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে কী লাভ, তুই হয়তো বলবি। আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু দুঃখহরণ চক্রবর্তীর পুত্রবধু আমার চোখ খুলে দিয়েছে। তোকে দুটো মাথা-মোটা ছেলের বর্ণনা দিচ্ছি। একজনের বয়স সাত—সেকেণ্ডারি ইস্কুলে পড়ে খুব দেরিতে কথা বলতে শেখে। সব বিষয়ে চৌকশ নয়, ছ'মাসের জন্যে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল, মাস্টারমশায়রা মোটেই সন্তুষ্ট নন—তাঁদের ধারণা প্রবলেম চাইল্ড। পিতৃদেবও বিরক্ত—ইস্কুলে কারও সঙ্গে মেশে না, খেলাধূলোতেও বিন্দুমাত্র ঝোঁক সেই, একটি জড়ভরত টাইপ।"

"এই ছেলেকে তোরা নিশ্চয় খরচের খাতায় লিখে দিবি। কিন্তু শুনে রাখ, এই ছেলেটি হলো অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। চোখ ছানাবড়া করিস না," হুঙ্কার ছাড়লেন মিছরিদা। "তুই লেখক হয়ে নাম কুড়োবি, আর আমি তার লেখার উপকরণ সংগ্রহ করে মরবো এই কানাডাতে এসেও ! তুই যদি হাওড়ার ছেলে না হতিস তা হলে কোনো খবর দিতাম না, বরং খবরের কাগজে বেনামে চিঠি লিখে তোর লেখা যে রাবিশ তার ইঙ্গিত দিতাম।"

"মিছরিদা, পরের ধনে পোদ্দারি করাই তো আমার মতন সাধারণ লেখকের পেশা। পরের জীবনে যা ঘটে তাই আমি জোগাড় করে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিই। আমি তো নিজে কোনো কৃতিত্ব দাবী করি না, সবই আপনাদের নামে উদ্ধৃতি দিই, সেই সঙ্গে সবসময় বলি মিছরিদা যুগ যুগ জিও।"

খুশি মনে মিছরিদা বললেন, "পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরি, আর বলে নিলে ডাকাতি। তুই আমার অন্ধ-হাওড়া-প্রীতির সুযোগ নিয়ে আমার সর্বস্ব শুষে নিচ্ছিস, দেশে একখানা জ্ঞানগর্ভ চিঠি লেখার মালমশলা পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতে পারলাম না।"

"যা-হোক, শোন এবার এক ছ'বছরের ছোকরার কথা। জন্মবার সময়েই বিরাট সাইজের মাথা—লোকের ধারণা 'ব্রেন ফিভার'। আত্মীয় এবং পড়শিদের ধারণা গবেট হয়েই জন্মেছে ছেলেটা, কিন্তু সন্তান স্নেহে অন্ধ মা মেনে নিতে পারছেন না ব্যাপারটা। ইস্কুলের মাস্টারমশায়রা সোজা বলে দিলেন, এ-ছেলের মানসিক অসুস্থতা রয়েছে। মা তো শুনে খাপ্পা। বললেন, ঠিক হ্যায় আমি ছেলেকে ইস্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছি, আমি ওকে বাড়িতে নিজে পড়াবো। এমন মা তো হাজার-হাজার হয় না, হলে হয়তো আমরা হাজারে-হাজারে টমাস আলভা এডিসন-এর মতন বৈজ্ঞানিক পেতাম। বাল্য বয়সের এই রেকর্ড দেখে

ক'জন বুঝবে এই ছেলেই টমাস এডিসন হবে ?"

থ্যাংক ইউ মিছরিদা, আপনার জন্যেই বিদেশের মাটিতে কোনো চেষ্টা না-করেই চমৎকার এক বাঙালী শিক্ষিকার অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নিতে পারলাম। রীণা চক্রবর্তীর শিশু-অন্ত-প্রাণ। কলকাতায় গোখেলে অধ্যাপিকা ছিলেন। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্যে আমেরিকায় আসেন—সেখানে থেকে সনাতন মোহান্তর টরন্টো ধর্মশালায়। তারপর যথাসময়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। এঁর স্বামী সিতাংশু চক্রবর্তীর কথা আগেই কিছুটা বলেছি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

মিছরিদা বললেন, "আমি একটু ভবতারণের ওখানে ঘুরে আসি। ছেলে বউ নিয়ে সুখের সংসার পেতেছিল এখানে, হঠাৎ স্বদেশে ফিরে যাবার বাই জন্মেছে। আরে বাবা, দেশকে এবং দেশ-জননীকে ভালবাস—কিন্তু দূর থেকে। ভালবাসার প্রমাণ দেবার জন্যে বেহালায় বা বড়িশায় ফ্ল্যাট নেবার কোনো দরকার নেই। কিন্তু ভবতারণ নাকি বেপরোওয়া, ইতিমধ্যেই এখানকার বাড়ি বেচে দিয়েছে, চাকরিতে রেজিগনেশন পাঠিয়েছে। বউটা হাওড়ার মেয়ে—সেও কিছু বলছে না। যাই দেখি, একবার শেষ চেষ্টা করে।"

আমি বললাম, "দরকার হলে নীলাদ্রি চাকীর সাহায্য নিন। উনি রবি ঠাকুরের সময়োপযোগী কোটেশন সাপ্লাই করতে পারবেন।"

"ওরে কোটেশন নয়, এখন মোটিভেশনের প্রয়োজন—বিদেশে যত স্বদেশবাসী রয়েছে, তাদের মধ্যে যদি দেশে ফেরার জেদ চেপে যায় তা হলে ইণ্ডিয়ার, বাংলাদেশের এবং পাকিস্তানের কী অবস্থা হবে ভেবে দেখ তো।"

রীণা চক্রবর্তীর মতন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না বাঙালী মহিলা সচরাচর দেখা যায় না। নিজের প্রচেষ্টায় প্রবাসে ভারতীয় পুরষরা অনেকেই তাঁদের স্বপ্নকে সম্ভব করে তুলেছেন, কিন্তু এই ধরনের মহিলার সংখ্যা এখনও বেশ কম। আমাদের মহিলারা এখনও স্বামীর গৌরবেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে ভালবাসেন, নিজের ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার বিকাশের দিকে তেমন ঝোঁক নেই।

শ্রীমতী রীণা চক্রবর্তীকে অসাধারণ বললাম এই কারণে যে, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রচণ্ড মনোবলের সঙ্গে তিনি পেশাগত ও সাংসারিক সবরকম দায়দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। নিজের কন্যা সন্তানটি ছাড়াও তাঁর সীমিত অর্থবলের মধ্যে ভারতবর্ষে চারটি অসহায় বালক-বালিকার সবরকম দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এই বালক-বালিকাদের স্বচক্ষে এখনও দেখা হয়নি, কিন্তু রীণা এদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং এদের

পড়াশোনা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক প্রগতি সম্বন্ধে সবিস্তারের খবরাখবর রাখেন।

প্রবাসের বাঙালী বালক-বালিকাদের সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তা রয়েছে। এঁদের বাংলা শেখাবার প্রচেষ্টা বারবারই ব্যর্থ হয়। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক এবং ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদির অভাব সম্পর্কে কথা বললেন। প্রায় পনেরো কোটি মানুষের ব্যবহৃত কোনো ভাষার প্রচার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে এতো বেশি অববেলা ও অবজ্ঞা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। রীণা চক্রবর্তী কানাডিয়ান সরকারের সাহায্যে একটি নতুন বাংলা বর্ণপরিচয় লিখছেন বিদেশী বাঙালীদের মানসিকতার কথা মাথায় রেখে।

বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সন্তান-সন্ততিরা শিক্ষাক্ষেত্রে কেমন করছেন, কোথায় তাদের বাড়তি শক্তি, কোথায় তাদের অত্যধিক দুর্বলতা যদি জানতে চান তাহলে রীণা চক্রবর্তীর সঙ্গে কয়েক ঘন্টা কথা বলা খুব কাজের হবে।

পশ্চিমী সভ্যতা এই মুহূর্তে পশ্চিমী শিশুদের ওপর কী অভাবনীয় চাপ সৃষ্টি করছে তা না জানা থাকলেও দেশের ইস্কুলে শিক্ষিকার ভূমিকা বোঝা বেশ শক্ত হয়ে উঠতে পারে।

রীণা চক্রবর্তীর মতে, ছোটদের বলবার আছে অনেক কিছু কিন্তু ওদের মতন করে বলবার ক্ষমতা খুব কম মানুষের আছে।

রীণা চক্রবর্তী অনুরোধ করলেন, "সময় পেলেই বিখ্যাত শিশু মনস্তাত্ত্বিক ডেভিড এলকিন্ড-এর 'দ্য হারিড চাইলড' বইটি পড়ে নেবেন, আপনার দৃষ্টি খুলে যাবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত বেগে বড়ো হয়ে ওঠার মধ্যে যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে তা আমরা সব সময় অবহিত হই না।"

আমার মনে পড়লো, মা বলতেন, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রীণা বললেন, "এ-দেশে ছোটদের ব্যাপার-স্যাপার আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে। আর্থিক স্বার্থে উকিলরা পর্যন্ত এদের ব্যবহার করছেন। শুনুন একটি ঘটনা। একটি সাড়ে-চার বছরের মেয়ে মামলা করেছে তার বাবার বিরুদ্ধে। মেয়েটির জন্ম-বাপ-মায়ের বিবাহ বন্ধনের বাইরে। বাবা তবু নিয়মিত খোরপোষ দেয় মেয়ের মাকে, কিন্তু যোগাযোগ রাখে না। এখন ছোট মেয়েটি মামলা করেছে, শুধু পয়সা দিলেই হবে না, মাঝে-মাঝে এসে দেখে যেতে হবে।"

কনেকটিকাট, ইউ-এস-এ—তো এখন নতুন আইন অনুযায়ী বাপ কিংবা মাকে 'ডাইভোর্স' করা যায়। ষোলো বছরের ছেলে ডেভিড বার্নস্ মামলা করে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে ডাইভোর্স নিয়েছে।

ডাইভোর্সের এই নবতম বিস্তার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। রীণার দেওয়া তথ্য থেকে জানা গেলো, কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বেশ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। টিন-এজারদের মধ্যে এইটাই হলো মৃত্যুর অন্যতম কারণ—এর ওপরে অবশ্য রয়েছে পথ দুর্ঘটনা এবং খুন। আমেরিকায় এইভাবে প্রতি বছরে অন্তত হাজার পাঁচেক কমবয়সী ছেলেমেয়ে আত্মহত্যা করে। সংখ্যা বাড়ছে। আর আত্মহত্যার চেষ্টা করে যারা ব্যর্থ হয় তাদের সংখ্যা অন্তত পঞ্চাশ থেকে একশ গুণ বেশি।

যা বুঝলাম, প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার পরিবেশে পড়ে আমেরিকা মহাদেশের মানুষ ক্রমশই তাদের মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলছে। সারাক্ষণই কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার আশঙ্কা এবং পিছিয়ে পড়বার ভয়। নিরাপত্তাবোধের অভাব রোজগারি মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তুলছে। এই প্রতিযোগিতার মানসিকতা ইস্কুলে-কলেজেও ছড়িয়ে পড়ছে।

এরই মধ্যে চলেছে শিশুদের নিয়ে নির্লজ্জ ব্যবসায়িকে প্রতিযোগিতা। জিনিসপত্র বিক্রির প্রচারে ছোটদের দিকে অকারণে নানা বিজ্ঞাপনের তীর ছোঁড়া হচ্ছে। এর প্রধান অংশটাই টি-ভি-র মাধ্যমে।

ডেভিড এলকিণ্ড দুঃখ করছেন, প্রতি বছর মার্কিনী শিশুরা অন্তত কুড়ি হাজার কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপন দেখছে এবং ছোটদের মাথা চিবনোর জন্যে মার্কিনী কোম্পানিরা হাজার-হাজার কোটি টাকা খরচ করছেন। ছোটরা বিজ্ঞাপন এবং প্রোগ্রামের পার্থক্য বুঝতে পারে না, টি-ভিতে যা দেখানো হয় তাই সত্য বলে মনে করে, ফলে বিজ্ঞাপনদাতাদের পরিকল্পনা সফল হয়। তারা প্রত্যেক বাড়িতে একটি দুটি করে খুদে কোম্পানি 'প্রতিনিধি' তৈরি করছে যারা সুযোগ পেলেই বাবা-মায়ের উপর চাপ দেবে টি-ভিতে বিজ্ঞাপিত জিনিস কিনতে।

আমেরিকা ও কানাডায় ছোটদের ইস্কুলগুলি দেখবার জিনিস। শিক্ষার ব্যাপারে আমরা কতটা পিছিয়ে পড়েছি, আমাদের শিক্ষকদের অধিকাংশ কত কম দায়িত্ব পালন করেন তা যদি বুঝতে চান তা হলে আপনাকে ও-দেশের ইস্কুলে যেতে হবে কয়েক দিন।

কিন্তু ও-দেশে কি ছোটদের বড্ড বেশি আস্কারা দেওয়া হয়? ওখানে কি নিয়মানুবর্তিতা কম?

বলা বাহুল্য, ছাত্রদের দৈহিক নিগ্রহ বে-আইনী। এর ফলে জেল হতে পারে, বিরাট মামলায় পড়তে পারেন মাস্টারমশায়।

ছাত্রনিগ্রহের উল্টোদিকও আছে, যে-বিষয়ে কেউ বেশি মুখ খোলে না। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, ছাত্ররা প্রায়ই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মারধোর করছে।

স্ট্যাটিসটিকস্ না-দিলে যাঁরা কিছু বিশ্বাস করেন না তাঁরা শুনুন, ছাত্রের হাতে মার খাবার ভয় মাস্টারমশায়দের মজ্জায়-মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। অনেক ইস্কুলে বিমানবন্দরের মতন ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি যন্ত্র বসানো হয়েছে, যাতে ছাত্র-ছাত্রী কোনো মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে ক্লাশ ঘরে ঢুকতে না পারে।

ন্যাশনাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়শনের সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, এক বছরে এক লাখ দশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ইস্কুলের মধ্যেই মার খেয়েছেন। বাড়ির বাইরে পথে-ঘাটে মার খেয়েছেন আরও হাজার দশেক। আঘাত এতোই গুরুতর যে হাজার কুড়ি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে হাসপাতালে অথবা ক্লিনিকে পাঠাতে হয়েছে। সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রতি দশজনের মধ্যে একজন শিক্ষক ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন কখন ছাত্রদের মারধোর হজম করতে হয়। এর সঙ্গে আছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ভেঙে দেওয়া বা চুরি করা। জিনিস চুরি হয়ে যাবার ভয় শান্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরও থাকে। সতীর্থদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ও প্রবল।

অতি কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ওপর কী ধরনের চাপ পড়ে তার মর্মস্পর্শী ছবি ডেভিড এলকিণ্ডের বই থেকেই পাওয়া গেলো। একটি চার বছরের ছেলে, ধরা যাক তার নাম পিটার। এর বাবা মা দু'জনই চাকরি করেন। তাই পিটারের জন্যে দিনের বেলায় প্রাইভেট নার্সারি স্কুলের ব্যবস্থা হয়েছে। বাবা ও মা দু'জনকেই খুব সকালে বেরিয়ে পড়তে হয়, তাই পিটারকে তাঁরা জানাশোনা এক পড়শির বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যান।

এই প্রতিবেশী পিটারকে তৈরি করে ন'টার সময় ইস্কুলের গাড়িতে তুলে দেন। দুপুরের পরে ইস্কুলের গাড়ি আবার পিটারকে পাড়ার মোড়ে নামিয়ে দেয় এবং সেখান থেকে হাঁটতে-হাঁটতে পিটার প্রতিবেশীর বাড়িতে হাজির হয়।

সন্ধ্যের দিকে বাবা অথবা মা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরবার মুখে ওকে বাড়ি নিয়ে যায়।

বলাবাহুল্য, পিটার ইস্কুলে ভাল ফল করছে না। তার মেজাজ খারাপ থাকে, খেলায় পর্যন্ত মন নেই। দোষ দেওয়া যায় কি পিটারকে? ওইটুকু শিশুকে চারটে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিদিন খাপ খাইয়ে নিতে হয়—নিজের বাড়ি, প্রতিবেশীর বাড়ি, ইস্কুলের গাড়ি, ইস্কুল, আবার ইস্কুলের গাড়ি, প্রতিবেশী এবং নিজের বাড়ি। এই রকম শিশু আপনি বিদেশে হাজার হাজার পাবেন।

যে-সংসারে আবার স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেখানে আর এক মর্মান্তিক পরিস্থিতি। জেনেট নামে দশ বছরের এক বালিকার কথা শুনুন।

ডাইভোর্সড অবস্থায় জেনেটের মা দুটি মেয়ে নিয়ে কোনোক্রমে দিন চালান। তাঁকে অবশ্যই চাকরিতে যেতে হয়। খুব ভোরেই তিনি বেরিয়ে পড়েন। নিজের

ঘর গুছনো, নিজের জামাকাপড়ের দায়িত্ব তো আছেই, প্রতিদিন জেনেট ব্রেকফাস্ট তৈরি করে বোন ও নিজের জন্যে, তার পরে বোনকে নিয়ে ইস্কুলের জন্যে বেরিয়ে পড়ে।

বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে জেনেট বাড়ি পরিষ্কার করে। ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে ডিনার তৈরির জন্যে কেটে রাখে। বোনকেও দেখাশোনা করতে হয়। মা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এলে কর্মক্ষেত্রে সব রকম নিগ্রহের কথা মন দিয়ে শুনতে হয় জেনেটকে। ওখানকার কয়েকটি লোকের মতিগতি ভাল নয়, মা খুব ভয় পেয়ে জেনেটকে সব শোনান।

ক্লান্ত মাকে ডিনার তৈরিতে সাহায্য করতে হয় জেনেটকে। খাবার পরে মা বলেন, লক্ষ্মী সোনা, আমার শরীর বইছে না, এঁটো বাসনগুলোর একটা গতি করো।

ছোট্ট বয়সে বিরাট এই দৈহিক ও মানসিক দায়িত্বের বোঝা বহন করে জেনেট যে ইস্কুলে আশানুরূপ ফল করবে না এতে আশ্চর্যের কী?

রীণা চক্রবর্তী বললেন, "ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কোনো সমস্যা নজরে পড়লে তা সময়মতো যথাস্থানে না জানালে কানাডিয়ান শিক্ষকদের হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে আদালতে।"

আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। রীণা চক্রবর্তী বললেন, "ছোটদের ওপর কতরকম যে শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়তে পারে তা এ দেশে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ডেভিড এলকিণ্ড তেতাল্লিশ রকম পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন।"

এক ধরনের চাপের জন্যে এক-এক রকম পয়েন্ট দেওয়া হয়। কোনো বালক-বালিকার ওপর মোট চাপ ১৫০ পয়েন্টের কম হলে স্বাভাবিক, কিন্তু ৩০০ পয়েন্টের বেশি হলে খুব খারাপ। এই সব চাপ এবং কোন চাপের জন্যে কত পয়েন্ট, তার কিছু নমুনা শুনুন।

বাবা অথবা মায়ের—মৃত্যু (১০০), ডাইভোর্স (৭৩), বিচ্ছেদ (৬৫), সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর চাকরি (৬৩), পুনর্বিবাহ (৫০), চাকরি যাওয়া (৫০), পুনর্মিলন (৪৫), নতুন কোনো জায়গায় উঠে যাওয়া (২৬), বাড়ি বদল করা (২০)। মায়ের চাকরি করা (৪৫), সন্তানসম্ভবা হওয়া (৪০), ছোট ভাইবোনের জন্ম (৩৯), সংসারে আর্থিক অবস্থার অবনতি (৩৮), ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি হঠাৎ বেড়ে যাওয়া অথবা কমা (৩৫), জিনিসপত্তর চুরি হওয়া (৩০), দাদু-দিদিমার সঙ্গে গোলমাল (২৯), মাস্টারের সঙ্গে গোলমাল (২৪), হঠাৎ খুব ভাল ফল হওয়া (২৮), ইস্কুল পাল্টানো (২০), ছুটিতে বেড়ানো (১৯), খাওয়া-দাওয়ার পরিবর্তন (১৫), যতক্ষণ টি-ভি দেখা অভ্যাস তার কম-বেশি হওয়া (১৩),

জন্মদিনের পার্টি (১২), সত্যি কথা না বলার জন্যে শাস্তি (১১)—ইত্যাদি ইত্যাদি।

চাপে পড়লেই কি মানুষ খারাপ হয়ে যায় ? রীণা চক্রবর্তীর মতে আমাদের দেশের কথা কিছুটা আলাদা। চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কত মানুষ ভাল হবার সাধনা করছে।

পশ্চিমে ধরেই নেওয়া হয়, কষ্ট মানুষকে নষ্ট করে। যদিও বইতে আজকাল কষ্টজয়ী বালক-বালিকাদের কথাও কিছু-কিছু লেখা হচ্ছে।

যেমন ধরুন, মিনিয়াপলিস-এর একটি দশ বছরের বালকের কথা। একটা ভাঙা ভুতুড়ে বাড়িতে সে বাবার সঙ্গে থাকে। বাবা দাগী আসামী, জেল খেটেছেন। এখন ক্যানসারে মৃত্যুপথযাত্রী। মা নিরক্ষর। সাতটি ভাইবোনের মধ্যে দুটি গবেট। তবু এই ছেলেটির পড়াশোনায় সাফল্য সম্পর্কে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইস্কুলের সবাই একে ভালবাসে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সে আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হাসিমুখে।

পাগল এক মায়ের তিন ছেলেমেয়ের কথা শুনুন। এঁর ধারণা, বাড়ির খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে। বারো বছরের বড় মেয়েটির মাথাতেও ব্যাপারটা বেশ ঢুকে গিয়েছে—সে রেস্তোরাঁ ছাড়া কোথাও খাবে না। দশ বছরের ছেলেটিকে রোগে ধরেছে, বাবা উপস্থিত না থাকলে সে বাড়িতে জলস্পর্শ করবে না। সাত বছরের ছেলেটি কিন্তু স্বাভাবিক—সে বাড়িতে নির্ভয়ে খাচ্ছে। কেন তার ভয় হচ্ছে না, এই প্রশ্নের উত্তরে মনস্তাত্ত্বিককে সে বলেছে, এখনও পর্যন্ত তো মরিনি আমি। এই ছেলেটি পরবর্তী জীবনে খুব সফল হয়েছিল। মায়ের অসুস্থতা তার সামনে বিপদ জয় করবার চ্যালেঞ্জ এনেছিল এবং দুর্জয় মানসিকতা নিয়ে সে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল।

পণ্ডিতরা বলছেন, অতীতে কী হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে কী বিপদ হতে পারে এই নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই আমরা বেশি কষ্ট পাই এবং মানসিক অশান্তিতে ভুগি। যারা নিজেদের বোঝাতে পারে যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে কিছু করার নেই —গতস্য শোচনা নাস্তি ; ভবিষ্যতের মোকাবিলা যথাসময়ে করা যাবে এবং হাতের মুঠোর মধ্যে যে বর্তমান রয়েছে তাকে কাজে লাগানো যাক—তারা সাধারণত জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়।

প্রবাসে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা সাধারণত সংসারের সুরক্ষা পায় অপর্যাপ্ত। তাই তারা প্রায়ই প্রতিযোগিতায় ভাল করছে। তবে খারাপ খবরও আসে।

একটি ছাত্র ভাল করছে না বলে রীণা তার গার্জেনদের ডেকে পাঠালেন।

এই শিখ পরিবার অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী—স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজ করেন। ওর বাবা দিনের বেলায় কাজ করে সন্ধ্যেতে বাড়ি ফেরেন, মা তখন রাতের ডিউটিতে যান। ছেলে অনেক রাত পর্যন্ত ভিডিও দেখছে। সে তো ইস্কুলে গোলমাল বাধাবেই।

আর একটি পাঞ্জাবী বালক ইস্কুলে ভাল করছিল না। তার মাকে ডেকে পাঠাতে তিনি ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন। স্বামী দুটো চাকরি করেন—বাড়িতে থাকেন না বললেই হয়। যখন বাড়িতে ফেরেন তখন প্রায় বন্য—মদে চুর হয়ে থাকেন।

পরের দিন স্বামীকে ডাকা হলো। স্বামী তো ইস্কুলের খোঁচা খেয়ে বউয়ের ওপরে বেজায় খাপ্পা। এই মারে তো এই মারে অবস্থা। বউকে গালাগালি দিতে-দিতে তিনি বললেন, আমি মর্নিং শিফটে কাজ করি, আবার ইভনিং শিফটে কাজ করি। বউ যদি সংসার ছেলেপুলে দেখতে না পারে তা হলে ওই অর্কমের ঢেঁকি পুষে লাভ কী? আমি তো বাড়ির লোকদের দামী-দামী জিনিসে মুড়ে রেখেছি। আমি সোজাসুজি বলছি, আমি টাকা পয়সা ছাড়া বউকে আর কিছু দিতে পারবো না। শিক্ষিকা শেষে ছেলেকে ডাকলেন। আড়ালে বললেন, 'ইস্কুলে খারাপ করে তুমি মাকে কষ্ট দিচ্ছ। মা মরে গেলে কী করবে?'

ফল হলো। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো। রীণা চক্রবর্তী পরামর্শ দিলেন, "মা যা বলবেন তা শুনবে।"

ছেলেটি এর পর সত্যিই বেশ ভাল হয়ে গেলো।

আর একটি ভারতীয় বালকের ক্ষেত্রে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেলো, বাবা মদ খেয়ে বাড়ি এসে গভীর রাত্রে ঘুমিয়ে-পড়া ছেলেমেয়েদের বিছানা থেকে তুলে কান ধরে ওঠ-বোস করায়।

স্ত্রী ইস্কুলে এসে খুব কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই স্বামীর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন না। ভারতীয় মেয়েদের এই স্বভাব—বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না।

রীণা চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অফুরন্ত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্রেফ ওঁর সঙ্গে কথা বলে মোটা-মোটা খাতা ভরিয়ে ফেলা যায়। রীণা বললেন আর এক মহিলার কথা। ধরুণ তার নাম মিসেস শর্মা। ছেলে ইস্কুলে খুব খারাপ করেছে বলে চিঠি পাঠানো হলো। দেখা গেলো চিঠিতে "মিসেস" কথাটা কেটে তিনবার "ডাক্তার" "ডাক্তার" "ডাক্তার" কথাটা লিখেছেন।

তারপর জানা গেলো মিসেস শর্মা মানসিক রোগগ্রস্ত। ভদ্রমহিলা সত্যিই ইণ্ডিয়া থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, কিন্তু কানাডার পরীক্ষায় বার-বার চেষ্টা করেও সফল হলেন না। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে

বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেন। ছেলেটাকে কিছু করা গেলো না।

ছেলেমেয়েদের সবরকম খবরাখবর রাখতে ইস্কুলের শিক্ষিকারা বাধ্য। তাই তাঁদের পরিশ্রম করতে হয় ভীষণ। প্রয়োজনে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত ইস্কুলে থেকে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। রীণার স্বামী সারাক্ষণই স্ত্রীর প্রফেশনাল সমস্যার কথা বোঝেন। দেরি হবে এই ফোন করতে তিনি বলেন, "কোনো চিন্তা নেই। শুধু বলো, আজ কী রান্না করে রাখবো।"

আমাদের দেশে একবার ইস্কুলে কলেজে কাজে ঢুকলে বাকি জীবনটা অনেকেই স্রেফ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে কাটিয়ে দেন। পঁচিশ বছরের বস্তাপচা নোট ডিক্টেশন দিয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব সারেন অনেকে। কেউ বলবার নেই, চাকরি নিয়ে টানাটানির কথাই ওঠে না। কিন্তু পশ্চিমে ব্যাপারটা অতো সহজ নয়।

রীণা বললেন, "সারাক্ষণ শিক্ষিকাদের কাজের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রতি তিন বছর অন্তর কঠিন রিভিউ। গত এগারো বছরে আটজন শিক্ষিকার চাকরি যেতে দেখেছি আমাদের ইস্কুলেই।"

"এখানে ইউনিয়ন নেই?"

রীণা চক্রবর্তী বললেন, "অবশ্যই আছে। কিন্তু চাকরি থেকে 'স্যাক' করলে তারা কিছু বলবে না। অর্থাৎ নিজে অপদার্থ হলে অপরের কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। শুধু অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই ব্যবস্থাটুকু হয়েছে যে এখন থেকে লম্বা রিভিউটা তিন বছরের বদলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হবে।"

আমাদের কথার মধ্যেই মিছরিদার প্রত্যাবর্তন। বললেন, "চল তোকে নীলাদ্রিনিবাসে পৌঁছে দিই। বিশ্বভ্রমণ কাহিনী লেখার শখ অথচ কোনো শহরের একটা রাস্তা পর্যন্ত চিনলি না, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম জ্ঞানটাও তোর হলো না।"

সত্যি, কোনো শহরের কোনো রাস্তাই আমি চিনতে পারি না। আমি শুধু জানা লোকের মুখ দেখলে জায়গাটা কোথায় বলতে পারি।

মিছরিদা আমাক রাণু চাকী ও তার আদরের কন্যা দুটির হাতে প্রত্যর্পণের আগে বললেন, "ভবতারণ ও তার বউকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে নড়ানো গেলো না, ব্রাদার। কলকাতার ধোঁয়া, ট্রাফিক জ্যাম, আবর্জনা, লোডশেডিং, ভেজাল, ভিড় ইত্যাদি সম্বন্ধে আধঘন্টা লেকচার দিয়েও কোনো ফল হলো না। আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানিস? ভবতারণ আট বছরের ছেলেটাকে একটু বকেছিল, এবং চোখ রাঙিয়েছিল কথা না-শুনলে উত্তম-মধ্যম দেবে। তার পরেই বাড়িতে পুলিশ হাজির। ছেলে কোন সময়ে

থানায় ফোন করে দিয়েছে বাবার বিরুদ্ধে। পুলিশ বাবাকে শাসিয়েছে, বলেছে আবার যদি ফোন যায় তাহলে ফল ভাল হবে না।"

"ভবতারণ এবং তার স্ত্রী তারপরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এদেশে আর থাকবে না। বেঁচে থাক আমাদের ইণ্ডিয়া, এই কথা বার-বার বলছে এবং চোখের জল ফেলছে আমাদের ভবতারণ ও তার ভবতারিণী।"

টরন্টো শহর ত্যাগ করে আবার ইউ-এস-এ ফিরবার আগে আমি ও মিছরিদা ডাঃ প্রশান্ত বসুর বাড়ি ঘুরে এসেছিলাম।

কর্নিয়া গ্রাফটিং-এর মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিদানের ব্যাপারে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশান্ত বসুর বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথা আগেই বলেছি।

যা বলা হয়নি, তা হলো বসু-দম্পতির বঙ্গসংস্কৃতি প্রীতির কথা। রবীন্দ্র-সংগীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে এঁরা দুজন সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে আছেন—চিকিৎসাজগৎ থেকে অবসর নেবার পর রবীন্দ্রনাথই হবেন অধ্যাপক বসুর সারাক্ষণের ধ্যানজ্ঞান।

রসিকতা করে তিনি রবীন্দ্রনাথ "পছন্দিত ও অনুবাদিত " কয়েকটি কবিতা শোনালেন। স্ত্রী মন দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত সাধনা চালাচ্ছেন—শোনা যায়, মনের মতন গুরু পেলে ষাট বছর বয়সে তিনি রবীন্দ্র-নৃত্যেও তালিম নিতে আগ্রহী।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম-বি পাশ করে প্রশান্ত বসু এক সময়ে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে চক্ষুচিকিৎসক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। চার বছর মাত্র ছিলেন। ওখানেই জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। দুঃসাহসের বশে নিজের তৈরি যন্ত্রপাতির সাহায্যে ডাঃ বসু কর্নিয়া গ্রাফটিং করলেন যা গ্রাম্য পরিবেশে পৃথিবীতে এর আগে কখনও হয়নি।

কলম্বো পরিকল্পনায় ১৯৫৫ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য টরন্টোতে আগমন। "এসেছিলাম ছ'মাসের জন্য। হয়ে গেলো বত্রিশ বছর। একবার দেশে ফিরে গিয়েছিলাম, কিন্তু টিকতে পারলাম না। অথচ মাসে পাঁচ-ছ'শ টাকা পেলেই আমি সন্তুষ্ট থাকতাম। সাড়ে আট হাজার টাকা গুণাগার দিয়ে আবার টরন্টোয় ফিরে এলাম।"

এদেশে প্রশান্ত বসুই প্রথম ভারতীয় প্রফেসর অফ অপথালমলজি, প্রথম ডিরেক্টর অফ অপথালমিক রির্সাচ এবং প্রথম ডিরেক্টর অফ আইব্যাংক ল্যাবরেটরিজ।

আবার টিম-ওয়ার্কের কথা উঠলো। প্রশান্ত বসু দুঃখ করলেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার শিক্ষা আমাদের হচ্ছে না। "মনে করুন, আপনি পৃথিবীর সব চেয়ে নামকরা আই সার্জেন। খুব যত্ন করে আপনি কর্নিয়া গ্রাফটিং করলেন, কিন্তু বিছানা তৈরির সময় অনভিজ্ঞ নার্স অসাবধানে রোগীর কম্বল ঝাড়লে আপনার সমস্ত বিদ্যা ও শ্রম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয়, দেশে এই ব্যাপারটা প্রায়শই হচ্ছে—আমরা সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং টিমস্পিরিট জাগাতে পারছি না।"

প্রশান্ত বসু একটি ব্যাপারে মার্কিন মহাদেশে প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন। এঁর পুত্র ও পুত্রবধূ একটি বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে বসবাস করেন।

মিছরিদা রসিকতা করে বলেছিলেন, "তোকে আমি 'সমবায়িকা' দেখাবো।" আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি, সমবায়ভিত্তিক দোকান 'সমবায়িকা' তো কলকাতায় লিণ্ডসে স্ট্রীটে এবং হাতিবাগানে।

"ওরে মূর্খ, সমবায়ভিত্তিক যা-ই চালানো হয় তার নামই সমবায়িকা। প্রশান্ত বসুর সংসার, উনি নিজেই বললেন, কো-অপারেটিভ হিসেবে চালানো হয়।"

ব্যাপারটা বেশ মজার। একই বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ-পুত্রের সহ-অবস্থান। "বাধ্য হয়ে কেউ এখানে বসবাস করে না, দু'পক্ষই স্বেচ্ছায় এখানে আছি," বললেন প্রশান্ত বসু।

আমাদের দেশে হবু শ্বশুর-শাশুড়িরা প্রশান্ত-রেবা বসুর কাছ থেকে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জ্ঞান আহরণ করতে পারেন।

"কী বুঝলি ?" মিছরিদা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি মাথা চুলকোলাম। "এক সঙ্গে আছি অথচ এক সঙ্গে নেই এমন একটা ব্যবস্থা !"

মিছরিদা বললেন, "ব্যাপারটা বুঝে নে, ভাল করে। বাবা-মা অথবা ছেলে-বউ কেউ মিনিটে-মিনিটে অপরের ব্যাপারে নাক গলায় না। দুই দম্পতির কাছেই বাড়ির চাবি আছে ; যে যখন খুশি ঢুকতে পারে, বেরোতে পারে। দুই পক্ষেরই আলাদা-আলাদা ড্রইংরুম আছে, সেখানে তারা নিজস্ব অতিথি এবং বন্ধু-বান্ধবদের আদর-আপ্যায়ন করতে পারে। এর জন্যে পরস্পরের অনুমতির প্রয়োজন নেই।"

"সব চেয়ে যা সুন্দর", মিছরিদা বললেন, "দু-জনেরই দুটি রান্নাঘর আছে ইচ্ছে হলেই, নিজের মতন রান্না করতে পারে। ছেলের পার্টিতে ইচ্ছে হলে বাবা-মা নিমন্ত্রিত হতে পারেন। বাবা ও মায়েরও একই স্বাধীনতা। তাঁরা যখন

নিজেদের পছন্দমত অতিথিদের নিমন্ত্রণ করেন তখন পুত্র-পুত্রবধূ বাদও পড়তে পারে। একই সঙ্গে দুই ঘরে দু-দল অতিথি আপ্যায়িত হচ্ছেন, ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়।"

মিছরিদা বললেন, "হাঁড়ি আলাদা হোক, কিন্তু ছাদ এক থাক—এই নীতিটা ভারতীয় সংসারে ঢুকিয়ে দে। দেখবি অনেক অশান্তি কমে গিয়েছে শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে।"

আমার খবর ছিল, এদেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালীরা এক বিচিত্র ধরনের জীব। দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই—বাবা-মায়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের অদ্ভুত সব ধারণা। মিছরিদা এদের সম্বন্ধেই নতুন একটা শব্দ সংগ্রহ করেছেন।

"এ বি সি ডি—লিখে নে।" মিছরিদা নিজের নোটবই খুলে বললেন।

ব্যাপারটা যে রসিকতা নয়, তা মিছরিদা ব্যাখ্যা করলেন—আমেরিকা বর্ন কনফিউজ্‌ড দিশীজ্‌। এরা না ঘরকা না ঘাটকা—না সায়েব-মেম না বাবু-বিবি। এরা হলো অনেকটা হাঁসজারুর মতন। বাপ-পিতামহের সংস্কৃতি এবং দেশকে অবজ্ঞা করে আনন্দ পায়। অথচ যে-দেশে বসবাস সেখানেও তাদের পূর্ণ স্বীকৃতি নেই।"

"এদেশে বড়-হয়ে ওঠা ভারতীয় মেয়েদের মুখে ইন্ডিয়ান ছেলে সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত মন্তব্য শুনবি—'নার্ড'। বাংলা করলে যা দাঁড়ায়—'ম্যাদাটে'। পড়াশোনায় ভাল, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় শেখেনি।"

"তাহলে তো 'নার্ড' একটা গালাগালি।"

"অবশ্যই গালাগালি। এখানকার ইন্ডিয়ান কুমারীদের ভয়, বাপ-মা তাকে একটা ম্যাদাটের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করছে।"

এবার প্রশান্ত-সমবায়িকায় প্রত্যাবর্তন করা যাক। পুত্র প্রদীপ কানাডায় জন্মগ্রহণ করেনি, কিন্তু আশৈশব এখানে লালিত। বাংলা জানে না, যদিও বুঝতে পারে।

প্রদীপের স্ত্রী রঞ্জনার বয়স সাতাশ। রঞ্জনার জন্ম কলকাতায়—অতি শৈশবে বাবা-মায়ের সঙ্গে কানাডায় চলে আসে। পরে তাঁদের সঙ্গে কয়েকবার জন্মভূমি ঘুরে এসেছে।

শাদা শার্ট ও শাদা হট প্যান্ট পরে শ্যামলী বধূ রঞ্জনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। প্রথমে একটু অস্বস্তি লাগছিল। কলকাতার পরিবেশে শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে বউমার এই বেশবাস এখনও অকল্পনীয়। কিন্তু এটা বহিরঙ্গ।

ভিতরে কোথাও দু-পক্ষের মধ্যে চমৎকার মনের মিল রয়ে গিয়েছে। রঞ্জনার বাবা-মা দীর্ঘদিন প্রশান্ত বসু পরিবারের সঙ্গে পরিচিত এবং সেই সূত্রে ছোট বয়স থেকেই মেয়ের দু-বাড়িতে অবাধ যাতায়াত।

রঞ্জনা কৃতী ছাত্রী। সমাজ বিজ্ঞানে এম-এসসি করেছে। ওর বিশেষ আগ্রহ বার্ধক্যের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে। এখন একটি হাসপাতালে কাজ করে। কাজটি অসাধারণ—দুরারোগ্য ব্যাধিতে যারা মৃত্যু-পথযাত্রী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। মৃত্যু-পথযাত্রীদের সুখ-দুঃখ কান্না-হাসি সম্পর্কে শত-শত গল্প এই মেয়েটির কাছে জমা হয়ে আছে। মন দিয়ে শুনলে অবশ্যই একটা বই হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের মুহূর্তে মানুষ কী রকম অসহায় হয়ে পড়ে তা বিস্তারিত ভাবে জানলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন বোধহয় অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

প্রশান্ত বসু বললেন, তাঁর বউমার আর একটি শখের কাজ আছে। বিষয়টি হলো বউ-পেটানো।

"হাঁউ-মাউ-খাঁউ—গল্পের গন্ধ পাঁউ!" আমি নিজের ঔৎসুক্য চাপা দিতে পারলাম না।

রঞ্জনা বললো, সে একটা 'ব্যাটার্ড' উইমেন্‌স্ হোম-এর সঙ্গে অবৈতনিকভাবে যুক্ত।

"বউ-পেটানোর কথা তো কেবল আমাদের দেশেই শোনা যায়।"

"মোটেই নয়—এদেশেও বউ-পেটানোর রেওয়াজ আছে। ব্যাপারটা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন ঘর ছেড়ে মেয়েরা এসে এই হোমে সাময়িক আশ্রয় নেয়।"

শুনলাম, এক ভদ্রমহিলার দানে এই ব্যাটার্ড উইমেন্‌স্ হোম চালু হয়েছে।

"যারা বউকে মারধোর করে তারা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত না নিম্নবিত্ত?"

রঞ্জনা বললো, "আমরা যাদের পাই তারা বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত। কিন্তু তা বলে ভাববেন না উঁচু মহলে এই রোগটা নেই। বহু মেয়েই মার খেয়েও মুখ বুজে সহ্য করে, কারণ ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় যাবে? মধ্যবিত্তরা তেমন বিপদে পড়লে, বাবা-মা অথবা বান্ধবীর সাময়িক আশ্রয়ে চলে যায়—হোমে উঠতে তাদের লজ্জা লাগে।"

এই মারধোর কেন হয় তা বলা শক্ত। অনেকে নেশার ঘোরে বউকে মারধোর করে, পরে ক্ষমা চেয়ে নেয়। অনেকের ক্ষেত্রে এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। কুশিক্ষাও কিছুটা দায়ী। মেয়েরা যেহেতু দুর্বল সেহেতু তাদের হাতে পাল্টা মার খাবার সম্ভাবনা কম। আজকাল অনেক মেয়েই তাই আত্মরক্ষার বিদ্যা, যেমন

ক্যারাটে ইত্যাদি শিখছে।

বউ-পেটানো রোগটা কানাডায় কমের দিকে নয়—ক্রমশই বাড়ছে। মেয়েদের প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হচ্ছে!

রঞ্জনা জানতে চাইলো, মদ্যপ বেয়াদপ স্বামীর হাতে মার খাবার পরে আমাদের দেশে কী হয়?

আমি চুপ করে রইলাম। কারণ, আমি জানি, হঠাৎ বিপদে পড়লে মেয়েদের কোথাও আশ্রয় নেবার উপায় নেই আমাদের দেশে। ঘর ছাড়লে বিপদ অনেক বেশি। হয়তো সোনাগাছিতে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে হবে। তাই আমাদের কলকাতার মেয়েরা মুখ বুজে শক্তিমান স্বামীর সব অত্যাচার সহ্য করে, অথবা শরীরে কেরোসিন ঢালে, অথবা বিষ খায়।

যে-মহিলার দানে এই ব্যাটার্ড উইমেন্‌স্ শেলটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শুনলাম তিনি নিজেও স্বামী কর্তৃক বারংবার নিপীড়িতা হয়েছিলেন। পতিবিড়ম্বিতা ধনী মহিলারা এদেশে সমস্ত বিত্ত তান্ত্রিক অথবা ঠাকুরের পায়ে ঢেলে দেন, কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরির কথা তাঁদের মনে আসে না।

রঞ্জনা বললো, স্বামী খারাপ হলে মেয়েদের উভয় সংকট। অত্যাচার তো আছেই তার ওপর ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা। অনেক মেয়ে শারীরিক নিগ্রহ সত্ত্বেও যে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না তার কারণ ওই ছেলেপুলে। সমস্ত জীবন ব্যাটার্ড শেলটারে যে থাকা যায় না তা মেয়েরা ভালভাবেই জানে।

"অনেকে আবার আশা করে বসে থাকে স্বামীর এই বদ-অভ্যাস একদিন কেটে যাবে। কিন্তু আমরা দেখছি, যে-সব মেয়ে বিনা প্রতিবাদে মার হজম করে তারা আরও বিপদে পড়ে যায়, স্বামীর নিষ্ঠুরতা তারা আরও বাড়িয়ে দেয়।"

রঞ্জনার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ অথচ ইস্কুল মাস্টার স্বামী প্রদীপ বসু এবার আমাদের আড্ডায় যোগ দিলো। প্রদীপ আবার একজন চৌকশ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়, আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে কানাডার হয়ে চীনের বিরুদ্ধে খেলেছে।

প্রদীপ ইংরিজিতে বললো, "মধ্যবিত্ত বাড়িতেও স্ত্রীদের যে মারধোর করা হয় তা আমরা ইস্কুলে ছোটদের কাছ থেকে খবর পাই। আপনি শুনলে কষ্ট পাবেন, যারা একটু মানসিক প্রতিবন্ধী, যারা অন্যের তুলনায় একটু বোকাসোকা তারাও বাবার হাতে নিগৃহীত হয়। এদের সম্বন্ধে কারুর কারুর যেমন সীমাহীন ভালবাসা তেমনি অনেকের আবার সীমাহীন অবহেলা। আমরা অবশ্য এদেশে কোনো অত্যাচারই মেনে নিতে প্রস্তুত নই। তাই আমরা এইসব অভাগা

ছেলেদের শেখাই, কী তাদের আইনগত অধিকার, কোন কোন অবস্থায় তারা পুলিশের শরণাপন্ন হতে পারে। বাপের বিরুদ্ধে পুলিশ ডাকা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খুব খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু এদেশে প্রায়ই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে অন্য কোনো উপায় থাকে না।"

তথাকথিত গবেট ছাত্রদের পড়াতে কেমন লাগে জানতে চাইলাম। প্রদীপের ধারণা, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সুতরাং ইস্কুলের সুবিধের জন্যে কাউকে গবেট অথবা কাউকে অসাধারণ চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ একবার গবেট বলে কেউ চিহ্নিত হলে সে সারাজীবন ঐ গ্লানি বহন করবে এবং তার পক্ষে ঐ গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

প্রদীপ বললো, "ওরা যদি বুঝতে পারে আপনি ওদের ওপর করুণা করছেন তাহলে আরও মুশকিল। আমরা তাই ওদের অনুপ্রেরণা জোগাই, ওদের ভিতরে যে ব্যক্তিত্ব ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। যখন সাফল্য আসে তখন খুব ভালো লাগে।"

শুনলাম প্রদীপ এবার থেকে তথাকথিত 'একসেপশনাল' ছেলেদের দায়িত্ব নেবে। সুরসিক প্রদীপ বললো, "এদের সমস্যা গবেটদের থেকে বেশি বই কম নয়। এদের প্রধান সমস্যা যে ভগবান এদের মগজে বাড়তি মাল দিয়েছেন।"

প্রতিভাবান বলতে কাদের বোঝানো হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রদীপ জানালো, "যাদের আই-কিউ ১৪০-এর বেশি। কিন্তু মনে রাখবেন, আই-কিউ বেশি মানুষরাই শেষ পর্যন্ত জীবনে চরম সাফল্য অর্জন করে না। কিছুদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামকরা একদল মানুষের সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে এদের মধ্যে ১৪০ প্লাস আই-কিউ-এর সংখ্যা নেই বললেই চলে।"

ছোট ছেলেরাও সব সময় এই বিশিষ্টতার ছাপ উপভোগ করে না। তাদের ওপর নানা বাড়তি দায়িত্বের বোঝা চেপে যায়। মাস্টারমশাইদের এবং অভিভাবকদের অত্যধিক প্রত্যাশা পুরণ করতে গিয়ে ছোট বয়সের অনেক ছোটখাট আনন্দ ওদের বিসর্জন দিতে হয়।

আসলে, বিশিষ্টতার ছাপ দিয়ে সাধারণ ক্লাশ থেকে এদের বের করে দেবার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি ক্লাস টিচারের। কারণ, এরা প্রায়ই টিচারের থেকে বেশি জানে এবং কেউ কেউ সুযোগ পেলেই মাস্টারকে সবার সামনে বেকুব বানায়। হয়তো কোনো সমস্যা উঠলো। দেখা গেলো, অন্যদের মাথায় সমস্যাটা ঢোকবার আগেই তারা উত্তর ঠিক করে বসে আছে। ফলে, ক্লাশে অন্য ধরনের সমস্যারও সৃষ্টি হয়।

মৃত্যু-পথযাত্রীদের কথা উঠলো। আমার জানাশোনা এক বাঙালী মহিলা

রঞ্জনার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন। রঞ্জনা বললো, "কত রকমের মানুষ দেখি। কেউ আসন্ন মৃত্যুকে মেনে নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে। কেউ বিদ্রোহ করে, না আমার তেমন কিছু হয়নি। কেউ-কেউ এই সময় ব্যক্তিগতভাবে সমাজসেবিকার সাহায্য চান।"

এক ভদ্রলোকের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, কিন্তু ছেলের সঙ্গে দীর্ঘদিন মুখ দেখাদেখি নেই। ব্যাধি দুরারোগ্য জেনে এই ভদ্রলোক ছেলের সঙ্গে মিটমাট করতে চাইলেন। রঞ্জনা বললো, "ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আমরা। অনেক কষ্টে সব বুঝিয়ে তাকে হাসপাতালে আনা হলো। চোখের জলের মধ্যে পিতা-পুত্রে মিলন হলো, দেখে খুব ভাল লাগলো।"

রোগ সারবে না জেনে অনেকে নিজের বাড়িতে ফিরে সেখানেই মরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকে না। বাড়িতে চিকিৎসা হবে কী করে? সেবা করবে কে? অসুস্থ মানুষকে দেখবার মতন সময় এখানে কারও নেই। এইটাই আমাদের সভ্যতার অদ্ভুত দিক। আমরা নিজেরাই সর্বনাশা ব্যস্ততায় নিজেদের জালে জড়িয়ে পড়েছি।

রঞ্জনা বললো, "মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানার পরে কারুর-কারুর মধ্যে অতীতের অন্যায় অথবা ভুল সম্পর্কে গভীর অনুশোচনা দেখা যায়। একজন ডাইভোর্সড্ রমণী চোখের জল ফেলে বললেন, 'কেন ওকে আমি ডাইভোর্স করেছিলাম! দোষটা তো পুরোপুরি আমারই।' তখন একটু সান্ত্বনা দেওয়া, ধৈর্য ধরে কথাবার্তা শোনা, ছোটখাট মন্তব্য করা, কাউকে কাছে আনার চেষ্টা করা—এই সবই সমাজসেবিকার কাজ।"

এই বিষয়েই রঞ্জনা পি-এইচ-ডি করবে। রঞ্জনার বাবাও একজন পি-এইচ-ডি—তিনি বেল টেলিফোন ল্যাবে গবেষণা করেন, থাকেন ওটাওয়াতে।

প্রশান্ত বসু বললেন, "আমরা বউমাকে কখনও বকাবকি করি না। তার কারণ চার বছর বয়সে প্রথম যখন ও আমাদের বাড়িতে এসেছিল তখন বলেছিল, যদি তোমরা আমাকে বকো তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে চলে যাবো, আর কখনও আসবো না।"

"বিয়েটা আমাদের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এদেশে তো বাবা-মায়ের ইচ্ছে ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে। আমাদের ভাগ্য ভাল ওরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দ করলো।"

প্রশান্ত বসু বললেন, "রঞ্জনা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান—কোনো ভাই-বোন নেই।"

এই কথা শুনেই রঞ্জনা হাঁ হাঁ করে উঠলো এবং শ্বশুরের ব্যক্তব্যের প্রতিবাদ

জানালো। "নো, আমার একটা ভাই আছে।"

প্রশান্তবাবু এবার হেসে ফেললেন, "ভুল হয়ে গিয়েছে। ওটাওয়াতে ওর একটা ভাই আছে—ডগ ব্রাদার। ওই কুকুরটা ওর বাবা-মায়ের খুব প্রিয়।"

বিদায় দেবার আগে প্রশান্ত বসু বললেন, "একটা পর্বে রঞ্জনা ও প্রদীপ দু'জনেই ভয় দেখিয়েছিল, বিয়েটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। জোর করে কিছু ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে ফল খুব খারাপ হবে। আমরা তাই বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম। তারপর ওরা আমাদের খুব সারপ্রাইজ দিলো। ওরা জানালো ওরা বিয়ে করতে রাজি যদি একটা বিশেষ দিনে ওদের বিয়ে হয়। কমবয়সী ছেলেমেয়েদের খেয়াল-খুশি, আমাদের রাজি হওয়া ছাড়া উপায় কী? তখন ওরা বললো তারিখটা হবে আঠারই নভেম্বর। ওইদিনে আমাদের কর্তা-গিন্নীর বিয়ে হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে।"

"ওদের রসিকতাবোধ দেখে আমরাও খুব মজা পেলাম।" বললেন রেবা দেবী।

সুরসিক প্রদীপ সঙ্গে-সঙ্গে বললো, "মোটেই রসিকতা নয়—বছরের পর বছর এক খরচে দুটো বিবাহ বার্ষিকী সেলিব্রেশনের জন্যেই কিপ্টে পরিবারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।"

কানাডার মায়া কাটিয়ে টরন্টো বিমান বন্দর দিয়ে আবার ওহায়ো রাজ্যের ক্লিভল্যাণ্ডে ফিরে এসেছি। টরন্টো বিমান বন্দরে ওই ভোরবেলায় নীলাদ্রি চাকী উপস্থিত ছিল। নীলাদ্রির মনটি বড় কাব্যিক, অতি সহজে মানুষকে আপন করেও নিতে পারে। বললো, "বড্ড কম সময় থাকলেন কানাডায়। কয়েকটা মাত্র দিনে এমন একটা দেশ সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা যায় না।"

আমি নীলাদ্রির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবে টরন্টোয় ভারতীয় সমাজ আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁরা শুধু আমাকে সভা করে অভিনন্দন জানাননি, পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন নানা বিচিত্র মানুষের সঙ্গে। যত লোকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যোগ করলে অনায়াসে চার-পাঁচশ বছর হয়ে যাবে! এঁরা আমার কোনো প্রশ্ন এড়িয়ে যাননি, আমাকে সব রকমের খবর সংগ্রহ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। কানাডা প্রবাসী বাঙালীদের এই উদার প্রসন্নতার ঋণ আমি এই জন্মে হয়তো শোধ করতে পারবো না।

মিছরিদা মাথায় একটি টুপি চড়িয়ে, এস্কিমো স্টাইলের সাজসজ্জায় টরন্টো এয়ারপোর্টের ডিপার্চার গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি রসিকতা করলেন, "বাঙালী স্টোরি-রাইটারদের ওপর ভরসা রাখবেন না, মিস্টার চাকী! এতো যত্ন করে মনুষ্যত্বের জয় দেখালেন আপনারা কিন্তু উনি হয়তো হাওড়া-কাসুন্দেতে ফিরে গিয়ে লিখে বসলেন প্রেমের গপ্পো। মেয়েমানুষের বিয়ে হলো কি হলো না, এই সাসপেন্সের ওপর ভরসা করেই আমাদের লেখকরা জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান! অথচ আমার বক্তব্য হলো, মারো গোলি ভেতো বাঙালীর পান্তা প্রেমে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কোন কালে দুঃখ করেছিলেন, 'বাঙালী সবসময় অবস্থার অধীন, অবস্থা কখনও বাঙালীর অধীন হয় না!' কথাটা কানাডায় বাঙালীরা বঙ্কিমের প্রায় একশ বছর পরে ভুল প্রমাণ করলো, এইটাই লেখার বিষয়।"

নীলাদ্রি রসিকতা করলো, "শংকরদা, আপনি দুটোর সমন্বয় করে একটা কিছু লিখুন। ছেলে-মেয়ের বিয়ে উত্তর আমেরিকার বাঙালীদের অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ। দেশের আত্মীয়রাও মেয়ের যোগ্য পাত্র সন্ধানের জন্যে আমাদের কাছে প্রায়ই চিঠি লেখেন। এই বিষয়ে যদি কোনো বই, ধরুন—'গাইড টু গুড ম্যারেজ ওভারসীজ' অথবা 'প্রবাসে প্রজাপতি নির্বন্ধ'—লেখেন তাহলে বহুজনপঠিত হবার সম্ভাবনা প্রবল।"

মিছরিদা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। "যদি ও খেটেখুটে এই বিষয়ে কিছু খাড়া করে তাহলে আমি সে-বইয়ের ভূমিকা লিখবো। বিয়েথার ব্যাপারে বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়—অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবে না যদি না একজন নির্ভরযোগ্য লোকের মুখবন্ধ থাকে।"

"মিছরিদা, আপনার ভূমিকা? প্রথম দিনেই তিন হাজার কপি বিক্রি কে আটকায়? প্রকাশকও জুটে যাবে চটপট! প্রকাশক ভয় পাচ্ছিল, স্বদেশের সদানিন্দিত বাঙালীরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে রাজি নন। যাঁরা চান্স পেলে নিজেরাই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন, কোন দুঃখে তাঁরা ভ্রমণকাহিনী পড়বেন?"

নীলাদ্রি বললো, "আপনি প্রথমে বাংলাতেই বইটা লিখে ফেলুন, তারপর এখানে বড়-হয়ে-ওঠা কোনো মেয়েকে দিয়ে ইংরিজি অনুবাদ করিয়ে নেবো—বিশ্বস্বত্ব সংরক্ষিত রাখবেন। আপনি অ্যানথ্রপলজির অধ্যাপক অজিত রায়ের কুমারী কন্যা আজালিয়ার সঙ্গে তো বিয়ের ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা বলেছেন। ওকেই অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া যাবে!"

এরোপ্লেনে সমস্ত পথ মিছরিদা এই ম্যারেজ হ্যাণ্ডবুক সম্বন্ধে নানা মূল্যবান মন্তব্য করলেন। "ব্যাপারটা হাল্কাভাবে নিস না—অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ইণ্ডিয়ায় এবং বাংলাদেশে কত মেয়ের বাবা-মা যে গ্রীনকার্ড-জামাইয়ের জন্যে

ছটফট করছে তা তো জানিস না! সাগর-ছেঁচা জামাই পেলে সহকর্মী এবং আত্মীয়মহলে প্রেস্টিজ তুঙ্গে উঠে যায়।"

মিছরিদা এদের মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছেন না। বাঙালীর যখন দিনকাল ভাল ছিল তখন নিজের অপরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ছেলের মধ্যে পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখতেন, এখন স্বদেশের বাঙালী পুরুষ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ধাপে-ধাপে নেমে যাচ্ছে, তাই বাপ-মায়ের সাধ-আহ্লাদ মেটাবার একমাত্র সুযোগ মেয়ের বিয়ের মাধ্যমে। সাগর-ছেঁচা জামাই কথাটা বড্ড আনন্দের।

মিছরিদা বললেন, "কানাডায় দেখলাম, বাঙালী পুরুষদের তুলনায় দেশ-থেকে আসা বাঙালী মেয়েরা অনেক উচ্চশিক্ষিতা। কারণ এঁদের বাবারা ভাবী জামাইয়ের কানাডিয়ান ডলারকে দশ দিয়ে গুণ করে দেশী টাকায় রূপান্তরিত করে মাথা খারাপ করে ফেলেছিলেন।"

"সবচেয়ে মুশকিল হয় প্রবাসী ছেলের স্থানীয় বাপ-কাকাদের নিয়ে। এক ভদ্রলোক তো বিরাট গর্ব করে পাত্রীর পিতাকে বলেছিলেন, 'আমার ছেলে এতো ব্রিলিয়ান্ট যে, খোদ কানাডা সরকার তাকে বাড়িতে বসিয়ে-বসিয়ে হাজার-হাজার টাকা দিচ্ছেন ব্রেন খাটাবার জন্যে।' মেয়ের বাবা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, বিয়ে হলো খিদিরপুরে। তারপর এবারে এখানে এসে খোঁজখবর নিয়ে দেখি, জামাতাবাবাজীর চাকরি নেই—এখানে সরকারী বেকারভাতায় আছেন! সুতরাং বাছা, লোককে সাবধান করে দিও, সাগর ছেঁচলে যেমন অমৃত ওঠে তেমন গেঁড়িগুগলিও কপালে থাকতে পারে।"

সব চেয়ে দুঃখ লাগে ডাক্তার মেয়েদের জন্যে। বিদেশে কেরিয়ারের লোভে যাকে-তাকে বিয়ে করে বিদেশে এসে সারা জন্ম ধরে ভোগান্তি সহ্য করছে। দেশের ডাক্তার এদেশে এসে যে প্রায়ই স্থানীয় লাইসেন্স পায় না এবং বাধ্য হয়ে অন্য কাজ করে তা আমরা স্বদেশে বসে জানতে পারি না। এই নিরাশায় অগ্নিকুণ্ডে দেশ-থেকে-আসা পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার দুই পাবেন। পুরুষরা এসেছে বিদেশে-লালিতা ভারতীয় মেয়ের গ্রীনকার্ডের জোরে, আর মহিলারা এসেছে ইমিগ্র্যান্ট স্বামীর লাগেজ হিসেবে। এই সব পুরুষ ডাক্তার কানাডা অথবা আমেরিকায় নাইট দারোয়ানের কাজ করছে, ডাইং ক্লিনিং-এ ময়লা জামাকাপড় পরিষ্কার করছে, মুদিখানা দোকানে মাল তুলছে। কোনো কোনো গ্রীনকার্ডধারিণী বাঙালিনী ধৈর্য হারিয়ে তাঁদের স্বামীদের যথাসময়ে বিদায় করে দিয়েছেন। একটি ক্ষেত্রে তো প্রায় হাতাহাতি। আর একটি ক্ষেত্রে স্বামীটি কলকাতায় ফিরে এসে আবার দিশী প্র্যাকটিশে মন দিয়েছেন। কম গুণের ডাক্তারবাবুদের সব রকম অপদার্থতা নীরবে মাথা নীচু করে হজম করতে ভারতবর্ষ এখনও তুলনাহীন। কানাডা এবং ইউ-এস-এ-তে সরকার অনেক

সজাগ, নিময়কানুন অনেক কড়া, রোগীদের সহ্যশক্তিও অনেক কম। পান থেকে চুন খসলেই ডাক্তারবাবুর কোমরে দড়ি জুটতে পারে।

ক্লিভল্যান্ডে ফিরে এসেছি এদেশের বাঙালীসমাজের উদার আতিথেয়তায়। এখানকার বাঙালীরা অনেকটা যৌথ পরিবারের মানসিকতা নিয়ে বসবাস করেন। পরস্পরের প্রতি টান চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

আমার এবার রাত্রিবাস করার কথা ডঃ দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যর বাড়িতে। দিব্যেন্দুর মা শান্তিদেবী ছেলের কাছেই থাকেন। পুত্রবধূ সুমিত্রার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি বেশ মধুর।

এয়ারপোর্টে আমাকে নিতে এসেছিলেন আর এক সুরসিক বৈজ্ঞানিক ডঃ রণজিৎ দত্ত। মিছরিদা আমাদের বইটির পরিকল্পনা ফাঁস করে দিলেন। রণজিৎ দত্ত বললেন, "আমি ব্যাচেলার মানুষ। কিন্তু এই ঘটকালির ব্যাপারে, সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বহু বছর জড়িয়ে আছি। আমার অভিজ্ঞতা কপিরাইটেড হলেও, 'জাতীয় স্বার্থে' আপনাদের তা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে।"

রণজিৎ দত্ত আরও বললেন, "যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় অসংখ্য হীরের-টুকরো বাঙালী ছেলে আছে। অনেক মেয়েই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিয়ে করে সোনার-চাঁদ স্বামীর সঙ্গে অত্যন্ত সুখে বিদেশে ঘর-সংসার করছে। কিন্তু খোঁজখবর না করে বিয়ে দিয়েও অনেকে খুব ভুগছেন। আপনাকে ডজন-ডজন ঘটনা শুনিয়ে দেবো। তবে মনে রাখবেন, বাঙালী মেয়েরা এদেশে এসে চমৎকার মানিয়ে নিচ্ছেন, স্বামীদেবতাটি যদি অমানুষ না হন।"

দিব্যেন্দুর স্ত্রী সুমিত্রা ও মা শান্তিদেবী আমাকে মুহূর্তে আপন করে নিলেন। এদেশের ঘর-সংসার সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বললেন। শান্তিদেবী অতি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, সে-যুগে রক্ষণশীল উচ্চবিত্ত পরিবারে বিবাহ সম্বন্ধে চমৎকার একটি স্মৃতিচিত্র লিখে রেখে দিয়েছেন, যা আমাকে পড়তে দিলেও উদ্ধৃতির অনুমতি দিলেন না।

শান্তিদেবী বললেন, "ভালমন্দ বুঝি না, বাবা। সায়েব-মেম, বাঙালী-অবাঙালী সকলের মধ্যে ভাল লোক দেখছি এই দেশে—তবে দু-একটা খারাপ তো থাকবেই।"

বিয়ের কথা তুলতে বললেন, "এদেশের বাঙালী ছেলেরা যদি বুদ্ধিমান হয়

তা হলে দেশ থেকে সুলক্ষণা মেয়ে আনবে। তাতে মনোবল বাড়বে, প্রবাসের দুঃখ কমবে। এদেশের বাঙালী ছেলেদের তুমি তো দেখেছো ? এরা কোন দিক দিয়ে খারাপ বলো ? এদের হাতে মেয়ে তুলে দিয়ে কোন বাবা-মা নিশ্চিত হবেন না ?"

সেই রাত্রেই কলকাতা থেকে টেলিফোন এলো। নমিতাদি আমাকে ফোন করছেন ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে। "কিছু মনে কোরো না ভাই, বাধ্য হয়েই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আমেরিকা তোমার ঘরবাড়ি, কত লোক তোমার চেনাশোনা, তোমাকে এই উপকারটুকু করতেই হবে," নমিতাদির স্বর কাঁদোকাঁদো।

নমিতাদির স্বামী মিস্টার বীরেশ্বর বাসু আমার জানাশোনা। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বিলিতি অফিসে কোভেনেন্টেড চাকরি নিয়েছিলেন। তারপর টপাটপ উন্নতি করে রিটায়ার করার আগে ডিরেক্টর হয়েছিলেন কয়েক মাসের জন্যে। মিস্টার বাসুর মাধ্যমে গল্‌ফ মাঠে একবার তাঁর গৃহিণীদের সঙ্গে আলাপ। ভারী মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। নিজেই বললেন, "বউদি বোলো না, দিদি বলো—সম্পর্কটা বাপের দিক থেকে হোক।"

বলাবাহুল্য কিছুদিন পরে নমিতাদি তাঁদের কন্যা কুমুদিনীর কথা পাড়লেন। "পড়াশোনায় খুব ভাল। ইংরিজিতে এম-এ দিয়েছে যাদবপুর থেকে। এবার একটা ভাল পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া দরকার।"

ব্যাপারটায় আমি তত কান দিইনি। কারণ, কুমুদিনী ও আমার সামাজিক স্তর এক নয়। আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কুটুম্ব সবই নিতান্ত মধ্যবিত্ত, কেউ-কেউ তাও নয়। আর কুমুদিনীর মা, মাসি, কাকা সবাই উঁচু স্তরে। এঁদের সবার মোটরগাড়ি আছে, অনেকেরই বাড়ি আছে গড়িয়াহাটা অথবা নিউ আলিপুরে। এই স্তরে ঘটকালি করার অভিজ্ঞতা আমার নেই।

তবু মিসেস বাসু অথবা নমিতাদি তাগাদা দিয়ে যান, "আমার মেয়েটাকে উদ্ধার করার কথা তোমরা মাথাতেই নিচ্ছো না।"

আমিও ভদ্রতা করে বলেছি, "আপনার মেয়ে দেখতে সুন্দরী, বিদুষী। গান জানে, গর্ব করার মতন বংশপরিচয়—চিন্তা কী ? দেখবেন হঠাৎ একদিন বর এসে হুট করে নিয়ে চলে যাবে।"

কিছুদিন আগে নমিতাদির সঙ্গে আবার দেখা। নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলাম কুমুদিনীর কথা। নমিতাদি বললেন, "তুমি সত্যদ্রষ্টা লোক, যা বলেছিলে তাই হয়েছে।"

ব্যাপারটা এই রকম ! আচমকা হীরের-টুকরো বর পাওয়া গিয়েছে। যখন

ফুল ফোটে তখন কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া, ঘটক লাগানো কিছুই প্রয়োজন হয় না। যা চেয়েছিলেন তার থেকেও ভাল জামাই পেয়ে গিয়েছেন নমিতাদি। বললেন, "যেমন বিদ্যা, তেমন রূপ, তেমন চাকরি। তোমায় কী বলবো শংকর! পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে এমন ছেলে পাওয়া যায় না। মাইনে কত জানো?"

"কত?"

"একটা আন্দাজ করো, তারপর বলবো।"

"একুশশো বাইশশো?" আমি মাথা চুলকে বলে ফেললাম।

হাসলেন নমিতাদি। "না ভাই শংকর, ওই ক'টা টাকায় আমার কুমুর কী হবে—ছোটবেলা থেকে কষ্ট কাকে বলে জানে না তো। সাত-তেরো কত হয়? একানব্বুই হাজার টাকা মাইনে।"

"বছরে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"বালাই-ষাট। কোন দুঃখে বছরে হবে? মাস্ মাইনে।"

পাত্র যে অনাবাসী মার্কিন মুলুকবাসী তা জানতে পারলাম। নমিতাদি বললেন, "গ্লাসগোর ইঞ্জিনিয়ারিং পি-এইচ-ডি। তার আমেরিকায় বি-রা-ট চাকরি করছে। চমৎকার বেহালা বাজায়। হাতে যেন চাঁদ পেলাম।"

চাঁদ পাবার জন্যে তড়িৎগতিতে কাজ করতে হয়েছে নমিতাদিকে। বললেন, "খবরটা পেলাম ওঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে। পাত্রের বাবা-মা ওঁদের জানাশোনা। বিখ্যাত পরিবার। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও খুব জানাশোনা ছিল। অবনঠাকুরের বইতে নাকি ছেলের কাকা এবং দাদামশায়ের উল্লেখ আছে, তুমি নিশ্চয় জানবে।" আমি বললাম, "ওসব মস্ত সোসাইটি, সবাইয়ের নামও শুনিনি।"

নমিতাদি বললেন, "আর একটু কুঁড়েমি করলেই ছেলে হাতছাড়া হয়ে যেতো। ঝড়ের মতন ব্যাপারটা এগুলো। ছেলে জরুরি কাজে ছ'দিনের জন্যে ইন্ডিয়ায় এসেছিল। আসা মাত্রই বাবা-মা চারখানা মেয়ের ছবি দেখালেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনে মেয়ে দেখা শেষ হলো। চতুর্থ দিনে ছেলের বাবা-মা আবার আমাদের কাছে এলেন। সুখবর দিলেন, কুমুকেই প্যানেলে এক নম্বর রাখা হয়েছে, কিন্তু এখনই বিয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা।"

এ যে 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে!' কিন্তু ভেবে চিন্তে দেখার সময় নেই। নমিতাদি যদি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেন তবে সুযোগ হাতছাড়া হবে। কারণ প্যানেলের দু নম্বর ক্যানডিডেট এখনই বিয়ে দিতে রাজি আছে। পাত্রের নাম ধরুন নবারুণ মজুমদার। বাবা-মা উচ্চশিক্ষিত—প্রবাসে বড় কাজও করেছেন একসময়। বিখ্যাত এক শিল্পী স্বয়ং নাম দিয়েছিলেন নবারুণ।

নমিতাদি বললেন, "বন্ধু-বান্ধব কাউকে বলতে পারলাম না। চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে বিয়ে হয়ে গেলো। এখন ছেলে বিদেশে ফিরে গিয়েছে। আমেরিকায় উঁচু পোস্টে কামাই-টামাই চলে না। কী সুন্দর গলা জানো ভাই। প্রাণভরে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ গাইলো। তোমাকে টেপ শোনাবো, ছবি দেখাবো। কুমু এখন শ্বশুরবাড়ির খুব ন্যাওটা হয়েছে—ওঁরা এক মিনিট ছাড়ছেন না। ওর পাশপোর্ট হয়ে গিয়েছে। তোমরা চেষ্টা-চরিত্র করে যত তাড়াতাড়ি পার ওকে স্টেটসে পাঠিয়ে দাও। যাবার দিন ঠিক হলে একদিন সবাই মিলে হৈ-চৈ করা যাবে—তখন কিন্তু একলা এলে চলবে না, গিন্নীকেও আনতে হবে।"

"অতি উত্তম খবর, নমিতাদি। নতুন জামাই নিশ্চয় বউকে ঝটপট নিয়ে যাবে নিজের টানেই। ইমিগ্রেশন আইনকানুন আমার জানা নেই, আমার তো পাসপোর্টও নেই। আপনি বরং অগতির গতি সুপ্রিয় ব্যানার্জির শরণাপন্ন হোন। হার্ট অফ গোল্ড, আপনাকে নিশ্চয় সাহায্য করবে।"

এরপরে একদিন বিয়ে বাড়িতে ভিড়ের মধ্যে নমিতা ও কুমুদিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি রসিকতা করেছি, "বিদেশে আটকে-টাটকে গেলে দু'একশ ডলার দিও কুমু। প্রতি মাসে বরের সাত হাজার ডলার খরচ করবে কী করে?"

নমিতাদি দুঃখ করলেন, "যাওয়ার ব্যাপারটা এগিয়েও এগোচ্ছে না। কী দেশ বাবা তোমাদের এই আমেরিকা। ধর্ম সাক্ষী রেখে বিয়ে-করা বউকেও এরা ঝট করে স্বামীর কাছে যেতে দেয় না।"

"ভাববেন না। পার্টি অফিসের মাধ্যমে রাশিয়ায় চিঠি লেখাবো, ব্যাপারটা যাতে ইউ-এস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে উচ্চতম পর্যায়ে আলোচনা করাতে।"

নমিতাদি ফিস-ফিস করে জানালেন, "ওর এক বন্ধু বলছিলেন, দরকার হলে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে মিস কুমুদিনী বসু হিসেবে একবার ওদেশে চলে যাক। প্রয়োজনে ওখানেই আর একবার বিয়ে করে নেবে।"

"অধিকন্তু ন দোষায়," আমি রসিকতা করেছিলাম।

তারপর একেবারে মাঝ রাতে ঘুম ভাঙিয়ে ক্লিভল্যান্ডে এই ফোন। দেশে ফিরে আসবার আগে আমাকে কিছু জরুরি খোঁজখবর নিতেই হবে, নমিতাদির কাতর আবেদন।

যে-জায়গার নামটা টেলিফোনে শুনেছিলাম সেটা ম্যাপে খুঁজে বের করা গেলো। সৌভাগ্যক্রমে জায়গাটা এখান থেকে তেমন দূর নয়। বাস সার্ভিসে চমৎকার যোগাযোগ রয়েছে।

মিছরিদার সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে আমি ছুটলাম সন্ধানকারীর কাজ নিয়ে। মিছরিদাকে বললাম, "আপনি সিরাকিউজে চলে যান। খাঁটি বাঙালী সর্দার গুরণেক সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমি

ওখানেই দেখা করবো।"

নতুন জায়গায় চেনাশোনা বেরিয়ে গেলো। ডাঃ উমাপতি ব্যানার্জি এবং তাঁর স্ত্রী সুনয়নী। অনেকদিন পরে উমাপতিকে খুঁজে পেলাম। পুরনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে খুব আনন্দ। উমাপতিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি নবারুণ মজুমদারকে চেনো?"

সুনয়নী বললো, "খুব চেনে, হাড়ে-হাড়ে চেনে। কিছুদিন আগে দেশে গিয়ে বিয়ে করে এসেছে। তারপর এখান থেকে আমাদের জ্বালায় সরে পড়েছে।"

"তা তুমি ওর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে কী করে? মেয়েটি তোমার আত্মীয়-টাত্মীয় নয়তো?"

"মোর দ্যান আত্মীয়।" আমাকে বলতে হলো।

উমাপতি তারপর যা খবর দিলো তাতে আমার মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা। উমাপতি বললো, "ছোটবেলায় বৈঠকখানা বাজারে সুন্দর সুন্দর আপেল আসতো, কিন্তু প্রত্যেকটাতেই পোকা। এই সোনার দেশে এসে সোনার চাঁদ কিছু ছেলের গায়ে পোকা ধরে যায়, ভাই।"

নবারুণ মজুমদার-এর সব ব্যাপার উমাপতির জানা। "ভারী মিষ্টি স্বভাবের ছেলে, কিন্তু ওই আপেলে পোকা। বিলেতে গ্লাসগোতে যখন পি-এইচ-ডি করে তখনই জানতাম। তারপর বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ওঁরা এখানে বেড়াতে এসেছেন। বিখ্যাত পরিবার।"

"তা হলে গোলমালটা কোথায়?"

নবারুণের গায়ে পশ্চিমের হাওয়া লেগেছে, ভাই। ডেটিং করতে তুখড়। মেয়েদের মন পটাতে এক্সপার্ট, বিলিতি নাচে গানে একেবারে চৌকশ খেলোয়াড়। গ্লাসগোতেই ও লুশিয়া বলে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়েটা টিকলো না। ইংলন্ড থেকে আমেরিকায় চলে আসার এটা একটা কারণ।"

"তা নবারুণ এখানে এলো। খুব ভাল চাকরি পেলো। বাবা-মা এদেশে এলেন, বললেন, তুমি দেশে গিয়ে বিয়ে করো। নবারুণ হাঁ না কিছুই বললো না, আমরাও নাক গলালাম না, যদিও আমরা জানতাম, সে মাঝে-মাঝে বাড়িতে গার্ল ফ্রেন্ড আনে। যেসব পুরুষ কৃতী, যাদের রোজগার অনেক, আমেরিকান মেয়েরা তাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না কিছুতেই। পুরুষ নির্বাচনের ব্যাপারে ডলারের প্রভাব মেয়েদের মনের মধ্যে প্রায়ই থেকে যায়।

"ডায়না বলে একটি গার্ল ফ্রেন্ড প্রায়ই ওর কাছে আসতো। নবারুণ তাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিল একবার। আমরা তখন ব্যাপারটা তেমন পছন্দ

করিনি।

"তারপর সেবার নবারুণ দেশে গেলো। দিন আষ্টেক পরে ফিরে এলো এবং আমাদের চারটে মেয়ের ছবি দেখালো। বললো, উমাপতিদা, এদেরই একজনকে বিয়ে করে এলাম।"

নবারুণ বললো, "কী করে বউকে এদেশে আনা যায়, মাথা ঘামাতে হবে।"

"তারপর বেশ কিছুদিন কাটলো। ইতিমধ্যে ডায়ানার সঙ্গে কেটে যাওয়া প্রেমটা আবার গজিয়ে উঠেছে। নবারুণ একদিন বললো, আমি খুব দুঃখিত উমাদা, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আমার সেকেন্ড থট্‌স হচ্ছে বাবা-মা কেন যে আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে গেলেন।

"ছেলেমানুষী কোরো না, নবারুণ। বিয়েটা অত হাল্কা জিনিস নয়," উমাপতি বকুনি দিয়েছিল।

নবারুণ বললো, "অনেক ভেবে-চিন্তেই আমি কুমুদিনীকে চিঠি লিখে দিয়েছি, এই বিয়েটা নাকচ করে দাও।"

তারপর থেকেই প্রচন্ড উত্তেজনা চলেছে। নবারুণের বাবা-মায়ের ধারণা, আগের বিয়ের ব্যর্থতায় ওর মনে একটা ভীতি এসেছে। ও ইচ্ছে করেই নতুন বিয়েটা নষ্ট করতে চাইছে না, একটা ফিয়ার কমপ্লেক্স ওর মধ্যে কাজ করছে। ছেলে অথচ বাপ-মায়ের কোনো চিঠিপত্তরের উত্তর দিচ্ছে না।"

উমাপতি বললো, "তোমরা কী রকম গার্জেন? আমেরিকায় ব্রিলিয়ান্ট ছেলে দেখে মোহিত হও, কোনো খোঁজখবর করো না।"

"নবারুণের বাপ-মাও তেমনি। একটা নিষ্পাপ মেয়ের সর্বনাশ করে তাঁরা ছেলেকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ফিরিয়ে আনবার এক্সপেরিমেন্ট করলেন।"

"আসলে, নবারুণ তখন আবার ডায়ানার মন ও শরীর নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

উমাপতির স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললো, "এই হলো এখানকার সংস্কৃতি—কেমিক্যাল কালচার বলতে পারেন—এদের মনুষ্যত্ব নেই।"

"নবারুণ বলে কী জানেন, কুমুদিনীকে দেখে আমি আকর্ষণ বোধ করিনি। চাপে পড়ে--আন্ডার ডিউরেস বিয়ে করেছি। আমি ভুল করে কিছুক্ষণের জন্যে বাপ-মায়ের ওবিডিয়েন্ট সন্তান হয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে আমি চিন্তা করেছি, নিজের ভুল বুঝেছি। ডায়ানার সঙ্গে আমার একটা চমৎকার সমঝোতা রয়েছে—মনের মিল।"

"বাজে-বাজে বোকো না, নবারুণ," বকুনি দিয়েছে উমাপতিগৃহিণী। "ওই যে মনের মিলটিল শুনছেন, সব ধাপ্পা। স্রেফ শরীরের আকর্ষণ। এতো বড়ো

আস্পর্ধা, বলে কিনা, কুমুদিনী যদি হুট করে এদেশে চলে আসে তাহলে আমাদের ভাই-বোনের মতন থাকতে হবে।"

সুনয়নী : "দেখো নবারুণ, এতো বড় অপমান তুমি কোনো মেয়েকে করতে পারো না। এসব কথা যদি ওর কানে যায়, তাহলে ওর পায়ে ধরলেও ও তোমার কাছে আসবে না।"

উমাপতি বললো, "আমি গতকালই ওর বাবাকে চিঠি লিখেছি, ফিয়ার কমপ্লেক্স বলে মোটেই মনে হচ্ছে না। নবারুণ নিজে যদি বিয়েটাকে রক্ষে না করতে চায় তাহলে কেউ-ই সাহায্য করতে পারবে না।"

বাপ-মা ভয় দেখাচ্ছেন, "ও যদি এইভাবে কুমুকে পুকুরে চুবিয়ে দেয় তাহলে আমরা কোনোদিনই ওকে ক্ষমা করতে পারবো না—ওকে সন্তান হিসেবে মেনে নিতেও আমাদের অসুবিধে হবে।"

সুনয়নী রেগে উঠলো। "মুখের ওপর কী বলে, জানেন? বিয়ের পরের দিনই চলে এসেছি—কুমুদিনীর সঙ্গে দেহসংসর্গ হয়নি, বিয়েটা যখন কনজিউমেটেড হয়নি তখন আমি যতোটা পারি আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দেবো।"

সুনয়নী তখন নবারুণকে বলেছিল, "বৃথাই তোমার ভারতবর্ষে জন্ম—মেয়েদের তুমি কিছুই বোঝোনি। আর তোমার মতো আজেবাজে বাঙালীর কথা আমি কানে শুনেছি, কিন্তু চোখের সামনে এমনভাবে কখনও দেখিনি।"

উমাপতি বললো, "এর পরেই নবারুণ এই শহর ছেড়ে অন্য এক শহরে চলে গিয়েছে। ডায়ানাকেও বোধহয় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। এর পরে তুমি কী কথা বলতে চাও? কুমুদিনীর অপমান ছাড়া কী আর পাবে?"

আমি বুঝছি নমিতাদি তবু জানতে চাইবেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিনা। অগত্যা রাত এগারোটা নাগাদ নতুন শহরে ফোন করলো উমাপতি। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই—এক বিদেশিনী মহিলা ফোন ধরলেন, মনে হলো সুখশয়নে বাধা পড়েছে। এরপর নবারুণ ফোন ধরলো, কুমুদিনীর কথা শুনে আমতা-আমতা করতে লাগলো, ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাড়তি টাকা দিতে চাইলো। তারপর বললো, আগামীকাল ফোন করবে।

পরেরদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। সুনয়নী বললো, "ফোন আসবে না। এরা কী মানুষ!"

উমাপতি বললো, "দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিও, এদেশে কিছু-কিছু বিয়ে ভীষণ ডেনজারাস্। না দেখে-শুনে, স্রেফ পাত্রের বাপ-মায়ের সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভর করে কেউ যেন এদেশে মেয়ের বিয়ে না দেয়।"

সুনয়নী সুরসিকা। বললো, "লোকভয় কথাটা এদেশের ডিকস্নারিতে নেই। তাই আমাদের দেশের কিছু ছেলেও এখানে এসে উচ্ছন্নে যায়। ওর

হাসপাতালের কথাটা শুনুন। মার্থা এবং জন বিয়ে না করেই এক সঙ্গে থাকতে শুরু করলো—এই ছোটলোকের দেশে তার নাম হলো লিভিং টুগেদার! কিছুদিন পরে উৎসব হলো—আমাদের সাধভক্ষণের মতন এখানে হয় 'বেবি শাওয়ার'। লজ্জার মাথা খেয়ে বন্ধুবান্ধবদের ডাকলো, তারা গিফ্‌ট দিয়ে এলো। আরও কিছুদিন পরে জন নিজমূর্তি ধারণ করলো। সে মার্থার রোজগারে বসে-বসে মদ খায়, কাজ করে না। আর সহ্য করতে না পেরে মার্থা ওকে তাড়িয়ে দিলো। তারপর একদিন জন বাড়ির ছাদ ফুটো করে ভিতরে ঢুকে ছেলের সামনে পুরনো গার্লফ্রেন্ডকে রেপ করেছে। মার্থার কপাল কেটে দর দর করে রক্ত পড়ছে। পুলিশ এলো, জন ধরা পড়লো। আদালতে জেল হলো দু'বছরের। এই ক'দিন আগে মার্থার সঙ্গে দেখা হলো। আগে নাদুসনুদুস ছিল। এখন একটু স্লিম হয়েছে। কী ব্যাপার মার্থা?" জিজ্ঞেস করতে মেয়েটা নির্লজ্জের মতন বললো, রোগা হচ্ছি, একজন বয় ফ্রেন্ড তো প্রয়োজন। মেয়েদের ওজন একটু বেশি হলে আজকাল কোনো পুরুষমানুষ তার দিকে তাকাতে চায় না।"

সুনয়নী বললো, "এদের কলেজের প্রফেসর ডিক কানিংহাম। বউ, দুটি ফুটফুটে ছেলে। সেইসব ছেড়ে ল্যাবের নার্স নর্মার সঙ্গে ভিড়লো। নর্মার তিনটি বাচ্চা—এখন দু'জনে সমাজের মুখে ছাই দিয়ে লিভিং টুগেদার। এই তো সমাজের অবস্থা। অথচ যখন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে কেউ দাঁড়াবে, তখন সুখী দাম্পত্যজীবনের জয়গান গাইবে। টেলিভিশনে বলবে, স্বামী-স্ত্রী সন্তান-সন্ততির সংসারই হলো আমেরিকান জীবনের মেরুদন্ড। ডাহা মিথ্যে কথা। যারা এত অপরিণতবুদ্ধি, যাদের ব্যক্তিজীবনে এতো বঞ্চনা তাদের হাতে দুনিয়ার ভার দেবে কী করে? কোটি-কোটি মানুষের জীবনমরণের দায়িত্ব এদের হাতে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।"

উমাপতি বেশি কথা না বলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলো। সুনয়নী বললো, "ওই নবারুণকে আর কখনও আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন কোরো না। ওকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম খেতে বোলো, কারণ ওর মেরুদন্ডটা এদেশে এসে বেঁকে গিয়েছে।"

সুনয়নীর বক্তব্য, এদেশের বিষাক্ত পরিবেশে পড়ে অনেক ভারতীয়ও মূল্যবোধ হারিয়ে নির্লজ্জ ব্যবহার করছে। "ওর কলেজবন্ধু দেবকান্ত দাশকে দেখুন না। আর-জি-কর-এ ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়বার সময়ে বিয়ে করল ধনী পরিবারে। শ্বশুরের পয়সায় এদেশে পড়তে এলো। দেশে একটা বাচ্চা ছিল—অথচ এখানে আমেরিকান মেয়ে নিয়ে, কোরিয়ান মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করে বেড়িয়েছে। শুনেছিলাম এক হাসপাতালে ফরাসী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। তা আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেবকান্ত দাশের দেখা হয়ে গেল এক ডাক্তারি

কনফারেন্সে। এতো বড় আস্পর্ধা, বলে কিনা চল আমার ফিঁয়াসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আপনার বন্ধুর তো ফিঁয়াসকে দেখে চক্ষু চড়কগাছ। ভদ্র মহিলার বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ, সঙ্গে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে, তাকেও এনেছেন। আপনার বন্ধু তো ভেবেছিল, এই কমবয়সী মেয়েটির সঙ্গেই দেবকান্তর ভাবসাব।"

উমাপতি জিজ্ঞেস করেছিল, "তোর দেশের বউয়ের খবর কী?"

দেবকান্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, "এখনও দুরারোগ্য আমাশয়ের মতন পিছনে লেগে আছে। শাশুড়ি ভয় দেখাচ্ছে, জব্দ করবে।"

"এই লোকটির সঙ্গে আপনার বন্ধুর আবার দেখা হয়েছিল কয়েক বছর পরে। তখন নির্লজ্জের মতন বললো, 'টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার ওল্ড চিক-এর সঙ্গে একটু ভাব-ভালবাসা হচ্ছে।' আগেকার বুড়িকে ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ওকেই বিয়ে করেছে। শেষ যা খবর পাওয়া গিয়েছে ওদের একটি ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে।"

নরনারীর অবাধ দেহমিলন থেকে যে যথেচ্ছাচারী সমাজ পশ্চিমে আজ দুর্জয় শক্তিতে প্রভুত্ব করছে তার সম্বন্ধে আমি মন খুলে আলোচনা করেছিলাম নিউ ইয়র্ক স্টেটের সিরাকিউজ শহরে কার্ডিওলজির অধ্যাপক ডঃ শক্তি মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে এবং ক্লিভল্যাণ্ডে সমাজসেবার প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রণব যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত তার নাম কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি।

শক্তি আমাদের সমবয়সী—এদেশে স্থায়ী বসবাস করার আগে পূর্ব জার্মানি ও ইংলণ্ডে প্রভূত সামাজিক এবং ডাক্তারী জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। শক্তি-গৃহিণী জ্যোৎস্না সিরাকিউজের ভারতীয় তরুণদের অভিভাবিকার মতন। তার বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব সরস্বতী পুজো লেগেই আছে। শক্তি-গৃহিণী জ্যোৎস্নার মতে, "এদেশে মানুষ সেল্‌ফমেড এবং আত্মনির্ভরশীল, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিকতা সমাজদেহের মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করেছে। শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিচরিত্রের একটা সম্পর্ক আছে ভাবতাম। কিন্তু এদেশে এসে দেখলাম ব্যাপারটা ভুল।"

শক্তি বললো, "আঠারো বছরের মধ্যে প্রায় সব ছেলেমেয়ের যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে—ডেটিং মানে তো দু'তিন বারের দেখাশোনার মধ্যেই বিছানায় শুতে হবে।"

শক্তির বাড়িতে খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ কুমার আশুতোষ বললেন, "এই

পরিবেশেও ভারতীয় মেয়েরা স্বদেশ থেকে এসে আদর্শ স্থাপন করছে। সে শুধু বধূ নয়, গৃহবধূও বটে—অর্থাৎ এক অঙ্গে শতরূপ। যিনি মিসেস তিনিই অন্নপূর্ণা, ধোপানী, মেথরানী, ধাইমাতা, সারথিনী এবং বাজার-সরকার ! এর পরেও যখন অর্ধেক ইণ্ডিয়ান মহিলা অর্থোপার্জনের জন্যে কাজ করতে বেরোন তখন প্রশংসা না করে পারা যায় না।"

সার্জারির অধ্যাপক ডাঃ তুষার রায় বললেন, "মুশকিল হলো, ডলারের ঔদ্ধত্য সীমাহীন। মিথ্যে কথা বলাটা এখানকার এক শ্রেণীর আমেরিকান সূক্ষ্ম আর্টের স্তরে নিয়ে গিয়েছে। এরা সব সম্পর্ক, এমনকি স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কও ডলার দিয়ে হিসেব করতে শিখেছে। স্বামী ও স্ত্রীর আলাদা ব্যাংক আকাউন্ট। আলাদা আলাদা হিসেবপত্তর। ছেলেমেয়ে স্ত্রী কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। পার্থিব সুখ অঢেল হলেও তাই কোথাও অসীম শূন্যতা থেকে যাচ্ছে। মার্কিনিরা কিছুতেই স্পিরিচুয়াল সন্তুষ্টি পাচ্ছে না। তাই সব আমেরিকান সাইকোথেরাপিস্ট আছে—চেম্বারে গিয়ে ডাক্তারের সামনে বসে আধঘন্টা ধরে মিষ্টি কথা শুনে আসে মোটা ফি-এর বিনিময়ে। দলে-দলে স্ত্রী পুরুষ বিবাহ-সম্পর্কের বাইরে সারাক্ষণ যৌন-সম্পর্কের খোঁজ করছে এবং পাচ্ছে। মেয়েরা যখন কারুর খপ্পরে পড়ছে তখন ভালবাসা ছাড়া ডলারের হিসেবনিকেশও করছে।"

অধ্যাপক রায় বললেন, "আমেরিকানরা কাজে ফাঁকি মারে না এটা বাজে কথা। সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়। আর ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে বলাটা এদের জাতীয় চরিত্র। গ্রেট, সুপার্ব, গ্লোরিয়াস কথাগুলো তাই এরা মুড়ি-মুড়কির মতন ব্যবহার করে।"

এদেশের পরিবেশে ভারতীয়দের মধ্যে তিনটে শ্রেণী দেখতে পাবেন। (১) যারা কর্মক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মার্কিনিদের সমতুল্য হলেও নিজেদের মূল্যবোধ একটুও পরিবর্তিত হতে দেয়নি। (২) যারা ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক হয়েছে—হঠাৎ আমেরিকান চাকচিক্য দেখে বিমূঢ়। এরা নিজেদের ভারসাম্য হারিয়ে সপ্তাহের শেষে বাড়িতে রঙিন আলো জ্বালিয়ে ডিসকো নাচছে। (৩) একেবারে মনেপ্রাণে আমেরিকান হয়েছে যারা—এরা স্বদেশিয়ানা বিসর্জন দিয়েছে এবং এদেশের দোষগুণ সব কিছু গ্রহণ করছে বিনা প্রশ্নে।"

কলকাতায় পড়াশোনা করা নিষ্ঠাবান বাঙালী গুরুণেক সিং ন্যাশনাল লাইব্রেরির চাকরি ছেড়ে অনেকদিন প্রবাসী। এমন চমৎকার মানুষ, এমন সাহিত্যপ্রেমী রসিক বাঙালী আমি জীবনে কম দেখেছি।

পাগড়িপরা গুরুণেক বললো, "এদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য—কেউ নীচ, কেউ মহৎ। বিভিন্ন কালচার থেকে এসেছে, কিন্তু আমি এদের ওপর সব সময় নির্ভর

করতে পারি না। অবশ্য আমার জন্মভূমিতেও ছিল নানা সমস্যা। আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক প্রত্যাশা সবসময় সন্ধি করে না। আমরা ভালবাসি একজনকে বিয়ে করি অন্যজনকে। আমাদের হিসেবের ঠিক থাকে না। এদেশের লোকগুলো অন্তত যা করে সোজাসুজি করে। ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই এখানে। আমাদের বোধহয় জাতীয় চরিত্র বলে কিছুই নেই, আমরা সুযোগ পেলেই অন্যকে টেনে নামাবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই সমাজেও আমি নিজেকে প্লেস করতে পারি না। সোনার চাঁদ ছেলে সায়েবদের মধ্যেও আছে, কিন্তু স্থিরতা নেই—এদের সাংস্কৃতিক স্টেবিলিটি আমি ধরতে পারি না। দু'টো তিনটে ছেলে নিয়ে সুখের সংসার—হঠাৎ বাবা অন্য মেয়ে নিয়ে সরে পড়লো। এদেশে আমার মেয়েদের বিয়ের কথা যখন ভাবি, তখন আমি সংস্কৃতির জন্যে অতটা মাথা ঘামাই না যতটা দুশ্চিন্তা করে ওদের পারিবারিক নিরাপত্তার।"

শক্তি বললো, "বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রজন্মের মেয়েদের নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বাবা-মায়েরাও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। আমার এক বিশেষ বন্ধু—তাঁর দুটি মেয়ে এখানে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ছে। এদের নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সারাক্ষণ মতবিরোধ। বাবা চাইছেন ভারতীয় প্রথায় মেয়েদের আগলে রাখতে। স্ত্রী কলকাতার রক্ষণশীল পরিবার থেকে এদেশে এসে আধুনিকা হয়েছেন। তিনি মেয়েদের পূর্ণস্বাধীনতা দিতে চাইছেন। বলছেন, ওরা সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নেবে না কেন? স্বামী নির্বাক, কিন্তু প্রবল আপত্তি। স্ত্রী বললেন, ছেলেরা যদি যা-ইচ্ছে-তাই করতে পারে, মেয়েরা কেন করবে না? স্বামী অসহায়ভাবে বলেন, মেয়েরা করতে পারবে না কেন? কিন্তু খেসারত কে দেবে? মেয়েরাই তো শেষ পর্যন্ত যা-ইচ্ছে-তাই কাজকর্মের ভিকটিম হবে।"

একই বিষয়ে নানা আলোচনা হলো ক্লিভল্যাণ্ডে, অপ্যাধক প্রণব চ্যাটার্জির সঙ্গে। কতদিন পরে প্রণবের সঙ্গে দেখা। হাওড়া বিবেকানন্দ ইস্কুলে আমার থেকে কয়েক ক্লাস নিচুতে পড়তো—ভারী ফুটফুটে ছেলে। প্রণব সমস্ত সমস্যাটা এখন বৈজ্ঞানিকের চোখে দেখছে।

প্রণবের বাড়িতে একদিন দু'জনে বহু রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হলো। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে আমেরিকান মেয়েদের পার্থক্য কোথায়?

প্রণব সোজাসুজি বললো, "আমেরিকান মেয়েদের অত সহজে সতীত্ব যায় না, ভারতীয় মেয়েদের মতন। আগুন নিয়ে খেলা এবং পুতুল নিয়ে খেলা, যদিও কিছু ভারতীয় মেয়ে চিরকালই আগুনের মতন হয়। তবে যতই আগুন হোক, বাঙালী মেয়েরা আদর্শবাদের ব্যাপারে বাঙালী মূল্যবোধ ব্যবহার করবেই। আমি ধরুন, বাপ-জ্যাঠাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জীবনে সফলকাম হলাম, বিদেশে আসতে পারলাম। আমার এক বান্ধবী ছিলেন শান্তিনিকেতনে, তিনি আমাকে এখনও গালাগালি দেন তুমি বাবার সঙ্গে অন্যায় করেছো। আমি যে সমাজবিদ্রোহী তা বাঙালী মেয়েরা দেখা হলেই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আমেরিকান মেয়েদের কাছ থেকে এ-বিষয়ে সমর্থন আসে। আমার সঙ্গে বাবার কেন মতান্তর হলো তা আমেরিকান মেয়েদের বোঝানো যায়।"

প্রণব বললো, "বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সাধারণত স্বামীর জন্যে সংসারের জন্যে ত্যাগ অনেক বেশি ! স্বামীর প্রয়োজন সম্বন্ধে তারা অনেক বেশি সচেতন, সে-জন্যে নিজেদের কেরিয়ার অতি সহজে ত্যাগ করতে পারে। বিদেশে বাঙালী মেয়েদের যত ডাইভোর্স হয় তার জন্যে উদ্যোগ আসে পুরুষদের মধ্য থেকে। খোঁজ নিয়ে দেখবেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রথম হাঙ্গামা বাধিয়েছে পুরুষরা।"

"দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয় মেয়েদের সম্পর্কে বাবা-মায়ের ভীষণ চিন্তা—এদের কী হবে ?" প্রশ্ন করলাম অধ্যাপক মহাশয়কে।

প্রণব হেসে বললো, "মেয়েদের যা হবে ছেলেদেরও তা-ই হবে ! ইটালিয়ান, আইরিশ, গ্রীক অনাবাসীদের যা হয়েছে আমাদেরও তাই হবে—বিশাল সংস্কৃতির সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে—নিজেদের কর্মজীবন এবং বিবাহজীবন কেমন হবে তা বাপ-মায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ছেলেমেয়েরা স্থির করবে। এরা নিজেদের জীবনে ভুল করবার স্বাধীনতা দাবি করবে এবং আস্তে-আস্তে এরা বাবা-মাকে বার্ধক্যেও অবহেলা করবে।"

"পরবর্তী প্রজন্মে তাহলে এদের ভারতীয়ত্ব একেবারে মুছে যাবে ?"

প্রণব একমত হলো না। "পলিটিক্সে একট ছাপ থাকবে বোধ হয়। আফ্রিকানদের যেমন আফ্রিকার ওপর, ইটালিয়ানদের যেমন ইটালির ওপর, ইহুদীদের যেমন ইজরায়েলের প্রতি টান রয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়দের হয়তো ভারতের দিকে রাজনৈতিক টান থাকবে—মহাত্মা গান্ধীকে, জহরলাল নেহরুকে এরা নিশ্চয় মাথায় করে রাখবে।"

"বাপ-মাকে শ্রদ্ধা করা, বার্ধক্যে বিপদে-আপদে বাপ-মায়ের দেখাশোনা করা, এসব দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়দের মধ্যে থাকবে না বলছো ?" আমার এই প্রশ্নে প্রণব ফোঁস করে উঠলো।

তার বক্তব্য, "বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করা, আর বাবা-মাকে তোমার জীবনটা

পুরোপুরি কনট্রোল করতে দেওয়া এক জিনিস নয়। এদেশের ভারতীয় বাবা-মায়ের প্রায়ই ডবল-স্ট্যাণ্ডার্ড থাকে, অথচ অনেক সময় নিজেরাই সে-সম্বন্ধে অবহিত নন।"

প্রণবের মতে, "দুই প্রজন্মের বিরোধ সায়েব-আমেরিকাতে বিরল নয়। প্রায়ই ঘটছে এবং তখন হয় ছেলে, না-হয় বাবা-মা সোস্যাল ওয়ার্কারের সঙ্গে কথা বলছে অথবা সাইকোথেরাপিস্ট-এর কাছে ছুটছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এটা হ'ল ভীষণ ব্যাপার। সবাই সারাক্ষণ সাংসারিক বিরোধের ব্যাপারটা চেপে রাখার চেষ্টা করছে। দুই প্রজন্মের মধ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাব হচ্ছে একথা আমি বলবো না, যা-হচ্ছে তা হলো দুই প্রজন্মের মূল্যবোধের মধ্যে সংঘাত।"

"বয়োজ্যেষ্ঠদের তাহলে সমাজে কোনো সম্মান থাকবে না?"

প্রণব আবার মুখ খুললো, "মনে রাখবেন, এদেশে বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে অনেক টাকা-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি আছে। সুতরাং অর্থনৈতিক অপমান সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা হলো, এদেশে মানুষ অনেক দীর্ঘজীবী হচ্ছে—পুরুষদের গড় আয়ু এখন চুয়াত্তর, মহিলাদের আটাত্তর। এঁদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় ক্রমশ বাড়ছে। অথচ এতোদিন এখানে ছিল কেবল যৌবনের জয়গান—যাকে এরা বলে ইউথ-ওরিয়েন্টেড কালচার—যৌবনমুখী সংস্কৃতি। ফ্রান্সে ও সুইডেনে দেখলাম বয়োজ্যেষ্ঠরা দলবদ্ধ হয়ে ভোটের ভয় দেখিয়ে অনেক সামাজিক সম্মান ও সুবিধে দাবি করছেন এবং পাচ্ছেন। এদেশেও তাই হবে—তবে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, ব্যক্তিগত ভক্তি-সম্মানের জোরে নয়। ছেলেমেয়েরা সম্মান করুক না করুক, সরকার অনেক সুযোগ-সুবিধে দেবেন।"

আমরা আবার মার্কিন দেশে দাম্পত্যসম্পর্কের সাম্প্রতিক ধারা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম। অভিজ্ঞ সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে প্রণব অবশ্য কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এ-বিষয়ে উৎসাহ দেখালো না। কিন্তু মার্কিন দেশে বর্তমানে কী হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই হাওয়া আমাদের দেশে কতটুকু আসতে পারে সে-সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করলো।

তথাকথিত মানবস্বাধীনতা ও মানবমুক্তির দেশ আমেরিকায় মেয়েদের বেশ কিছু অসুবিধে এখনও রয়েছে। যেমন, তিরিশ পেরোলে মেয়েদের বিয়ে হবার সম্ভাবনা খুব কম—প্রতি একশোতে মাত্র একটি। ফলে এদেশে তিরিশের ওপর অনেক আইবুড়ো মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা পুরুষের সঙ্গ চায়, অথচ চট করে সাদা পুরুষমানুষ পাচ্ছে না। সমান সুযোগের দেশ বলে বিখ্যাত এই সমাজে পুরুষমানুষরা তাদের থেকে কম বয়সের মেয়েদর সান্নিধ্য পেতে পারে, কিন্তু

তার উল্টোটা সম্ভব নয়। পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়ে কিছুতেই পঁচিশ বছরের পুরুষ পাবে না। কিন্তু পঁয়ত্রিশ কেন পঞ্চাশ বছরের পুরুষ পঁচিশ বছরের মেয়ে নিয়ে আকচার ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেশি লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের সামাজিক অসুবিধে আছে। কারণ বেশি লেখাপড়া জানা মেয়ের প্রয়োজন উচ্চশিক্ষিত স্বামীর। প্রণবের যেসব ছাত্রী এম-এ পড়ে তারা এম-এ পাশ স্বামী চায়।

কয়েকদিন আগে প্রণব তার এক ছাত্রীকে বলেছিল, "তুমি এতো মেধাবী মেয়ে, পি-এইচ-ডি করছো না কেন?" সে মিষ্টি হেসে উত্তর দিলো, "বেশ বলছো! আমি ডক্টরেট করলে কে আমাকে বিয়ে করবে শুনি? বিয়ের বাজারে মেয়ে ডক্টরেটদের কোনো জায়গা নেই।"

পড়াশোনায় ভাল মেয়েরা যে সত্যিই বিয়ের বাজারে মার খায় তা এদেশে না এলে বিশ্বাস হয় না। প্রণবের এক মেধাবী ছাত্রী অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে একটি স্বামী খুঁজে পেলো এবং লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে বিয়ে করলো। কিন্তু বিয়ে টিকলো মাত্র পাঁচ বছর বেচারা অনেক বেশি বয়সে আবার পি-এইচ-ডি করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে—কিন্তু পোস্টগ্র্যাজুয়েট চাকরির বাজারে সে অনেক জুনিয়র হয়ে যাবে।

মেয়েদের শুধু পড়াশোনায় মন দিলে হবে না, সময় মতো স্বামী পাকড়াবার জন্যে ছেলেদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতে হবে এবং তাদের প্রশয় দিতে হবে। প্রশ্রয় মানে, বিছানায় যেতে আপত্তি করা চলবে না।

নতুন অসুখবিসুখের ভয় অবাধ যৌনস্বাধীনতার ব্যাপারে সাময়িক বিপর্যয় এনেছে। আজকাল চট করে বার-এ গিয়ে মদ্যপান করে তারপরেই রাত্রে বিছানায় যাওয়া সহজ হচ্ছে না। অনেকে একটু সঙ্গীর স্বাস্থ্যটা বাজিয়ে-টাজিয়ে নিতে চায়। কারণ সিফিলিস, গনোরিয়ার চট করে চিকিৎসা হয়। (এদেশে ঠাট্টা করে বলে 'চিকেন'), কিন্তু হারপিস বলে একটা অসুখ হলে সারাজীবন ভুগতে হয়। খুব বড় ধরনের অসুখ হয়, যৌনাঙ্গে প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক ফোস্কা হয়। নতুন আসরে নেমেছে এইডস্—এটা হলে এক বছর পরমায়ু। এখানে এই রোগটা কুষ্ঠ রোগের মতন, লোকে ভীষণ ভয় পায়।

প্রণব আমার একটা ভুল ভেঙে দিলো, "দাম্পত্য সম্পর্কচ্ছেদের সময় মানুষের খুব কষ্ট হয়। ধরো পাঁচ বছর আগে তুমি বিয়ে করেছো। আর তোমার বাইরে রক্ষিতা আছে। স্যরি, এদেশে রক্ষিতা হয় না, বান্ধবী আছে। তার সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে। স্ত্রীকে ছেড়ে তোমার আবার বিবাহ করার ইচ্ছা হলো। তুমি নিজেই অন্যায় করছো, তবু বিচ্ছেদের মুহূর্তে তোমার দুঃখ হবে। তুমি এবং তোমার স্ত্রী দু'জনেই ছুটবে সাইকোথেরাপিস্ট-এর

কাছে—অনেকটা আমাদের দেশে গুরুদেবের কাছে যাওয়ার মতন। সাইকিয়াট্রিস্ট এই ইনডাস্ট্রিয়াল সমাজে হাই-প্রিস্ট হয়ে উঠেছে।"

ডাইভোর্স চলাকালীন মানুষ এ-সমাজে ভীষণ মুষড়ে পড়ে, যদিও ঘরে-ঘরে ডাইভোর্স চলছে। প্রণব দেখেছে, বড় বড় অধ্যাপক ডাইভোর্সের যন্ত্রণার সময় গবেষণার কাজ করেন না। পি-এইচ-ডি ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তৃতা দিতে বললে তারা খুব খারাপ করে। লোকে অবশ্য সহানুভূতি দেখায়। বলে, ওমুক এখন খুব খারাপ ডাইভোর্সের মধ্য দিয়ে চলেছে। ওরা এটাকে সাময়িক শারীরিক অসুস্থতার মতন ধরে নেয়। সেই অনুযায়ী দয়াদাক্ষিণ্য দেখায় এই আশায় যে, তুমি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আবার কাজেকর্মে মন দেবে।

ডাইভোর্সের ভয় গোটা সমাজকেই সারাক্ষণ একটা মানসিক অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেছে বলাটা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। মানুষ জানে, ঘর ভাঙলে আবার দাম্পত্যসম্পর্ক তৈরির জন্যে নিজের শরীরটা সারাক্ষণ আকর্ষণীয় রাখতে হবে। বিষয়সম্পত্তির হিসেবে সারাক্ষণ নজর দিতে হবে।

প্রতি স্টেটে ডাইভোর্সের আইন আলাদা। বেশির ভাগ রাজ্যে আইন—কোনো লিখিত ব্যবস্থা না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি দু'ভাগ হবে। ডাইভোর্স মানেই মোটা খরচের ধাক্কায় পড়া। "মনে করো দশ বছরের বিয়ে। বিয়ের পর বাড়ি কিনেছো। বাড়ির দাম এখন দেড় লাখ ডলার। এর থেকে ব্যাঙ্কের দেনা-দশ হাজার ডলার। সেটা বাদ দিয়ে সম্পদ দু'ভাগ হয়ে যাবে।"

কিন্তু ডাইভোর্স থেকে মেয়েরাই বেশি যন্ত্রণা ভোগ করে পুরুষদের থেকে। এ বিষয়ে নানা সমীক্ষার উল্লেখ করলো প্রণব।

অনেকসময় স্বামীর তুলনায় আমেরিকান বউয়ের বেশি কর্মদক্ষতা বা কোয়ালিফিকেশন থাকে না। প্রণব তার এক ছাত্রীর কথা বললো। তার বয়স এখন আটত্রিশ, নতুন পড়তে এসেছে। এর বিয়ে হয় বাইশ বছর বয়সে, স্বামীর বয়স তখন চব্বিশ। দু'জনেই প্রেমে গদগদ। স্বামী মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। মেয়েটি ছ'বছর চাকরি করে পড়ুয়া স্বামীর ভরণপোষণ করেছে, ডাক্তারি ডিগ্রি পাবার স্বপ্ন সফল হয়েছে। স্বামী এখন সুপ্রতিষ্ঠিত—তাঁর এখন কমবয়সী গার্ল ফ্রেন্ড অনেক। স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি পঁচিশ বছরের এক মেয়েকে নিয়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আটত্রিশ বছরে ডাইভোর্সড হয়ে মেয়েটির কী দুরবস্থা। তেমন কোনো স্কিল নেই, অনেক বছর চাকরির অভিজ্ঞতা নেই। স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া খোরপোষের টাকায় সে আবার কলেজে পড়তে এসেছে।

চল্লিশোত্তর বিবাহ-বিচ্ছেদে মেয়েদের দুর্গতির ছবি এদেশে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বেশির ভাগ সময়ে স্বামীর বান্ধবী থাকে। স্ত্রীকে ফেলে দিয়ে কমবয়সী মেয়ে নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত ডাইভোর্স হলো। দু'তিন বছরের মধ্যে ধাক্কা সামলে নিচ্ছে পুরুষরা, তাদের রোজগার আবার বাড়তে শুরু করছে। কিন্তু মেয়েরা যে-তিমিরে সে-তিমিরে।

প্রণবরা একেই বলে—'দারিদ্র্যর মহিলাকরণ' বা ফ্যামিনিনাইজেশন অফ পভার্টি। পঁয়ত্রিশ বছরে নতুন স্বামী পাওয়া খুব শক্ত। বহু ডাইভোর্সড মহিলা দেখা যায় আমেরিকান সমাজে, যাঁরা দ্বিতীয়বার স্বামী জোগাড় করতে পারেননি।

"তাহলে উপায়?" আমার মন্তব্য শুনে প্রণব হাসলো!

একটা আশার কথা শোনা গেলো, "এদেশে বলে, পনেরো বছর পেরিয়ে গেলে বিয়ে সহজে ভাঙে না। যদিও তিরিশ বছরের বিয়ে ভাঙতেও আমি দেখেছি।

"যে-বিয়েগুলো টিকে যায় সেখানে স্বামী স্ত্রীর অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুযোগ পেয়েও এরা পিছলে পড়ে না, বিয়ের বাইরে চটপট দেহসম্পর্ক স্থাপনের জন্যে এরা উদ্‌গ্রীব হয় না। এদের কেউ-কেউ বলে, একটা মানুষকে সারাজীবন ধরে খুঁজে পাওয়া, বারবার খুঁজে পাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা তুলনাহীন।"

প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক কার্ল রজার্স তাঁর পঞ্চাশ বছরের বিবাহোৎসবের পর চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কী করে অংশীদার হতে হয়। তিনি লিখেছিলেন, 'পঞ্চাশ বছর ধরে আমি শিখছি আমার স্ত্রী মানুষটি কী রকম। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমি আবিষ্কার করি—এ মানুষটা তো সে-মানুষটা নয়। পাঁচ বছর আগেকার মানুষটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সব মানুষই সদা পরিবর্তনশীল। অথচ হৃদয়ের গভীর থেকে প্রেমের এবং আত্মনিবেদনের অনুপ্রেরণা আসছে।' মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের লাইন? 'পুরানো জানিয়া চেও না আমাকে আধেক আঁখির পরে'।

প্রণব বললো, "আমাদের দেশে বিয়েটা সামাজিক কনট্রোলের অঙ্গ আর এদেশে বিয়ের ব্যাপারটা ভীষণ রোমান্টিক। স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের কাছে প্রত্যাশা ভীষণ রোমান্টিক—স্ত্রী ভাবে আমার স্বামী আমাকে সারাক্ষণ ইমোশনাল বল যোগাবেন, মিষ্টি কথা বলবেন, রোমান্টিক থাকবেন। প্রেমের সময় মনে থাকে না সারাজীবন ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে কবিতা পড়া যায় না।"

তাই কোনো ছাত্রী যখন বলে, বিয়ের পর থেকে স্বামী স্ত্রী একই সঙ্গে বড় হচ্ছে না—গ্রোয়িং টুগেদার না হয়ে গ্রোয়িং অ্যাপার্ট হচ্ছে তখনই প্রণব আন্দাজ

করে বিয়েটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। "যাদের বিশ-বাইশ বছর বয়সে খুব সুখী দম্পতি মনে হচ্ছে তাদের ওপর নজর রাখো, খোঁজ নাও পনেরো বছর পরে জীবনটা কোনদিকে মোড় নিলো। চব্বিশ বছর বয়সের সুখ আটত্রিশ বছর বয়সে বিচ্ছেদের বিষ হয়ে দাঁড়ালো। কয়েক বছরের মধ্যে বিয়ে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা এ-দেশে অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।"

"বিয়ে ভাঙবার একটা কারণ, বিবাহবন্ধনের বাইরে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চাপ সব সময় রয়েছে এই সমাজে। যতই গালাগালি দেওয়া যাক, প্রতিষ্ঠিত পুরুষ ও সুশ্রী মহিলাদের বিবাহ-অতিরিক্ত দেহসংসর্গের সুযোগ সর্বদাই রয়েছে এদেশে। মেয়েদের যদি আমাদের সমাজের মতন জবুথবু বুড়ি করে বাড়িতে রেখে দেওয়া যায় তাহলে তাদের সুযোগ হবে না, কিন্তু পুরুষরা সুযোগ পাবে তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে। সুতরাং এদেশে বিয়েটাকে অটুট রাখতে হলে সামাজিক চাপ থেকে অন্তর্নিহিত মানসিক সম্পর্কের বন্ধন বেশি প্রয়োজন।"

ডাইভোর্সের অভিশাপের মধ্যে যেসব ছেলেমেয়ে বড় হয়ে ওঠে তাদের মানসিকতা সম্বন্ধে প্রণব কিছু খোঁজখবর করেছে। সে যা বললো, তা বেশ চিন্তার ব্যাপার। "এদেশে দেখবে বাইশ-চব্বিশ বছরে অনেক ছেলে-মেয়ে বলবে, আমার বাবা-মায়ের ডাইভোর্স হয়েছিল, তার জন্যে জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমি আমার ছেলেমেয়েদের সেই বিপদে কিছুতেই ফেলবো না।" কিন্তু সবচেয়ে যা দুঃখের, এক প্রজন্মের বৈবাহিক অনিশ্চয়তা বংশগত বিষের মতন পরবর্তী প্রজন্মকে একই দোষে দুষ্ট করে তোলে।

প্রণব সুন্দর ব্যাখ্যা করলো, "চব্বিশ বছর বয়সে ডাইভোর্সে তোমার প্রচণ্ড ভয়। অনেক দেখেশুনে ছাব্বিশ বছরে তুমি বিয়ে করলে। কিন্তু তারপর বংশগুণে তুমি নিজেই কী করে বসলে তা জানো না। অচেতন মনে তুমি ডাইভোর্স করা বাবা অথবা মাকে নিজের মডেল করে বসে আছো। কাউকে কবিতা-টবিতা বলে, গানটান শুনিয়ে, ওয়াইন খাইয়ে, গালে চুমু খাইয়ে সঙ্গ দেওয়া এক জিনিস আর কারও সঙ্গে পাঁচ বছর ঘর করা আর এক জিনিস। প্রেমের সময় তুমি বার-বার বললে, ডাইভোর্স তুমি অপছন্দ করো, কিন্তু বিয়ের পর ঘর করতে গিয়ে দেখলে অমুক হচ্ছে না, তমুক হচ্ছে না। তারপর একদিন বাইরে চান্স পেয়ে কারও সঙ্গে শুয়ে এলে। সোজা বাংলায়, ডাইভোর্সড বাবা-মায়ের বিবাহিত জীবনে ডাইভোর্স হবার সম্ভাবনা অন্যের তুলনায় অনেক বেশি।"

এদেশে কিছুদিন বসবাস করে যেসব ভারতীয় হুট করে দেশে গিয়ে বিজ্ঞাপন মাধ্যমে বিয়ে করে আনে তাদের কথা উঠলো। প্রণবের মতে, ভারতীয়

বিয়েগুলো বেশি টেকে এইজন্যে যে মেয়েদের সহ্যশক্তি অসীম। ডেটিং-এর প্রতিযোগিতায় ভারতীয়রা প্রায়ই আশানুরূপ ফল করতে পারে না এইজন্যে যে তাদের এ-বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। একজন মেয়েকে কি করে উইক-এণ্ডে সময় কাটানোর জন্যে নেমন্তন্ন করতে হয় তাই জানে না ভারতীয় ছেলেরা। তারপর যদি বা কোনো কোনো মেয়ে বেরলো, কিছুক্ষণ পরেই ব্যাপারটা কেমন অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়! বাঙালী ছেলেরা তো একবার দু'বার ডেটিং করলেই প্রেমে পড়ে যায়। এদেশের ছেলেরা অথবা মেয়েরা এত সহজে প্রেমে পড়ে না।

প্রণব জানালো, বেশিরভাগ ভারতীয় ছেলেই ডেটিং সংস্কৃতিতে ব্যর্থ—জবুথবু মেরে যায়। তার ওপর ভারতীয়রা তো শাদা মেয়ে ছাড়া প্রেম করে না, কালো মেয়েদের দিকে কোনো নজর নেই। শাদা মেয়ে যখন হাতছাড়া হয়ে যায় তখন হুট করে দেশে গিয়ে একটি দেশীমেয়ে বিয়ে করে আনে।

প্রণব তার একজন ছাত্রের কথা বললো। মোটামুটি ভাল ছাত্র, ব্যাডমিনটন খেলে, কিন্তু ইংরিজি উচ্চারণে দোষ, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে একটু অপটু। সে শিকাগোয় ডেটিং করলো, কিন্তু তেমন ভাল ফল হলো না! যে শাদা মেয়েদের তার মনে ধরেছিল তারা ওকে পছন্দ করেনি, আর যারা ওকে পছন্দ করেছিল সে তাদের জন্যে তেমন আকর্ষণ বোধ করেনি। এক কথায়, আমেরিকান মেয়েদের মনোরঞ্জনে সে সফল হয়নি।

তারপর একদিন সে কলকাতায় গিয়ে শুনলো এক ডাক্তার মেয়ে রয়েছে। ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম-বি-বি-এস পাশ করেছে। খুব উৎসাহী হয়ে সে বিয়ের প্রস্তাব দিলো এবং একবার মাত্র মেলামেশা করে বিয়ে করে ফেললো। বিয়ের পর তড়িঘড়ি বউকে এদেশে নিয়ে এলো এই আশায় যে, এদেশে ডাক্তার হলে অনেক রেজগার করতে পারবে। স্ত্রীর নাম বনলতা।

বনলতা বললো, "তুমি আমাকে বিয়ে করে এনেছো। আমি আর ডাক্তারি করবো কেন? আমি ছেলেপুলে মানুষ করবো। দু'বছরে দুটি ছেলেমেয়ে হলো।"

স্বামী দেবতা এখন বার-এ বসে মদ খায়, আর দুঃখ করে, "আমার স্ত্রী না হলো এদেশী না হলো ও-দেশী! সে ঘরে বসে থাকে, আমাকেই রোজগার করতে হচ্ছে।"

প্রচুর মদ গিলে মাতাল হয়ে সে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরে—বউ এখন খুব কষ্টের মধ্যে আছে।

আমি বললাম, দু'দিন আগে আমি এখানে বড়-হয়ে-ওঠা একটি বাঙালী মেয়েকে দেখলাম গ্রীনকার্ডের জোরে কলকাতা থেকে ডাক্তার স্বামী ইমপোর্ট করেছে। সদ্য বিয়ে হয়েছে, দেখে খুব সুখী বলে মনে হলো।

"ধীরে শংকরদা, ধীরে। এদেশের পরিবেশে মানুষ হয়ে ঐরকম বিয়েতে কতটা সুখ পাওয়া যাবে, এবং সেই সুখ কতটা স্থায়ী হবে তা ঝট করে বলা যায় না। কয়েক বছর পরে খোঁজখবর করবেন—বাইশ বছরে যা সুখ বলে মনে হচ্ছে আটাশ বছরে তা কী হবে তা এদেশে কেউ জানে না।"

এদেশে বড়-হয়ে-ওঠা ভারতীয় মেয়েদের স্বামী নির্বাচন সম্পর্কে কথা উঠলো। প্রণব বললো, ভারতীয় মেয়েদের পক্ষে আমেরিকান স্বামী জোগাড় করা খুব শক্ত নয়। কিন্তু প্রণব এদেশে যেসব ভারতীয় ছাত্রী দেখেছে তাদের বেশিরভাগের মধ্যেই ভারতীয় পুরুষ সম্পর্কে একটু স্পেশাল টান আছে—ভারতীয় পেলে তারা আর কাউকে বিয়ে করবে না।

যারা এদেশে বড় হয়ে আমেরিকান স্বামী নির্বাচন করছে, তাদের সম্বন্ধে প্রণব বললো, বাড়িতে বাবা-মা সেক্ষেত্রে খুব কষ্ট পায়। বিশেষ করে মেয়ের ক্ষেত্রে, ছেলের ক্ষেত্রে অতোটা নয়।

এর কারণ কি জানতে চাইলে, সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক আবার হো হো করে হেসে উঠলো। "সেই পুরনো ভারতীয় সমাজের দু'রকম মূল্যবোধ। ছেলে কোথাও একটু ফক্কুড়ি করে এলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মেয়ে ফক্কুড়ি করলে তার তো বিয়ে দেয়া যাবে না। আমাদের দেশে ছেলেদের তো সতীত্ব চাওয়া হয় না, মেয়েদের সতীত্ব চাওয়া হয়। ছেলেরা বিয়ের আগে একটু ফক্কুড়ি করলে বিয়ে দেওয়া যায়, মেয়েরা বিয়ের আগে একটু ফক্কুড়ি করলে বিয়ে দেওয়া যায় না।"

দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে সোসিওলজির অধ্যাপকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। যে-দেশের পারিবারিক জীবনে, এতো অনিশ্চয়তা, সম্পর্ক যেখানে এতো ঠুনকো তারা কর্মযজ্ঞে সফল হয়ে কেমন করে বিশ্ববিজয়ী হলো ? কিন্তু বিজয়ী হলেও, এমন প্রেমহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে বড়-হয়ে-ওঠা শক্তিমানদের হাতে বিশ্বসংসারের দায়িত্ব দেওয়াটা মানব সমাজের পক্ষে নিরাপদ কি না ?

প্রণব প্রথমে কোনো উত্তর দিতে চাইলো না। তারপর ভেবেচিন্তে বললো, "আগামী কয়েক বছরে আমাদের নিজেদের দেশে কী হয় আগে তাই ভাবুন। যদি অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়, তাহলে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসবেই। মেয়েরা যদি কাজে বেরোয় তাহলে তারা বদলাবেই। এবং একবার এই পরিবর্তন শুরু হলে সমস্ত দেশে নীরব এক বিপ্লব ঘটে যাবে। মেয়েরা যখন অর্থনৈতিকভাবে অতটা পরনির্ভরশীল থাকবে না তখন সমস্ত পুরুষসমাজের মেজাজটাই পাল্টে যাবে।"

"তুমি বলছো ? মেয়েরা স্বাধীন হলে আমাদের সমাজে উৎপাদকতা

বাড়বে ?"

"আমি ঠিক উল্টো বলতে চাইছি, শংকরদা। আমাদের শিল্প বাণিজ্য বাড়লেই, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই দলে দলে মেয়ে কলে-কারখানায় অফিসে কাজ করতে বেরুবে। আমাদের দেশে মেয়েরা এখন গ্রামে চাষ-আবাদে ক্ষেতে-খামারে খেটে মরছে, কিন্তু স্বামী তাকে কাঁচা পয়সা দিচ্ছে না। শহরে অন্য ব্যাপার ! তুমি দেখবে যেসব মেয়ে অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা আত্মনির্ভর তার স্বামী তাড়িয়ে দিলে সোনাগাছিতে যায় না। গরীব মেয়েরা, নিরক্ষর মেয়েরা সোনাগাছিতে যায় কারণ তাদের পয়সার মদত নেই। যে-মেয়ের নিজের রোজগার থাকবে, একটা চাকরি থাকবে তার স্বাধীনতাবোধ অন্যরকম হবে। এদের সংখ্যা অনেক হলে সারা সমাজের সেক্সুয়াল আচরণ পাল্টে যাবে। জাপানে যেমন হয়েছে। সত্যিকারের স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন আমরা বলতে পারবো—তুমি মানুষ। তুমি আমাকে ভালবাসো নিজে ভালবাসছো বলে—যেহেতু আমি পয়সা দিচ্ছি, আমি রোজগার করছি, আমি তোমার স্বামী বলে ভালবাসছো না। এটা যখন হবে তখন সারা জাতটার ভোল পাল্টে যাবে, শংকরদা। পৃথিবীতে সব দেশে যা হয়েছে তার থেকে আমরা আলাদা থাকবো কী করে ?"

মনটা বেশ খারাপ। স্বদেশ ও বিদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোসিওলজির বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক প্রণব চ্যাটার্জি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। দিব্যেন্দুনিকেতনে একটা ঘরে বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করেও কোনো থই পাচ্ছি না। এই আমার রোগ বলতে পারেন। আড়াই সপ্তাহের জন্য বিদেশে এসে সবরকম দুঃখ কষ্ট ভুলে না থেকে দেশের মানুষের চিন্তাগুলো আরও ভারি হয়ে উঠছে। গত কয়েকদিন ধরে আমেরিকান নানা শহরে এবং কানাডার টরন্টোয় কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হলো, কত নতুন সাফল্য আবিষ্কার করলাম, কত ব্যর্থতাকে দূর থেকে দেখলাম, আমার সঞ্চয়ের ঝুলি পূর্ণ, কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা বেড়েই চলেছে।

ভোগ ও ঐশ্বর্যের তুঙ্গে উঠেও মানুষ নিজের ঘর-সংসার ভাঙবার নেশায় মত্ত হয়ে যখন অনিশ্চয়তাকে ডেকে আনে তখন তাদের কর্মজীবনের সাফল্য কী মূল্যহীন হয়ে ওঠে না ?

আমি ভাবছিলাম, একাকীত্বের বিষে জর্জরিত হয়েও মার্কিন ভূখণ্ডের মানুষদের কেন চৈতন্যের উদয় হয় না ? চৈতন্য তো দূরের কথা, সমাজতত্ত্ববিদরা উল্টে ভয় দেখাচ্ছেন এই হাওয়া তোমাদের দেশেও পৌঁছলো বলে। তোমাদের ঘর-সংসারও নবজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আগুনে এবং

কামদেবের প্রকোপে ছারখার হয়ে যাবে। সুখের সংসার বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা কোথাও থাকবে না।

ঘরের আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠলো। দিব্যেন্দুজননী শান্তি ভট্টাচার্য ঘরে প্রবেশ করলেন। "একি বাবা! চুপচাপ ঘর অন্ধকার করে বসে আছো, আর আমি পুজো থেকেই উঠেই তোমার খোঁজ করছি।"

প্রবীণা মাসীমা এই সুদূর প্রবাসে একেবারে খাঁটি বাঙালী বিধবার জীবনযাপন করছেন। কাপড় কেচে তারে শুকোতে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে পুজোর ফুল তোলা পর্যন্ত কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই।

মাসীমা খুব কম কথা বলেন, কিন্তু সারাক্ষণ মানুষকে আশীর্বাদ করেন, বেঁচে থাকো; ভালো থাকো, সুখের সংসার হোক। সেই ছোটবেলায় বিধবা হয়েছিলেন, তারপর কষ্ট করে ছেলেদের মানুষ করেছেন। একটি ছেলে সৈন্যবাহিনীতে ছিল, সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় নিখোঁজ। সেই দুঃখ ভুলবার জন্যে এই ক্লিভল্যাণ্ড, ওহায়োতে হাজির হয়েছেন। বসবাস করছেন স্থায়ীভাবে।

মাসীমাকে আমার উদ্বেগের কথা কিছুটা বললাম। মাসীমা শুনলেন, কিন্তু নিরাশ হতে বললেন না। তাঁর ধারণা, "এ জাত খুব বড় জাত বাবা। এরা প্রবল শক্তিতে সারাক্ষণ টগবগ করে ফুটছে। এরা যখনই অসুবিধেয় পড়বে তখনই নতুন কোন মুক্তির পথ খুঁজে বার করে নেবে।"

"এরা শরীরের খিদে নিয়ে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে নেই, আপনি বলছেন?"

মাসীমা হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়ান না, সারাক্ষণ খবরের কাগজে খুন জখম বিবাহবিচ্ছেদের রিপোর্ট পড়ে নিজের দুশ্চিন্তা বাড়ান না। কিন্তু পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে, তাঁদের সুখদুঃখের খবরাখবর রাখেন।

মাসীমা বললেন, "মানুষ সব দেশেই এক গো—আগে বুঝতুম না, এখন নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস হলো। কিছু গেলে দুঃখ, কিছু এলে সুখ, কিছু গড়লে আনন্দ, কিছু ভাঙলে কষ্ট—তা টালিগঞ্জেও দেখেছি, এখানেও দেখছি বাবা।"

মাসীমা বললেন, "কে বলে এদেশে সংসার বলে কিছু থাকবে না? আমি এদেশে হীরের টুকরো বিদেশী বউমা দেখছি। এদের সঙ্গে কথা বলে তো মনে হয় না, এরা ঘর ভাঙতে এসেছে। তুমি অমলের জার্মান বউ, অঞ্জনের আমেরিকান বউ একটু দেখে যাও বাবা, মনে শান্তি পাবে।"

অমল গাঙ্গুলী এখানে অনেকদিন আছেন। বিখ্যাত ক্লিভল্যাণ্ড নিউম্যাটিক কোম্পানিতে এরোপ্লেনের যন্ত্রাংশ তৈরির ডিভিশনে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন। এঁর স্ত্রীর মাসীমা-অন্তপ্রাণ। প্রতিদিন খোঁজখবর নেন।

এই বউমার নামটি আমার খাতায় লিখে নিতে ভুল করেছিলাম। পরে ব্রজেশ পাকড়াশির কাছে জোগাড় করেছি—এরনা।

মাসীমা বললেন, "এই মেয়েটির তুলনা হয় না। রোজ কিছু না কিছু খাবার তৈরি করে ফোন করবে, আমাকে বোঝাবে, এতে কোনরকম আমিষের সংস্পর্শ নেই, আমি নাকি নিশ্চিন্তে খেতে পারি। এরনা সময় পেলেই চলে আসবে আমার সঙ্গে গল্প করতে। আর দিব্যেন্দু-সুমিত্রা যখন কোনো কাজে ক্লিভল্যাণ্ডের বাইরে গেলো তখন তো কথাই নেই। গাড়ি হাঁকিয়ে এরনা চলে আসবে আমাদের বাড়িতে নাইট ডিউটি দিতে। সারারাত থাকবে। কত কথা বলবে। একদিন নয়—রাতের পর রাত!"

মাসীমা, আমি ও সুমিত্রা তো শেষ পর্যন্ত এরনা গাঙ্গুলীর বাড়িতে চড়াও হলাম। এরনা তখন স্কার্টের ওপর অ্যাপ্রন পরে বাগানে পাখিদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করছিলেন। শাশুড়ী এসেছেন শুনে হৈ-হৈ করে ছুটে এলেন।

এরনা বিনা নোটিশে বিরাট পেসট্রির প্লেট সামনে হাজির করলেন। বললেন, "কোনো কথা শুনছি না, খেতেই হবে। এখন যত পারো খেয়ে নাও, দেশে গিয়ে উপোস কোরো।"

"এই হচ্ছে এরনা, যখন খাওয়াবে বলেছে তখন খাওয়াবেই," মন্তব্য করলেন সুমিত্রা।

এরনা হৈ চৈ করলেন, "তুমি শ্বশুরবাড়ির দেশের লোক, আপ্যায়ন না করলে যে বদনাম হবে তা আমি জানি! আমার শাশুড়ী অমলের মা আমাকে ট্রেনিং দিয়েছে। উনি থাকতেন বিন্ধ্যাচলে মা আনন্দময়ীর আশ্রমে।"

"দিস আনন্দময়ী ইজ এ রিমার্কেব্‌ল পার্সন। আমি যেবার প্রথম ভারতবর্ষে শাশুড়ীকে দেখতে গেলাম, অমল তার আগে আমাকে শিখিয়েছিল কেমন করে প্রণাম করতে হয়। কিন্তু আমি হাত বাড়াতেই বিধবা শাশুড়ী ভয় পেয়ে সরে গেলেন আমার স্পর্শ এড়াতে। কিন্তু একটু পরেই আনন্দময়ী মা আমাকে বালা এবং শাড়ি উপহার দিলেন।" সেই বালাটি এখনও এরনার মূল্যবান সম্পত্তি।

এরনার বাড়িতে পোষা বেড়াল রয়েছে। বললেন, "তুমি জেনে সুখী হবে, এখন 'পেট' হিসেবে বেড়ালের জনপ্রিয়তা কুকুরের থেকে বেশী, অন্তত আমেরিকায়। অবশ্য অনেক পরিবার দুটি 'ছেলেপুলে' চায়—একটি কুকুর, একটি বেড়াল।" এরনার বাড়িতে একটি অতিবৃদ্ধ হুলোবেড়াল রয়েছে—যমের

দোরে কাঁটা দিয়ে যার বয়স আঠারো। অথচ বইতে দেখবেন, বেড়াল ষোলো বছরের বেশী বাঁচে না।

এরনা গাঙ্গুলী প্রায়ই শত শত ডলারের খাবার কেনেন পাখিদের খাওয়াবার জন্যে। এরা তাঁর বাগানে নিত্য অতিথি—প্রচুর ছবি তোলেন এদের। পাখিদের খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে এদেশে--কিন্তু শীতকালে অনেকেই তাদের কথা ভুলে যান। তাই এরনা গাঙ্গুলী শীতকালে গাছে-গাছে পক্ষী-ফিডার ঝুলিয়ে দেন এবং তাতে ভর্তি থাকে নানা খাবার।

এরনা বললেন, "এখানে বেড়াল অনেক সুশিক্ষিত। তারা বাথরুম যাবার তাগিদ হলে কাঁদে। এমন বেড়ালও আছে যারা বাথরুমের ফ্লাশ টেনে দেয়!"

এরনা বললেন, "ভারতবর্ষে খাবারের কষ্ট আছে—অথচ এখানে এতো খাবার, আমার মন খারাপ হয়ে যায়। জার্মান-যুদ্ধের সময় খাবারের কষ্ট কাকে বলে তা আমার জানা হয়ে গিয়েছে। ওঃ সেসব দিন যা গিয়েছে।"

এরনার মনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি এখনও অমলিন রয়েছে। তখন ওঁর ঠাকুমার বয়স পঁচাশির ওপর। সাইরেন বাজলেই এয়ার রেড শেলটারে ছুটে যেতে হতো। কেউ বসতে পাবে না সেখানে। সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

"যুদ্ধ শেষ হলো। আমার ভালো লাগলো না। দেশ থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগলো। চলে এলাম লণ্ডনে।"

সেখানে এক হাসপাতালে কাজ করতেন এরনা। "লোকে জার্মানদের খুব অপছন্দ করতো। সরারাত ধরে মরাণাপন্ন রোগীর নার্সিং করলাম। বুড়ো সকালবেলায় যখন একটু সামলে উঠলো এবং বুঝলো আমি জার্মান, অমনি রেগেমেগে বলে উঠলো, তোমরা জার্মানিতে ফিরে যাও।"

এসবে মন খারাপ করতে নেই, শংকর। সবসময় ফাইটব্যাক করতে হয়। আমরা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিতাম, ফিরে গেলে তোমাদের হাসপাতালগুলো তো বন্ধ হয়ে যাবে। কে তোমাদের দেখবে?"

এই লণ্ডনেই এক বান্ধবীর মাধ্যমে অমল গাঙ্গুলীর সঙ্গে এরনার আলাপ, অমল তখন লণ্ডনে পি-এইচ-ডি করছে।

এরনা বললেন, "আমার বাবা প্রায়ই সাবধান করে দিতেন, বিয়েটা খুব কঠিন কাজ। পরামর্শ দিতেন, নিজের জাতের মধ্যে বিয়ে কোরো, তার বাইরে বিয়ে করতে চাও যদি তাহলে তোমাকে ফাইট-আউট করতে হবে। আমি অমলকে বিয়ে করে সুখী হয়েছি।"

"অমলের সঙ্গে আমি ভারতবর্ষে গিয়েছি। খুব ভাল লেগেছে। অমল এসেছে আমেরিকায়। আমি এসেছি। ও আমেরিকান নাগরিকত্ব নিয়েছে চাকরির নিরাপত্তার জন্যে। আমি নিইনি।"

এরনা বললেন, "অমলের চাকরির মেয়াদ শেষ হোক, তারপর কোথায় শেষজীবন কাটানো যাবে ঠিক হবে। ভারতবর্ষে তোমাদের নানা সমস্যা আছে, কিন্তু বিশ্বাস করো এদেশের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক বেশী ইনটারেষ্টিং। আমি কলকাতায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, অনেক দুঃখ-দারিদ্র্য নিজের চোখে দেখেছি—তবু বলবো ভারতীয় দৈন্যকে আমেরিকান দৈন্যের মতন দেখায় না। বিন্ধ্যাচলে হাঁটতে-হাঁটতে আমি অনেক পাখি দেখেছি—আকাশ, নদী, পর্বত আমাকে টেনেছে। মনে হয়েছে আমি ঈশ্বরের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি। আমি বিধবা শাশুড়ীর সঙ্গে নৌকো চড়ে নদীতে ঘুরেছি—আমার অশান্ত শরীর এবং মন শান্ত হয়ে গিয়েছে। আমি কখনও এতো রিল্যাক্‌স্‌ড অনুভব করিনি। ভারতবর্ষের বাতাসে কিন্তু মাদকতা আছে—আমি ওখানে ফিরে যেতে চাই। আমার শাশুড়ীকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম—কিন্তু তাঁকে কাছে রাখতে পারিনি। উনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমি তাই ইণ্ডিয়ান মাদার খুঁজে বেড়াই। তুমি কি ভাবো, বিনা কারণে আমি দিব্যেন্দুর মায়ের কাছে ছুটে যাই? আমি ওঁর মধ্যে চিরন্তন ভারতবর্ষকে খুঁজে পাই।"

মিসেস এরনা গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভাল লেগেছিল। ওখান থেকে সুমিত্রা আমাকে অঞ্জন ঘোষের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

সুমিত্রা জানালেন, "অঞ্জনের মাও পুত্র-পুত্রবধূর কাছে থাকেন। ওঁর নাম উর্মিলা ঘোষ। অঞ্জনের স্ত্রীর নাম ক্যাথি। ওকে দেখলে আপনি আমেরিকান মেয়েদের সম্বন্ধে সমস্ত বিশ্বাস ফিরে পাবেন। মনে হবে বাংলায় লেখা কোনো উপন্যাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে ফুটফুটে মেয়েটা।"

ক্যাথিকে আমি ষষ্ঠ নর্থ-আমেরিকান বাঙালী সম্মেলনে দেখেছি। একটি শাড়িপরা সুন্দরী মার্কিনী যুবতী সারাক্ষণ মুখবুঁজে কাজ করে চলেছে। ওঁর স্বামীই যে সম্মেলনের সমস্ত প্রোগ্রাম ভিডিও ক্যামেরায় তুলে নেবার দায়িত্ব নিয়েছেন তা বুঝিনি। অঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—অতি চমৎকার বাঙালী ছোকরা। বিনয়ী, শান্তস্বভাব, সেবাপরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য। এইসব ছেলেরা আছে বলেই বাঙালী-সংস্কৃতি এখনও তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে টিকে রয়েছে।

আমি যখন ঘোষবাড়িতে পৌঁছলাম তখন ক্যাথি বউমা কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরেনি—সে এখানকার ব্যাংকে দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছে, অঞ্জনও তখন

অফিসে।

বসবার ঘরে ক্যাথি বউমা কিন্তু অনেকগুলি ছবির মধ্যে সদা উপস্থিত। ভারী পবিত্র মুখখানি। নিষ্কলঙ্ক যৌবনের প্রতীক হিসেবে যদি মার্কিন দেশকে কখনও অঙ্কন করতে হয় তাহলে আমি ক্যাথির মুখখানিই নির্বাচন করবো। নিষ্পাপ কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। এই প্রাণশক্তিই মার্কিনদেশকে তার নিজস্ব মহিমা দান করেছে। এই নবীনতাই একদিন হয়তো আমেরিকাকে অন্যভাবে বিশ্বজয় করতে সাহায্য করবে।

উর্মিলা দেবী আমাকে কয়েক মুহূর্তে আপন করে নিলেন। বললেন, "কপালে কী ছিল বাবা, শেষ বয়সে বিদেশে আসতে হলো। তবু এখানে দিব্যেন্দুর মা আছেন, মঞ্জু গোস্বামীর বাবা-মা আছেন, আমি আছি স্থায়ীভাবে—মাঝে-মাঝে দেখা হয়।"

উর্মিলাদেবী বললেন, "আমার ছেলে ভাল, কিন্তু বউমার তুলনায় কিছু নয়।"

উর্মিলা দেবীরা পাটনার লোক। ১৯৬১ সালে বারো বছরের ছেলে এবং ছয় বছরের মেয়ে নিয়ে বিধবা হন। তারপর এক সময়ে ছেলে চলে এসেছিল বিদেশে ভাগ্য সন্ধানে। শেষে বিয়ে করলো আমেরিকান মেয়ে। "আমার তো দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, বুঝতেই পারছো। আমেরিকান মেয়ে কবে শাশুড়ীর তোয়াক্কা করেছে?"

"তা বাবা তোমায় কি বলবো, আমার ভাগ্য। সেই বিয়ের পর থেকেই বউমা লিখছে তোমাদের আমরা এখানে আনিয়ে নেবো। আমি বিশ্বাস করিনি, ভয়-ভয় করেছে। আমার মেয়েটা দেশ থেকে বি-এ পাশ করেছে, এম-এটা হলো না।

"বউমা শেষ পর্যন্ত আমাকে এখানে আনিয়ে নিলো, বউমাকে দেখে আমার ভাল লাগলো। ইমিগ্রেশনের হাঙ্গামা চুকিয়ে আমার মেয়ে এলো এক বছর পরে।

"আমরা তো বাবা দেশে চেপে-চুপে মেয়ে মানুষ করেছি। কিন্তু বউমা ননদকে রাস্তায় বেরনো, হাটে বাজারে যাওয়া, ব্যাংকের কাজকর্ম সব শিখিয়েছে। তারপর বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তুমি বিশ্বাস করবে, প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে আমার বউমা আনন্দ বাজারের পাত্রী চাই-এর বিজ্ঞাপনের উত্তর লিখেছে। তারপর নিজেই এখানকার ভারতীয়দের কাগজ 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রডে' বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কী করে সম্বন্ধ করে মেয়ের বিয়ে দিতে হয় তা আমার বউমা ধৈর্য ধরে শিখে নিয়েছে। তারপর এখানেই দেশ থেকে পাত্র আনিয়েছে বউমা। এখানেই সবাইকে ডেকে হিন্দুমতে বিয়ে দিয়েছে—পুরুত

ছিলেন ওই ডাক্তার ব্রজেশ পাকড়াশি এবং দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য। মেয়ে-জামাই সুখী হয়ে দেশে ফিরে গিয়েছে, এখন আবার এখানে জামায়ের চাকরির জন্য অসংখ্য কোম্পানিতে চিঠি লিখে যাচ্ছে আমার আমেরিকান বউমা।"

উর্মিলা দেবী বললেন, "আমি বাবা ইংরিজি জানি না। বউমা তিনটে কথা শিখিয়েছে—হাই, ইয়েস, নো। বউমা জিজ্ঞেস করে, একটু ডিংক ? ইয়েস্ অর নো ? বউমা আমার কথা হাবে-ভাবে বুঝতে পারে। আজকাল দু'একটা বাংলা কথা শিখেছে—মা এসো, টেবিলে যাও।"

"বউমা আমার ভীষণ অভিমানিনী। ভাষা না জানলেও কে কি নিন্দে করছে সব বুঝতে পারে। এখন নতুন একটা কথা শিখেছে 'ভারি বজ্জাত'।"

উর্মিলা দেবী জানালেন, তাঁর নাতনীর বয়স পাঁচ। সে কিন্তু ভাল বাংলা শিখেছে। বাবা মায়ের সঙ্গে ইংরিজিতে এবং ঠাকুরমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলে অনর্গল।

"আমি বলিনি, বউমা নিজেই শাড়ি পরে। আমাকে নিয়ে সব জায়গায় বেড়াতে যায়। আমার পুজোর ফুল আছে কিনা খোঁজ নেয়, ধূপকাঠি আছে কিনা অফিস থেকে ফোন করে জেনে নেয়।"

"আমার মুখ গোমড়া করে বসে থাকার উপায় নেই। অফিস থেকে ফিরে আমার মুখে হাসি না দেখলেই চটপট ডিনার সেরে গাড়ি বার করবে। অঞ্জনকে বলবে, চলো একটু ঘুরে আসি কোথাও মাকে নিয়ে, মাদারের মন ভাল নেই। মেম তো নয়, সাক্ষাৎ আনন্দময়ী।"

আনন্দময়ী আমি থাকতে-থাকতেই ব্যাংক-এর কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরলো। আমাকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলো, বললো, "এসেছো যখন তখন খেয়ে যেতেই হবে।"

আমি তখনও প্রণবের দেওয়া আমেরিকান মহিলাদের দাম্পত্যজীবনের স্ট্যাটিসটিক্সের কথা ভাবছি। ক্যাথির ওসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে বললো, "দেখবে এই চমৎকার পৃথিবীটা ক্রমশ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।"

মাথা নিচু করে আমি সেদিন দিব্যেন্দুধামে ফিরে এসেছি। ক্যাথি, এরনা এদের কথা বার বার মনে পড়ছে।

আর মনে পড়ছে, আমেরিকা-প্রবাসী ইহুদি লেখক আইজ্যাক সিঙ্গারের কথা। সিঙ্গার কিছুকাল আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যাঁরা সৃষ্টিশীল লেখক তাঁরা কোনো সাধারণ ফতোয়া জারি করেন না। তাঁরা কখনও দলের কথা বলেন না, তাঁরা সব সময় একজন মানুষের কথা লেখেন। অবশ্য লেখকের সাফল্যের উজ্জ্বল মুহূর্ত তখনই আসে, যখন সেই একজনের কথাই বহু মানুষের

কথা হয়ে ওঠে।

আমি নিজেকে অপরাধী মনে করছি এই মুহূর্তে। সংখ্যাতত্ত্বের জালে আর ধরা পড়বো না, জাতের কথা, দলের কথা কখনোই বলবো না। আমি কেবল খুঁজে বেড়াবো আলাদা-আলাদা মানুষকে বিচিত্র এই মানবতীর্থে।

পরের দিন ভোরবেলায় রণজিৎ দত্ত ও শুভা সেন পাকড়াশি এবং আরও অনেকে আমাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। সিরাকিউজে রাত কাটিয়ে, নিউইয়র্কের বুড়ী ছুঁয়ে আমি এবার ফিরে যাবো ভারতবর্ষে।

শ্রীমতী শুভা সেন পাকড়াশি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। হার্ট ও হাইপারটেনশনে তাঁর গবেষণার কথা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত। তবু সাধারণ বাঙালী মেয়ের মতন শুভা সরল মনে জিজ্ঞেস করলেন, "আমেরিকানদের এবং ভারতীয়দের এবার কেমন দেখলেন?"

বললাম, "আমেরিকানও দেখা হলো না, ভারতীয়ও দেখা হলো না—দেখলাম কতকগুলো ভালয়মন্দে মেশানো মানুষকে। না-দেখলে দুঃখ থেকে যেতো।"

রণজিৎ দত্ত আড়ালে ডেকে বললেন, "আপনাকে কয়েদিনের জন্যে পাওয়া গেলো, খুব আনন্দ হলো। পেটের দায়ে ভাগ্যের সন্ধানে অজানা দেশে হাজির হয়েছি আমরা—আমাদের কোনো ভুলত্রুটি হলে দেশের লোকদের ক্ষমা করতে বলবেন। আমাদের পাসপোর্টের রঙ যাই হোক না কেন, যে-দেশে জন্মেছিলাম অথচ যে-দেশে অন্নসংস্থান করতে পারিনি তার ছবিই আমাদের বুকের মধ্যে আঁকা রয়েছে এখনও।"

প্রখ্যাত জি. ই. কোম্পানির খ্যাতনামা গবেষক ডঃ রণজিৎ দত্ত মানুষটাকে প্রথম দর্শনে কাঠখোট্টা ভেবেছিলাম। এবার ভুল ভাঙলো।

রণজিৎবাবু চুপিচুপি বললেন, "দেশের লোকদের বলবেন, আমেরিকা মানেই কিন্তু সাফল্য নয়। এখানেও আমাদের সংগ্রাম আছে, অনিশ্চয়তা আছে, অপ্রাপ্তির বেদনা আছে। আর আছে নিঃসঙ্গতা—বিদেশে অচেনা মানুষের মধ্যে কখন হারিয়ে যাই তার ভয় আছে সারাক্ষণ। যাতে হারিয়ে না যাই সেই জন্যেই আমরা বাংলায় গান শুনি, বাংলা কবিতা পড়ি, কোথায় কোন বাঙালী আছে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াই। অনেক কিছু পাবার জন্যে এদেশে এসে অনেকদিন পরে বুঝতে পারলাম, এদেশ যেমন দেয় তেমন অনেক কিছু কেড়েও নেয়।

এঁরা কারা ? তিনসপ্তাহ আগে আমি তো এঁদের নামও জানতাম না। কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য আশীর্বাদ—জানা দেশের নগরে নগরে আমি কত অজানা মানুষকে আবিষ্কার করলাম যাঁরা আমার আপন জন। সামান্য কিছু পাবার জন্যে অনেককিছু দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

আমার চোখে জল আসছিল। মান সম্মান রেখে কোনোক্রমে এরোপ্লেনের ভিতরে এসে বসা গেলো।

সিরাকিউজের বুড়ী ছুঁয়ে অবশেষে নিউ ইয়র্ক। সেখানে বাংলাদেশের সদাশিব ডিপ্লোম্যাট আনোয়ার উল করিম চৌধুরী আমাকে আশ্রয় দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিল।

জয় ও তার স্ত্রী মলি শীঘ্রই ঢাকায় ফিরে যাবে। তবু জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে আমাকে বিদায় দেবার মুহূর্তে আনোয়ার ওরফে জয় জিজ্ঞেস করলো, "কয়েকদিনের ভ্রমণে দেশটাকে কি বুঝলেন ?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "সব ভাল। কিন্তু অ-নে-ক দূ-র।"

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান যথাসময়ে আমাকে স্বদেশের সোনার মাটিতে পৌঁছে দিয়েছে। নম নম নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি।

স্বগৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে আমি অনেক দূরের মানুষদের সম্পর্কে আবার ভাবতে শুরু করেছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁদের অনেকেই আমার মনের মধ্যে সময়ে-অসময়ে উঁকি মারতে শুরু করেছেন।

প্রবাসী মানুষগুলো কেমন ? সাফল্য কী ওঁদের মধ্যে ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি করেছে ? ছেড়ে আসা দেশ সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা কি, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করেছেন আমার প্রিয়জনরা। এরা কি শুধু অর্থই উপার্জন করেছেন, না নতুন সমাজ তাঁদের সম্মানের আসরে বসিয়েছেন ? এঁদের নামে রাস্তা তৈরি হয়েছে কিনা ? এঁদের মূর্তি বসানো হয়েছে কিনা ? আরও অনেক বেশী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো যদি আমার গর্ভধারিণী মা বেঁচে থাকতেন। কিন্তু তিনি তো কয়েক বছর আগে চলে গিয়েছেন সেই সুদূর দেশে যেখানে আমাদের সকলকেই একদিন যেতে হবে।

সুদূর প্রবাসের স্বদেশবাসীদের মনোভাব এক কথায় কিভাবে প্রকাশ করা যায় বহু চিন্তা করেও যখন সদুত্তর পাচ্ছিলাম না তখন চিঠি পেলাম ক্যালিফোর্ণিয়ার ন্যাপাভ্যালির এক প্রবীণ বাঙালী ডাক্তারের কাছ থেকে। শশাঙ্ক

মুখার্জি এম. ডি. বহু দশক আগে এদেশের ডাক্তারি ডিগ্রি পকেটে করে বিদেশে পাড়ি দিয়ে ছিলেন ভাগ্যসন্ধানে। বিখ্যাত কাইজার ফাউন্ডেশন হাসপাতালের চোখ ও ই-এন-টি বিভাগের প্রধান তিনি। কয়েকটি বিখ্যাত ব্যবসায়েরও মালিক এই শশাঙ্ক মুখার্জি—এঁর প্রতিষ্ঠানের তৈরি ওয়াইন হোয়াইট হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের টেবিলে ব্যবহার হয়। এঁর নামে ন্যাপাভ্যালিতে আমেরিকানরা রাস্তা করে দিয়েছে—আমেরিকার একমাত্র মুখার্জি অ্যাভিনিউ।

অজাতশত্রু মানুষ এই শশাঙ্ক মুখার্জি। বয়স বোধহয় সাতের দশকে। বিদেশিনী বিবাহ করেছেন। প্রবাস-জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে ছোট্ট চিঠি লিখেছেন। বহু বছর ধরে প্রবাসের আনন্দ-বেদনা দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে তিলে-তিলে উপলব্ধি না করলে এমন চিঠি লেখা যায় না। শশাঙ্ক মুখার্জিই আমার কাছে এই মুহূর্তে প্রবাস-জীবনের সিম্বল।

বয়োবৃদ্ধ শশাঙ্ক মুখার্জি লিখছেন : "উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালী আমরা—উজ্জয়িনীর যক্ষের মতন আমরা অভিশপ্ত না হলেও আমরা স্ব-ইচ্ছায় এই প্রবাস জীবন স্বয়ম্বর রূপে বরণ করে নিয়েছি। আমরা মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহুদূর চলে এসেছি। শৈশবের শিশির সিক্ত ফুলের গুচ্ছ শুষ্ক ছিন্নপত্রের মতন পিছনে আমরা ফেলে এসেছি। বরণ করে নিয়েছি আমাদের এই প্রবাস জীবন প্রখর মধ্যাহ্নের কর্মক্ষেত্রে।

"এই নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সঞ্চয় করেছি অনেক কিছু। সাংসারিক, আর্থিক উন্নতি করেছি। প্রবাসজীবনকে বেশ কিছুটা সার্থকও করে তুলেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার মনে হয় আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শান্তি অপরিপূর্ণ। আমাদের মনের গহন কোণে বেশ বিরাট কিছুটা যেন নেই।

"প্রবাসের এই মহান দেশে রূপে-বর্ণে-গন্ধেভরা সব কিছুই আছে,—আকাশ আছে, বাতাস আছে, এখানেও ফুল ফোটে, চাঁদ ওঠে, সূর্যাস্ত হয়, একের পর এক ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পূর্বোত্তর জীবনের নদীর কল্লোল, শাল-পিয়ালের তরুমর্মর, পাখির গান, মেঘের কোলে ভাসমান হংস-বলাকা এসব শুধু আমরা স্বপ্ন-সিক্ত মনে অনুভব করতে পারি—কিন্তু পার্থিবভাবে তাদের আবির্ভাব আমাদের জীবনে এখানে হয় না।

"ভোরবেলাকার সানাইয়ের সুরের ভৈরবী আলাপ মাঝে-মাঝে মনে পড়লে আমাদের মন উতলা হয়ে ওঠে—চোখ ঝাপসা হয়ে পড়ে। কশ্চিৎ-কান্তা বিরহ-বিধুরার মতন আমরা ধ্যানমগ্ন হয়ে স্তব্ধভাবে বিধাতা-পুরুষের বিচার সহন করি। মনে আকুলতা জাগে, হয়ত বা আমার অনাদৃত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতন ভাগ্যের পায়ে নামহীন, সঙ্গীহীন।

"বিশিষ্ট সুন্দর এই দেশ—এদেশের রুদ্র-বৈশাখের আবির্ভাব হয়। কিন্তু

তাপক্লিষ্ট বৈশাখের আকাশে দিনের চিতা জ্বলে ওঠে না। তরল-অনল এখানে অম্বরতল থেকে গলে পড়ে না। দিক-বধূ মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে অশ্রুজল ছল-ছল চোখে চেয়ে থাকে না।

"বর্ষা এখানেও আসে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈশাণ কোণ থেকে গুরু-গুরু মেঘ গরজি-গরজি গর্জন করে ওঠে না। এখানকার ঘন বরষার উত্তাল তুমুল ছন্দ নেই— শ্রাবণ-সন্ন্যাসী নব-ঘন বিপুল মন্ত্রে আমাদের প্রাণে রাগিণী রচনা করে না।

"এখানকার ধরায় বসন্ত তার নবপল্লব পুলকিত মিলনমাল্যের উপহার আনে, কিন্তু প্রাঙ্গণে আমাদের শিরীষ শাখা নেই। ক্ষান্ত কূজন, শান্ত-বিজন সন্ধ্যাবেলায় এখানে ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটাবার খেলা হয়ে ওঠে না। কুঞ্জবনে এখানে দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণ নেই। বসন্তের মাধবী মঞ্জরী মালঞ্চের অঞ্চল এখানে ভরে দেয় না। এখানে বকুল নেই, পারুল নেই। রজনীগন্ধা নেই। এখানে নেই তাল-তমাল অরণ্য। প্রবাস-কাননে আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ নেই—বন-বিথীকায় কীর্ণ বকুল পুষ্পও ফুটে ওঠে না।

"এখানে সীমাহীন নদ-নদী-গিরি-পর্বত দূর-দিগন্ত সবই আছে। কিন্তু মানসচক্ষে আমরা কেবল অলকানন্দ মিশেছে যেথায় অগ্নিহোত্রী সাথে সেই আলেখ্যই দেখতে চাই। মনে-মনে আমরা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমে মানস যজ্ঞ করি, তর্পন করি।

"এখানেও পথ আছে—সীমাহীন দিগন্ত-বিস্তৃত পথ, কিন্তু মন আমাদের পড়ে আছে গ্রামের শেষের সেই রাখাল-ছেলের বাঁশির সুর ভরা রাঙামাটির পথে। সেই তেপান্তরের মাঠ—যেটা হয়ত ময়নামতীর ঘাটে গিয়ে শেষ হয়েছে।

"এ দেশে—এই বিরাট এই মহান দেশে আছে সব কিছু। সবকিছুরই পরিপূর্ণতা আছে এই দেশে—কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এই প্রবাস জীবনের একটা প্রধান পাথেয় যেন নেই। আমাদের দেহ এখানে তৃপ্তিময় প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও মন আমাদের তাই অতৃপ্ত, অশান্ত...."

বার বার পড়েছি এই লেখাটা এবং চোখের জল ফেলেছি। সমস্ত জীবন ধরে প্রবাস-বেদনার আগুনে না পুড়লে কলম থেকে এমন লেখা এখন অবলীলাক্রমে বেরিয়ে আসে না। আমার মনে হয়েছে, সুদূর মার্কিন মহাদেশে যেসব অতৃপ্ত প্রবাসীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল তাঁদের সবাই এই চিঠির মাধ্যমে স্বদেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন।